শ্রীম-দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথপ্রদর্শক

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

[ষষ্ঠ ভাগ]

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

পরিবেশক :

জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১১৯, লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

প্রকাশিকা : শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রীম ট্রাস্ট)
৫৭৯ সেক্টার ১৮-বি
চণ্ডীগড়

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৬৪

জয়গুরু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ১৩/১ মণীন্দ্র মিত্র রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে শ্রীঅমলেন্দু শিকদার কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র



ভূমিকা

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী। ঠাকুর পূর্ব-দক্ষিণ বারান্দায় মাছুরের উপর বসিযা আছেন। গায়ে মৌলস্কিনের ব্যাপাব জড়ান। নাপিত আসিয়াছে। ঠাকুবকে কামাইবে।

আজ ১৮৮২ খ্রীঃ, ২৮শে ফেব্রুয়াবী, মঙ্গলবাব। সকাল আটটা।

তুইদিন পূর্বে শ্রীবামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিয়াছেন অল্পক্ষণেব জন্য। বিশেষ কিছু কথাবার্তা হয নাই। তদবধি শ্রীবামকৃষ্ণের পায়ে তাঁহার মন বাঁধা পড়িয়াছে। সেই টানে আজ ঠাকুবকে দ্বিতীয়বাব দর্শন কবিতে আসিয়াছেন। শ্রীমকে দেখিয়াই ঠাকুব সস্নেহে বলিলেন, তুমি এসেছ। আচ্ছা, এখানে বস। শ্রীম তাঁহার সঙ্গে মাছুবে বসিলেন। নাপিত কামাইতেছে। আর ঠাকুব মাঝে মাঝে তুই একটি কথা শ্রীমকে কহিতেছেন। পবমাত্মীয়েব মত বলিলেন, দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল। আমি কপাল, চোখ এসব দেখলে বুঝতে পাবি।

ঠাকুবেব এই অহৈতুকী স্নেহ লাভ কবিয়া, সাহসে ভব করিয়া শ্রীম তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বরে মন কি করে হয়? শ্রীবামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, ঈশ্বরেব নাম-গুণগান সর্বদা করতে হয়। আব সৎসঙ্গ করতে হয়। ঈশ্বরেব ভক্ত বা সাধুদের সঙ্গে মিশতে হয়। এঁদেব সেবা কবতে হয়।

সংসাবের ভিতর দিনরাত পড়ে থাকলে ঈশ্বরে মন যায় না। বিষয়কর্মে সর্বদা মনকে ডুবিয়ে রাখলে ঈশ্বরে মন যায় কি করে!

মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড়ই দরকার। তা না করলে ঈশ্বরে মন রাখা অসম্ভব। দেখ না, চারা গাছে প্রথম প্রথম বেড়া দিয়ে তাকে রক্ষা করতে হয়। গাছ বড় হয়ে গেলে তখন হাতি বেঁধে দাও, তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু প্রথমে তাকে সযতনে রক্ষা করতে হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের দিকে যাদের অল্প টান আছে, যারা

তাঁর কথা শুনে আনন্দ পায়, তাদের মনকেও ঐ চারা গাছের মত বেড়া দিয়ে সযতনে রক্ষা করা উচিত।

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করে সংসারে থাকলে অত জড়িয়ে পড়ে না, শোক তাপ দুঃখে অত অধৈর্য হয় না। অতএব ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করে সংসার কর।

ভক্তিলাভ করতে হলে নির্জনে গিয়ে তাঁকে ডাকবে। মন যেন দুধ। দই পাততে হলে একস্থানে দুধ রাখতে হয়। নাড়াচাড়া করলে দই জমে না। একবার দই পাতা হয়ে গেলে আর ভয় নাই। তখন মন্থন করে মাখন তুলে ফেল। মনরূপ দুধের মাখন, ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস। ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য—এই বিচার। আর আমি ঈশ্বরের সন্তান এই নিশ্চয়। এই 'আমিটা'কে—এই আমি-রূপ মাখনকে সংসাররূপ জলে রাখলেও সে ডুববে না, ভেসেই থাকবে।

দেখ, সংসারে আছেই বা কি! দেখতেই দেখা যায় বহু দ্রব্য। কিন্তু গোড়ায় প্রবেশ কর, দেখবে দু'টিমাত্র জিনিস। একটি কামিনী আর একটি কাঞ্চন। কাঞ্চন আহার বস্ত্র বাসস্থানাদি দিতে পারে। কিন্তু শাশ্বত সুখ শান্তি দিতে পারে না। কামিনীও অনাবিল সুখ দিতে পারে না। অনাবিল সুখ কেবল শ্রীভগবানে আছে। অতএব ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য—কামিনী-কাঞ্চনে নয়। দিবানিশি ঈশ্বরের গুণগান করবে আর তাঁর চিন্তা করবে।

এই উপদেশ যখন শ্রীম লাভ করেন তখন তাঁহার বয়স সাতাশ-আটাশ।

ইহার পর আমরা দেখিতে পাই, শ্রীমর মন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে থাকিত অধিকাংশ সময়। আর অল্পাংশে তিনি সাংসারিক কর্তব্যাদি পালন করিতেন। অবসর পাইলেই শ্রীম দক্ষিণেশ্বর চলিয়া যাইতেন। কখনও ঠাকুর তাঁহাকে মাসাধিককাল নিজের কাছে রাখিয়া দিতেন শিক্ষার জন্য। তখন নানাবিধ গুহ্য সাধন শিখাইতেন। আর সাংসারিক বিষয়ের শিক্ষাও দিতেন—পরিজন ও আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কি করিয়া অর্থোপার্জন ও অর্থের

ব্যবহার করিতে হইবে, কি ভাবে জনসাধারণের সহিত মিশিতে হইবে, ইত্যাদি।

জগদম্বার আদেশে ঠাকুর শ্রীমকে 'ভাগবতের পণ্ডিত'-রূপে 'চাপরাশ' দিয়া সংসারে লোকশিক্ষার জন্য গৃহস্থাশ্রমে রাখিবেন নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তাই সাংসারিক বিষয়ের নানা শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত সাংসারিক বিষয়ের এই শিক্ষাই ভক্তগণের অমূল্য সম্পদ। এই সকল শিক্ষার সংবাদ 'শ্রীম-দর্শন' বহন করে। শাস্ত্রাদিতে শিক্ষার এইরূপ বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে শ্রীমকে কাছে বসাইয়া নিজের ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা আপন জিহ্বা হইতে মুখামৃত লইয়া শ্রীমর জিহ্বায় কি লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। ইষ্টদর্শন করিয়া পরমানন্দে শ্রীম দীর্ঘকাল সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন।

শ্রীম বলিয়াছিলেন, তখন ঠাকুর এমন আকর্ষণ দিয়াছিলেন যে কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর পাঁচ মাইল হইলেও এই দূরত্ব বোধ হইত না। মনে হইত যেন এ-ঘর থেকে সে-ঘর। যাতায়াতে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতের কষ্টবোধও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ঠাকুরের শরীর চলিয়া যাওয়ার পরও শ্রীম সপ্তাহে তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতেন, তপস্যা করিতেন। আর চার দিন কর্ম করিতেন। কখনও সাধু গুরুভাইদের সঙ্গে মঠে বাস করিতেন। একবার ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বরাহনগর মঠে একটানা ছয়মাস ছিলেন। কখনও জয়রামবাটী বা কামারপুকুর চলিয়া যাইতেন। কখনও কাশী, পুরী, অযোধ্যায়। বৃদ্ধ বয়সেও হরিদ্বার ঋষিকেশে তপস্যা করিয়াছিলেন। স্বর্গাশ্রমে তাঁহার তপস্যার কুটীরটি এখনও ভগ্নাবস্থায় বিরাজমান। বহু সাধু, ভক্ত ঐ কুটীর দর্শন করিয়া আজও শান্তিলাভ করেন। সত্তর বৎসর বয়সে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন মিহিজামের নির্জন প্রশান্ত তপোবনে। তারপর গেলেন পুরীতে।

ঠাকুর শ্রীমকে যে দুইটি কথা উপদেশ দিয়াছিলেন—ঈশ্বরের নাম-

গুণকীর্তন আর নির্জনবাস, এই দুইটি কথা তাঁহার জীবনে পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের কথা ছাড়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। একবার তাঁহার জ্বর হয়। ডাক্তারগণ ঈশ্বরীয় কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি ডাঙ্গায় মাছের মত ছটফট করিতেন। ফলে, একমাস ধরিয়া তাঁহার জ্বরের বিরাম ছিল না। ভক্ত ডাক্তার সত্যশরণ আসিয়া ঐ মৌন ভাঙ্গিয়া দিলেন। বলিলেন, আপনার যা কইতে বা শুনতে ভাল লাগে তাই করুন। শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন। আর কয়দিনের মধ্যেই ভাল হইয়া গেলেন। তখন তিনি ভক্তদিগকে আনন্দে বলিয়াছিলেন, যে কথা প্রাণ, তা না বললে বা শুনলে নাড়ী আসবে কি করে? এই এক ডিপার্টমেণ্ট ভগবানের। যাঁরা এখানকার লোক তাঁরা তাঁর কথা না বলে বা শুনে থাকে কি নিয়ে, মরে যাবে যে! যাঁদের ঋষিজীবন, ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁরা বাঁচবেন কি করে তা না করলে? এটা যে সেকেণ্ড নেচার (স্বভাবে) পরিণত হয়ে গেছে। অন্য কথা, অন্য ভাব তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। অন্য কথা হ'লে তাঁরা ছটফট করেন।

শ্রীমকে দেখিয়াছি, তিনি দিবানিশি ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন করিতেছেন অতন্দ্রিত ভাবে। রাত্রে শুইয়া আছেন, শরীর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়া ধ্বনি হইতেছে, 'গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব।'

মধ্যরাত্রে সাধু ও ভক্তগণকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া বলিতেন, আসুন, ঈশ্বরের নাম করা যাক্। এই বলিয়া কখন তিনি ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন করিতেছেন, কখন ধ্যান করিতেছেন; কখন ভক্তি-সঙ্গীত গাহিতেছেন। বেতালা লোক—যাহারা অন্য কথা কহে, অন্য চিন্তা করে, তাহারা তাঁহার কাছে থাকিতে পারিত না। তাঁহার বাসস্থান ঠাকুরবাড়ী বা মর্টন স্কুল পরিণত হইয়া গিয়াছিল নৈমিষারণ্যে—সর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গে মুখরিত।

তাঁহার কাছে কেহ আসিয়া বসিলে সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জগৎ ভুলিয়া যাইত। আগন্তুকের মনকে টানিয়া কে যেন দিব্য

আনন্দময় ধামে লইয়া যাইত। অনেক শোকতাপগ্রস্ত লোককেও দেখিয়াছি, অল্পক্ষণের ভিতরেই তাহারা শোকতাপ ভুলিয়া যাইত তাঁহার কাছে বসিলে।

দিবানিশি অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণগান তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। অনেক বৃদ্ধ সাধু কখনও কখনও বলিতেন, 'চল ভাই, জগৎ ভুলে আসি' অর্থাৎ শ্রীমকে দর্শন করিয়া আসি।

শ্রীম-দর্শনের ষষ্ঠ ভাগ শ্রীমর জীবনের এই অধ্যায়টি—দিবানিশি ঈশ্বর-গুণগানকীর্তনের বার্তা বহন করে। আর সাংসারিক লোকদিগকে নির্বাক উপদেশ দেয়—বার আনা মন নিয়া ঈশ্বরের চিন্তা কর। আর চার আনা মন দিয়া অন্য সব কাজ কর। তাহা হইলে আনন্দে 'জ্বলন্ত কুণ্ডে' শান্তিতে থাকিতে পারিবে। অন্তে পরমানন্দ লাভ করিবে।

বিনীত

গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

নির্বিকার শ্রীম

১

শ্রীম ধ্যান করিতেছেন তিনতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরে। এখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। শরীর কয়দিন যাবৎ অসুস্থ। তাই বিছানায় বসা। পাশেই মাদুরে বসিয়া আছেন জগবন্ধু, শান্তি ও ছোট অমূল্য।

সামনের বারান্দায় চীৎকার শুনিয়া জগবন্ধু ঘরের বাহিরে গেলেন। তারপর শ্রীমও আসিলেন। প্রভাসবাবু শ্রীমর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি অবাধ্যতার জন্য তাঁহার পুত্রকে প্রহার করিয়াছেন। ক্রোধে চীৎকার করিতে করিতে বালক শ্রীমর ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুনরায় দীর্ঘপদক্ষেপে সিঁড়িব সম্মুখ পর্যন্ত যাইতেছে। তাহার বয়স বছর পনের, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

বালক (শ্রীমকে শুনাইয়া)—আমি তিন দিনের মধ্যে গলায় দড়ি দেব। নয়তো আফিং খেয়ে মরবো। অকারণে মারবেন! আমি কি বলেছি? (ক্রন্দন)।

শ্রীম—আহা, পিতা গুরুজন। অমন করে বলতে আছে?

বালক—যে বাপ এমন করেন তাঁকে বললে কি হবে? আমি কিছুই করি নাই তবুও আমাকে মারে। আমি চলে যাব এবাড়ী থেকে এখানে আর থাকবো না। আমার অনেক ফ্রেণ্ডস্ আছে। প্রত্যেকের বাড়ী তিনচার মাস করে থাকবো। এ বাড়ীতে থাকবো না।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে)—তাই ভাল। (শান্তি ও অমূল্যের প্রতি) কি বলেন, বন্ধুর বাড়ীতে থাকা ভাল।

বালক—দেখুন না, আমি গলায় দড়ি দেব তিন দিনের মধ্যে।

শ্রীম—এ কাজটি করো না। এটা কেন করতে যাবে? গিন্নীকে (শ্রীমর ধর্মপত্নীকে) বারণ করেছিলেন পরমহংসদেব ওটি করতে। মাঝে মাঝে বলতো কি না, মরে যাব (পুত্রশোকে)।

পরমহংসদেব বলতেন, আত্মহত্যা করলে ভূত হয়, পেত্নী হয়, একবার পেত্নী হলে আর রক্ষে নেই। পেত্নীতে বিষ্ঠা খায়।

আর অমন চেঁচাচ্ছ কেন? অত সব ভদ্রলোক রয়েছেন নীচে। ওঁরা শুনলে বলবেন কি? 'অকাল কুষ্মাণ্ড'—এই রকম কিছু বলবেন হয়তো। (শান্তি ও ছোট অমূল্যের প্রতি অজ্ঞতার ভান করিয়া) আচ্ছা, 'অকাল কুষ্মাণ্ড' বলে কেন? এর মানে কি?

ছোট অমূল্য—কুমড়ো ভাল বটে, কিন্তু অকালে যেগুলো হয় সেগুলো খেলে অসুখ করে।

শ্রীম (কৃত্রিম বিস্ময়ে)—ও, তাই এরূপ বলে!

শ্রীম (বালকের প্রতি)—আর দেখ, তুমি এইখানে বাজাবে। আমরা কত আহ্লাদ করবো শুনে। বাঁশীটি বাজিও না। তাতে তোমার শরীর খারাপ হয় যখন। আমরাও তোমায় বারণ করেছি। কথা শুনলে না বলেই তো মার খেয়েছো। বাঁশীটি আর বাজিও না। হারমোনিয়াম, বেহালা এসব বাজাও।

ছেলেটি বাদ্যযন্ত্রে আজন্ম প্রতিভাবান। শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপাভাজন। মা বলিয়াছিলেন, 'এর গন্ধর্ব অংশে জন্ম'—কাঠের টুকরা দিয়া মেজেতে তাল ঠোকা দেখিয়া তিন বছর বয়সে।

প্রভাসবাবু আসিয়া পুনরায় প্রহার করিলেন। আর গলা ধাক্কা দিয়া সিঁড়ির নীচে নামাইয়া দিলেন। ছেলে আরও কাঁদিতেছে। শ্রীম ছেলের সঙ্গে পাঁচ ছয় ধাপ নীচে নামিয়া গেলেন। তাহাকে বলিতেছেন, 'তা'হলে কোন বন্ধুর বাড়ী চলে যাও। আর কি করবে?'

শ্রীম সাক্ষীর ন্যায় এ দৃশ্য দেখিতেছেন। মন প্রশান্ত।

আজ শনিবার। ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ৪ঠা ফাল্গুন। একাদশী। এখন রাত্রি আটটা প্রায়। শ্রীম দোতলার বসিবার ঘরে আসিয়াছেন। পূর্বাস্য মাদুরে বসিলেন। পাশেই দুর্গাপদ, রমণী, বড় জিতেন আর তিন চারটি নূতন লোক। ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ ও উকীল ললিতও আসিয়াছেন। তারপর এটর্নি বীরেন, ছোট নলিনী ও 'দীর্ঘকেশ' প্রবেশ করিলেন একসঙ্গে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—শ্রীকৃষ্ণ বেশ একটি গল্প বলেছেন 'কাল' সম্বন্ধে। পড়লুম ঐটি। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ দেখলে, একটা জিনিস পড়ে সাপ হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে সেটা মহিষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার মানুষ হলো। ব্রাহ্মণ তখন ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মশায় আপনি কে ?' মানুষটি উত্তর করলো, 'আমি কাল, সর্বত্র আমাব গতি।' সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে, 'তা'হলে আমার বাড়ী যাচ্ছেন কখন ?' 'তোমার বাড়ী যাব বাব বছর, ছয় মাস, তিনদিন পবে।' এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন বার বছর ছয় মাস তিন দিনের কিছু বাকী আছে। ব্রাহ্মণী old ageএ (বার্ধক্যে) অন্তঃসত্ত্বা হলো। ব্রাহ্মণ তাকে শ্বশুববাড়ী নিয়ে যাচ্ছে। বাস্তায় ব্রাহ্মণীব গর্ভযন্ত্রণা হয়েছে, আর তৃষ্ণায় ছটফট করছে। অদূরে একটি পুকুব ছিল। ব্রাহ্মণ তা' থেকে জল আনতে গেল। ব্রাহ্মণীকে একটা চাদব ঢাকা দিয়ে রেখে গেল। তাড়াতাড়িতে পুকুবে গিয়ে নামলো আঘাটায়। রাজার পাইকরা এসে তাকে ধরে ফেললো। তাকে বাঁধছে। সে তো অবাক! বলছে, আমার দোষ কি ? ওরা বলছে, তুমিই ছাগল চুরি করেছ। নইলে আঘাটায় নামে কে ? ব্রাহ্মণ বললো, না মশায়, আমি ছাগল চুরি করি নাই। আমার সঙ্গে স্ত্রী। তাঁর জন্য জল নিতে এসেছি। তিনি অসুস্থা। চল তোমরা দেখবে। এসে যেই চাদর উঠিয়েছে অমনি দেখে ছাগল। আর রক্ষা নেই। তাকে ধরে নিয়ে শূলে দিল।

আর একবার যমালয়ে পাপীদের কষ্ট দেখে হরিনাম করতে লাগলেন। তাতে সব পাপী উদ্ধার হয়ে গেল। যম এসে তখন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'তা হলে প্রভো, আমায়ও এ কর্ম থেকে মুক্তি দিন।'

বেশ সব গল্প!

ছোট জিতেন প্রবেশ করিলেন। শ্রীমকে না পাইয়া গদাধর আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম কিছুকাল ধরিয়া গদাধর আশ্রমে বাস করিতেছেন।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—আপনি ভবানীপুর থেকে এসেছেন? আচ্ছা, ওখানে কি লোক এসেছিল?

(সকলের প্রতি)—দু'জন ভক্ত এসেছিলেন। একজন নারায়ণ আয়াঙ্গার মশায়ের জামাই আর একজন তাঁর ছেলে। জামাই বি. এল. পাশ সবে করেছে। কংগ্রেসম্যান। খুব well-informed (সুবিজ্ঞ)। ছেলেটির বয়স ষোল, ম্যাট্রিক পড়ে। সেও বেশ well-informed (সব খবর রাখে)। নারায়ণ আয়াঙ্গার মশায় মাসে বারশ' টাকা মাইনে পেতেন। মাইশোর গভর্নমেণ্ট এখন পেনসান্ দিয়েছেন। পৈত্রিক যা ছিল তা দিয়ে বাঙ্গালোরে মঠ করে দিয়েছেন। তা'তে একশ' টাকা মাসে আয় হতে পারে এমন provision (ব্যবস্থা) করে দিয়েছেন। তা বারশ' টাকার পেনসান্ যা হোক করে তিন চারশ' টাকা তো হবেই। তা'তেই বাড়ীর provision (ব্যবস্থা) হয়ে যাবে।

আয়াঙ্গার মশায় একবছর ধরে ভারতের নানা তীর্থে ঘুরছেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে আট মাস ছিলেন। এখন 'লিভে'তেই (ছুটিতে) বেশ সময় কাটাচ্ছেন। ইচ্ছে, ঠাকুরের তিথিপূজায় সন্ন্যাস নেন। জামাই আর ছেলে এসেছেন চেষ্টা করে দেখতে যদি ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারেন।

আমরা তাঁদের বললুম, আজকালের সন্ন্যাসে তেমন কষ্ট নাই। আগে বড় কঠিন ছিল। বার বছর নির্খোজ হয়ে থকেতে হতো। এখন যেমন কলেজ-বোর্ডিংএ থাকে। আবার (পোস্টকার্ডে) দু'পয়সা খরচা করলে ঘরের সব খবর পাওয়া যায়। কিম্বা, ইচ্ছা হলে একবার গিয়ে সকলকে দেখেও আসা যায়। এখন আর তেমন কষ্ট নাই সন্ন্যাসে।

এঁদের ভাবনা, বুড়ো বয়সে সন্ন্যাস নিলে কষ্ট হবে। তাই চেষ্টা করেছেন ঘরে রাখতে। আহা, আয়াঙ্গার মশায় কি লোক! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বম্বেতে একটি আশ্রম হয়েছে। এখন সেখানে আছেন। জিতেন বলে একজন আছেন, এম. এ. পাশ। এখন সন্ন্যাস নিয়েছেন, বম্বেতে রয়েছেন। এঁরা সব মহৎ লোক। এ সব লোক

spiritual forceএর (আধ্যাত্মিক শক্তির) backgroundএ (পেছনে) থাকলে ইণ্ডিয়ার কত মঙ্গল!

যারা unmarried (অবিবাহিত) তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। ইচ্ছে করলেই অতুল্ সম্পদের অধিকারী হতে পারে। Marriedদেরও (বিবাহিতদেরও) বেশ সুবিধে যদি তাঁরা তাঁর (ঠাকুরের) কথামত চলেন। রাস্তা খুব কঠিন।

এঁরা সব object lessons (শিক্ষার আদর্শ পুরুষ) এঁদের দেখে লোক শিখবে।

জগদানন্দ বলে একজন আছেন। কাশীতে থাকেন। সন্ন্যাস হয়েছে। বিয়ে করেছিলেন। ছেলেপুলেও হয়েছিল। তারপর সব ছেড়ে এলেন। কত বাধার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

কালীঘাটে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা এসে একটি ঘর ভাড়া করলো। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। এঁকে সংবাদ দিয়ে নিয়ে গেল। ঘরে বসা। স্ত্রীও ঘরে। একে একে অপর সকলে বের হয়ে গেল। আর বাইরে থেকে শিকল দিয়ে দিল। কত বাধার পর তবে সন্ন্যাস।

'দীর্ঘকেশ'—শাস্ত্রে আছে এরূপ সন্ন্যাসের কথা?

শ্রীম—হাঁ, শাস্ত্রে না থাকলেই বা কি! ঠাকুর যেকালে করে গেছেন, এইতো শাস্ত্র। Fact is fact. Take a thing as it is. (সত্য চিরদিনই সত্য। চোখের সামনে যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাই নাও।)

নেপোলিয়ান্ আল্পস্ (Alps) পার হবেন। 'ওয়ার কাউন্সিল্' বসেছে। তিনি কমাণ্ডার। বুড়ো বুড়ো জেনারেলবাও রয়েছে। সকলেই বলছে, কি করে এ হবে। তাদের শাস্ত্রে একথা নেই—আল্পস্ পর্যন্ত পার হওয়ার কথা। নেপোলিয়ান বললেন, 'আমি যা করি তাই শাস্ত্র হবে!' আরও বললেন, 'আপনারা লোকক্ষয়ের কথা ভাবছেন? তা ভাবলে কি হয়? আমরা যে already in the warfield (সমরাঙ্গনে)। এখন যুদ্ধ হচ্ছে না বলে আমরা নিরাপদে আছি, এ কথা মনে করা উচিত নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে লোকক্ষয় ভাবলে আর যুদ্ধ

করা হয় না।' অর্ডার দিলেন, 'আল্‌পস্‌ পার হও'। তখন রাতারাতি পার হয়ে গেল। যুদ্ধে জয় হল। এর পূর্বে কেউ কখনও ভাবতে পারেনি আল্‌পস্‌ পার হতে পারে।

মহাপুরুষরা যা করেন তাই শাস্ত্র।

২

নারায়ণ আয়াঙ্গারের কথাপ্রসঙ্গে রঘুনাথ দাসের কথা উঠিল। ইনি চৈতন্যপার্ষদ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—রঘুনাথ দাসের কথা বেশ আছে। চৈতন্যদেব পুরীতে। রঘুনাথ বাড়ী থেকে পলায়ন করলেন সন্ন্যাসের জন্য। উনিশ কুড়ি বছর বয়স। যেরূপ রূপবান তেমনি গুণবান। তাঁর বাপকে মা বললেন, তুমি তাকে বেঁধে রাখলে না কেন? বাপ বললেন, তার পরমা সুন্দরী স্ত্রী, আর আমার এই বিশাল ঐশ্বর্য যাকে বাঁধতে পারে নাই, তাকে আমি রশি দিয়ে বাঁধতে পারবো?

পুরীতে এসে উপস্থিত রঘুনাথ। এর পরের different stage-গুলি (পরপর অবস্থাগুলি) কি সুন্দর!

ফার্স্ট স্টেজ (প্রথম ধাপ): বাড়ী থেকে তখন মাঝে মাঝে দশ টাকা আসতো, আর একটি পাচক রেঁধে দিত। মাঝে মাঝে চৈতন্য-দেবকেও ভিক্ষা দিতেন। একদিন চৈতন্যদেব general wayতে (সাধারণভাবে) ভক্তদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন সন্ন্যাসীদের বাড়ী থেকে টাকা আনা উচিত নয়। ওঁকে তেমন particular (বিশেষ) করে বলেন নাই। এই কথা শুনতে পেয়ে টাকা আনা বন্ধ করলেন।

সেকেণ্ড স্টেজ (দ্বিতীয় ধাপ): খেতে তো হবে। তাই রঘুনাথ এখন সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। চাইতেন না কিছু। যে যা দিত তাতেই নির্বাহ হতো। চৈতন্যদেব আর একদিন বললেন ভক্তসভায়, রঘু সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে থাকে কেন, বেশ্যাদের মত কে কখন আসবে সে প্রতীক্ষায়? Vantage groundএ (ভিক্ষার অনুকূল স্থানে) দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেইদিন থেকে ঐটিও বন্ধ হল।

থার্ড স্টেজে (তৃতীয় ধাপে) বুঝি আশ্রমে আশ্রমে ভিক্ষা করতেন। এ সম্বন্ধেও কি বলেছিলেন বুঝি। এটাও বন্ধ হলো।

ফোর্থ স্টেজ (চতুর্থ ধাপ) : পচা মহাপ্রসাদ ধুয়ে খেতেন। পূর্বে অন্নের অভাব ছিল না। মহাপ্রসাদ বেশী হলে একটি জায়গায় রেখে দিত। গরুদের আহার। রঘুনাথ রাত্রিতে ওখান থেকে তুলে নিয়ে আসতেন। জলে ধুয়ে খেতেন। মহাপ্রভু খবর পেয়ে তাঁর কুটিরে গেলেন। মহাপ্রসাদ খাচ্ছেন দেখে বললেন, বাঃ রঘু, তুমি যে অমৃত খাচ্ছ! আমায়ও চারটি দাও। বলেই একমুঠো নিয়ে মুখে দিলেন। এটি approve (অনুমোদন) করলেন।

ফিফ্‌থ স্টেজ (পঞ্চম ধাপ) : তখন বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে কি কঠোরই করলেন! ওখানেই দেহ যায়। এখনও সমাধি রয়েছে। সারা দিনে একটু ঘোল খেতেন দোনাতে করে। মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে যাবার আগে বলে দিয়েছিলেন—'গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। আর ব্রজের রাধাকৃষ্ণ ভজিবে।' এই পাঁচটি উপদেশ তাঁ'তে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, নারায়ণ আয়াঙ্গার মশায়কে দেখলে কেমন হয় মনটি! চেহারাতে ভিতরটা বেশ বোঝা যায়।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) যারা বিয়ে করে নাই তাদের সংসার ছাড়া তেমন কিছু নয়। যারা বিয়ে করে ফেলেছে তাদের case (ব্যাপার) একটু কঠিন। তবে কৃপাতে তাও সহজ হয়ে যায়। কিন্তু খাঁটি না হলে টেঁকে না।

একজন সন্ন্যাস নিলো রাগ করে। পরিবার ভাত দিতে দেরী করেছিল। আট দশ বছর হয়ে গেছে। কাশীতে আছে। তার স্ত্রী আর শালী গিয়ে হাজির। একটি বাড়ী ভাড়া করে ওরাও কাশী বাস করছে তারই পাড়ায়। একদিন সকলের মিলন হল। শালী বললে, দিদির ভাত দিতে একটু দেরী হয়েছিল, তাই বলে এমন করে চলে আসতে হয়? চল, বাড়ী চল। তারপর গেরুয়া দেখে বললে, এটা আবার কি পরা হয়েছে? ন্যাও এই ধুতি পর। বলেই গেরুয়া টেনে

ফেলে দিলে। আবার বললে, 'হাঁ, কৌপীন আঁটা হয়েছে আবার। 'খোল, খোল, কৌপীন' শালী ধুতি পরিয়ে দিলে। তখন সুড় সুড় করে পেছন পেছন চললো।

এ সন্ন্যাস কেন? ভোগের জন্য। এ যেন ঠিক স্কুলের ছেলেদের মত। স্কুলে যাচ্ছে দু'ভাই। বড়কে চারটে সন্দেশ দিলে মা। আর ছোটকে দু'টি। ছোট রাগ করে কিছুই খেলে না। উপোস করে স্কুলে চলে গেল। এ ত্যাগ অধিক ভোগের জন্য।

শ্রীম (ভক্তদেব প্রতি)—কিন্তু সাধুসঙ্গ না করলে চৈতন্য হয় না। আমি মাঝে মাঝে ভবানীপুর গিয়ে থাকি। দেখি, সাধুদের এক কাজ। সারা দিনরাত পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান। চব্বিশ ঘণ্টা এক চিন্তা। সাধুরা রাত চারটায় উঠে ধ্যান করেন—তিন চার জন একত্রে বসেন। আমি আবার মাঝে মাঝে চুপি দিয়ে দেখি, তাঁরা কি করেন। কত বড় আদর্শ তাঁদের। দেখলে চৈতন্য হয়ে যায়। সাধুরা রাতদিন তাঁর চিন্তা করছেন। তাঁদের সঙ্গ বড়ই দরকার।

'দীর্ঘকেশ'—আচ্ছা, অন্য সাধু, খুব ভাল লোক, তাঁদের সঙ্গ করলে হবে না?

শ্রীম—অন্য সাধুর সঙ্গ করলে হবে না, তা বলা যায় না। ঠাকুর যে সাধু তৈরী করেছেন তাঁদের আদর্শ কত বড়! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'এইখানেই দেখছি ষোল আনা। অন্যত্র কোথাও দু'আনা, কোথাও চার আনা।' তারাকিশোর চৌধুরী ছিলেন একজন হাইকোর্টের উকীল। পরে সাধু হলেন, নাম সন্তদাস বাবাজী। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে বললেন, 'কি বলবো সাধুদের কথা। মাথায় হাত দিতে হয় সব দেখে। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলাম—কেউ নাম নিয়ে, কেউ যশ নিয়ে, কেউ অর্থ নিয়ে আছে।' বেশীর ভাগই এইরূপ।

'দীর্ঘকেশ' (বিস্ময়ে)—কে, সাধুরা?

শ্রীম—হাঁ, তাইতো বললেন। খাঁটি সাধুর সংখ্যা খুব কম। তাঁদের আদর্শ কেবল ঈশ্বরলাভ।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—লোকে বলে, হাঁ ভাই, উনি আমাদের বাড়ীতে আসার পর আমার মাইনে পাঁচশ' টাকা হয়ে গেল, পূর্বে ছিল মাত্র একশ'। তারপর ছেলেপুলে হল। ঘরের সব রোগ সেবে গেল। ইনি খুব বড় সাধু।

ঠাকুর হাসাবার জন্য বলতেন—লোকে বলে, উনি আমায় একটি 'বস্তু' দিলেন। 'বস্তু' মানে ভস্ম। ওতেই আমার সব রোগ আরাম হয়ে গেল। 'বস্তু'!—(শ্রীম ও সকলের উচ্চ হাস্য)। মানুষ দেহবুদ্ধি কিনা! তাই ঠাকুর ওদিক দিয়ে মোটেই মাড়ালেন না।

একদিন রাত্রিতে জুড়ি গাড়ী নিয়ে হাজির। একজন ঠাকুরকে বললে, মশায়, এক্ষুণি একটিবার যেতে হবে। আমাদের বাবুর বড্ড অসুখ। ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তুমি ভুল করেছ। ঐ পঞ্চবটীতে একজন সাধু আছেন। উনি ওষুধ দেন। আমি কিছু জানি না বাবা। এইখানে খাই দাই আছি।'

আর একদিন কাঙ্গালীরা যেখানে খায় সেখানে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে হাতে ইসারা করে ঠাকুরকে ডাকছে। নিকটে গেলে সে বলছে, আমার মানুষটা কতদিন আসছে না। তুমি সাধু মানুষ, তাকে আনিয়ে দাও কিছু গুণটুন করে। ঠাকুর বললেন, 'না মা, আমি এসব জানি না।'

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—তাই মনে করুন, যেখানে সব সময়ে তাঁর চিন্তা হয়, সেখানে থাকতে পারা কত বড় privilege (লাভ)। তাই গদাধর আশ্রমে পালিয়ে যাই মাঝে মাঝে।

'দীর্ঘকেশ'—আচ্ছা, এমন সাধুও আছেন যাঁদের সমাধি হয়?

শ্রীম—সমাধি, তা চিনবে কে? কি করে বুঝবে? যে যতটা সিঁড়িতে উঠেছে সে ততটা সিঁড়িরই খবর দিতে পারে। It is a question of evidence (ইহা যে সাক্ষ্যের বিষয়)। অনেকে হয়তো মনে করেন 'এইটেই আমাদের সমাধি।' সমাধিবান 'নাই' বলা যায় না। কিন্তু চিনবে কে?

রাত্রি দশটা।

৩

পরদিন রবিবার। সকাল দশটা। শ্রীম তিনতলার উত্তরের ঘরে আছেন। নীচে মর্টন স্কুলের 'সৎপ্রসঙ্গ সভা' চলিতেছে। উহা শেষ হইলে জগবন্ধু, বিনয় ও ছোট অমূল্য শ্রীমর-নিকট গেলেন। তিনি বিছানায় বসা। ডায়েরীর পাতা উল্টাইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—শুনুন, ভক্তির definition (সংজ্ঞা) কি দিচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা করা ভক্তি। আবার একজনেব প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞান কি, তা বলেছেন। জ্ঞান কি? না, তিনিই সব করছেন। আর অজ্ঞানে মনে হয় 'কিছু তিনি করছেন, কিছু আমি'। এমন কি 'ভাল তিনি করছেন, খারাপ আমি করছি'—এও অজ্ঞান। সব তিনি করছেন—ইহা জ্ঞান।

শ্রীম (ছোট অমূল্যের প্রতি) আহা, শম্ভু মল্লিক গাড়ী পাঠিয়ে গেটে অপেক্ষা করতেন। ভালবাসা হয়েছিল। ভালবাসা হয় ভক্তি থেকে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুরের একটা কথা সারা জীবন চিন্তা করলেই ঢের। কি কাজ বেশী কথায়! দেখুন না, বলছেন, ভক্তি কি? না, কায়মনোবাক্যে তাঁব ভজনা। এটি চিন্তা করলে রক্ষে নেই!

শ্রীমর অনুমতি লইয়া জগবন্ধু, বিনয় ও ছোট অমূল্য দক্ষিণেশ্বর রওনা হইলেন। কাশীপুরে ডাক্তারের গৃহে ভোজন করিলেন। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। বিনয় ও অমূল্য আজ রাত্রে জগবন্ধুর সহিত স্কুলবাড়ীতেই রহিলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার। আজ মাঘী পূর্ণিমা। আবার চন্দ্রগ্রহণ। শ্রীম আদি গঙ্গা স্পর্শ করিতেছেন গদাধর আশ্রমের সামনে। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমর সঙ্গে আছেন ডাক্তার, জগবন্ধু, বিনয়, মণীন্দ্র ও ভবানীপুরের ভক্তগণ।

গদাধর আশ্রমের নীচের ঘরে শ্যামনাম কীর্তন হইতেছে। সনৎ

পরিচালক। শ্রীম দোতলার ঘরে বসা। ডাক্তার ও জগবন্ধুকে বলিতেছেন, 'আজ মাঘী পূর্ণিমা। আমরা সকালে কালীঘাটে গিছলাম। আজ কালীঘাটে যাওয়া খুব ভাল।'

রাত্রি সাড়ে নয়টা। ভক্তরা কালীঘাটে যাইতেছেন। বিনয়, জগবন্ধু, সতীশ ও পান্নালাল চলিলেন। আদি গঙ্গা স্পর্শ করিয়া তাঁহারা মা-কালীকে দর্শন করিলেন। তারপর কেওড়াতলা শ্মশান ও নকুলেশ্বর শিব দর্শন করিয়া গদাধর আশ্রমে ফিরিয়াছেন। কালীঘাটের বেগুনী সঙ্গে আনিয়াছেন।

রাত্রি বারটা। শ্রীমর ঘরে ছোট জিতেন, ডাক্তার প্রভৃতি ভক্তগণ উপবিষ্ট। মণীন্দ্র 'কথামৃত' পাঠ করিতেছেন, 'চৈতন্যলীলা'। কালীঘাট হইতে ভক্তরা ফিরিয়াছেন। পাঠ চলিতেছে। শ্রীম ভজন গাহিতে লাগিলেন—'গৌর নিতাই তোমরা দু'ভাই পরম দয়াল।' 'হে প্রভো, গৌরনিতাই।'

পাঠও শেষ হইল, গ্রহণও শেষ হইল। শ্রীমকে ভক্তরা কালীঘাটের একটি বেগুনী-প্রসাদ দিলেন। খাইতে খাইতে বলিলেন, 'বাঃ, বেশ তো!'

২১শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার। সকাল, বেলা আটটা। শ্রীম দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন গদাধর আশ্রমে। জগবন্ধু ও বিনয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন আশ্রমের অসচ্ছলতার বিষয়ে। তারপর নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দক্ষিণাস্য কার্পেটের ওপর মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঈশ্বর মহারাজ প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (ঈশ্বর মহারাজের প্রতি)—তোমরা দেখেছ গাছে কথা কয়? স্যার জে. সি. বোসের ইনস্টিটিউটে এ সব দেখান হয় যন্ত্রের সাহায্যে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—দেখে আসুন তো, ললিত মহারাজ নীচে কি করছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ব্যাখ্যা হইতেছে শুনিয়া শ্রীম নীচে নামিয়া গেলেন। মেঝেতে উত্তরাস্য বসিয়াছেন। পাশে জগবন্ধু, বিনয় ও

দেবেনবাবু। কয়েকজন ছাত্র পাঠ শুনিতেছেন। জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ চলিতেছে। পরস্ত্রী মাতৃসমান, এটি বৈদিক সভ্যতার একটি প্রধান শিক্ষা।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ (শ্রীমকে দেখাইয়া ছাত্রদের প্রতি)—তোমরা এঁকে জান? ইনি কথামৃত লিখেছেন। ইনি আমাদের অমৃত দিয়েছেন। আমরাও এঁকে এই অমৃত দিচ্ছি।

পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম (প্রথমে দেবেনবাবুর প্রতি, পরে জগবন্ধুকে)—ঠাকুর কিন্তু বলেছিলেন ব্রহ্মানন্দের কাছে, রম্ভা তিলোত্তমা চিতাভস্ম বলে মনে হয়। পরস্ত্রীর কথা আর বেশী কি? আহা, কত বড় কথা বলেছেন! যাজ্ঞবল্ক্য থেকে কত উঁচু কথা। কোনও অবস্থায় বলতেন, বেদটেদগুলো খড়কুটোর মত মনে হয়।

পরদিন শ্রীম দশটায় ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়াছেন ভবানীপুর থেকে। অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় মর্টন ইনস্টিটিউশানে আসিলেন। বেলা পাঁচটার সময় নীচের তলায় আসিয়া বসিলেন বেঞ্চিতে রোয়াকের উপর। সামনেই লোহার ঘোরান সিঁড়ি। শ্রীম উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছেন। বাঁ পাশে বেঞ্চিতে একটি ভক্ত বসা। ইনি খড়গপুর হইতে আসিয়াছেন। সঙ্গে বালক পুত্র। দেখিতে দেখিতে নিত্যকার ভক্তরাও আসিয়া উপস্থিত। শ্রীম কখনও গদাধর আশ্রমে, কখনও এখানে থাকেন। তাই অনেকের সঙ্গে নিত্য দেখা হয় না। আজ দৈবাৎ দেখা হইয়া গেল। বড় জিতেন, সুশীল, তিনজন নূতন লোক, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি রহিয়াছেন। কখনও হাসিতামাসা, কখনও গাম্ভীর্য, এইভাবে কথাবার্তা চলিতেছে।

নবাগত—একজন গোবিন্দের মন্দিরের সম্পত্তি রক্ষার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল কোর্টে। আমার মনে হয় ভাল কাজ করেছে।

বড় জিতেন—গোবিন্দের জন্য হলেও মিথ্যা কথা বলা হলো তো! সে যে মহাপাপ!

নবাগত—বেশী বলে নাই তো।

বড় জিতেন—তু' একটা তো বলেছে (শ্রীম ও সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীম—এসব কথা আমাদের এ-কান দিয়ে ঢোকে, ও-কান দিয়ে বের হয়ে যায়।

নবাগতগণ চলিয়া গেল।

শ্রীম (গম্ভীরভাবে)—সবই তিনি করেছেন। আমরা বলি, আর নাই বলি। ঠাকুর বলতেন, এখানে আমার নিকট আসছে? থ্যাক্ থু! ছি ছি! মার কাছে আসছে। তিনি দেখতেন সবই মা করছেন। বৃক্ষলতা জমি জল শস্য—সবই তিনি করেছেন। আবার তিনিই সব হয়ে আছেন। এ-বিশ্বাস যদি হলো তবে তো সবই হয়ে গেল। বাকী রইল কি? সে যে জীবন্মুক্ত! কিছুতেই তাকে আব বদ্ধ করতে পারবে না। সে দেখেছে, আমরা সব তাঁর কাজ করছি। জ্যাঠামী করলে কি হবে? জ্যাঠামী করে বলছি, আমরা করছি। তা বলবার কি যো আছে?

শ্রীম (ভক্তদেব প্রতি)—কি আশ্চর্য! একবার দেখুন না, শুক্র-শোণিতেব মিলনে এইটুকু মাংস বেড়ে বেড়ে এই দেহ হলো। তা থেকে আবাব মন, বুদ্ধি। এই মন-বুদ্ধি কি wonderful (আশ্চর্য) জিনিসই তিনি করেছেন। আবার সেই মন-বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা হচ্ছে। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দিয়ে অতি বৃহতের দর্শন হচ্ছে। কি আশ্চর্য কাণ্ড! কিছুই বোঝবার যো নাই! কেবল শরণাগত, শরণাগত। জন্মের আগের খবর নাই, মৃত্যুর পরের খবরও নাই। মাঝখানে এই দিনকয়েকের জন্য কর্তা সাজা। কি মহা আশ্চর্য কাণ্ড!

মর্টন স্কুলের শিক্ষক বিমল আচার্য উপর হইতে নামিলেন। শ্রীম তাঁহাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ, বিমলবাবু, আপনারা বুঝি ডিম খেয়েছেন? তা, সঙ্গে একটু গঙ্গাজল দিয়ে খাবেন (সকলের উচ্চহাস্য)।' বিমল চলিয়া গেলেন। শ্রীম ভক্তদের বলিতেছেন, 'ব্রাহ্মণ কি না, তাই বললাম গঙ্গার কথা।'

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে একজন লোক আসিয়াছেন। উহার সত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখার্জী তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি

শ্রীমকে অনুরোধ করিতেছেন, ‘কথামৃত’ মাসিক বসুমতীতে বাহির করিতে। কাগজপত্র ও লেখকের খরচের জন্য অর্থগ্রহণের কথাও বলিলেন। শ্রীম উত্তর করিলেন, ‘আমরা যে যে paperএ (সাময়িক পত্রে) contribute (প্রবন্ধ প্রদান) করেছি কোনখান থেকেই টাকা নিই নাই। আমাদেরই interest (আগ্রহ) আছে আর একটা পার্ট বের করবার।’

শ্রীম (অন্তেবাসীর কানে কানে)—সঙ্গে পয়সা থাকে তো দু’ আনার রসগোল্লা আর দু’ আনার সিঙ্গাড়া নিয়ে আসুন।

মিষ্টিমুখ করিয়া খড়গপুরের ভক্ত বিদায় লইলেন। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে।

শ্রীম নিজের ঘরে বসিয়া আছেন চারতলায়। ধ্যানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। পাশের পার্টিশানের ঘরে জগবন্ধু ও বিনয় অতি ধীরে প্রবেশ করিলেন। কেহ আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে গা?’ জগবন্ধু বলিলেন, ‘আজ্ঞে আমি ও বিনয়।’ শ্রীম বলিলেন, ‘আসুন, ভিতরে বসুন।’ তাঁহারা বিছানার দক্ষিণের বেঞ্চিতে বসিয়াছেন। শ্রীম বিছানায় পশ্চিমাস্য। সকলে ধ্যান করিলেন আটটা পর্যন্ত। এবার বড় জিতেন গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডান সাহেবের মৃত্যুর কথা বলিতেছেন। ডানসাহেব ইংলিশম্যান। সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্রের জলে নৌকাডুবিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইনস্‌পেক্টার অব স্কুলস্‌ ছিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—তাইতো তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়। কখন হয়ে যায় তার নাই ঠিক। ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন কখন কি হবে। তুমি কেবল তাঁকে চিন্তা কর। তিনি করবেন সকলের চিন্তা।

সবই তিনি করে রেখেছেন—লেপ হবে বলে তুলো পর্যন্ত। চন্দ্র সূর্য জল বায়ু শস্য সব ঠিক করে রেখেছেন, যা যা দরকার। ‘আমি আমি’ করে জ্যাঠামী করেই যত মুশকিল করে লোক।

তাঁর নানা ডিপার্টমেণ্ট আছে। যারা spiritual (আধ্যাত্মিক) ডিপার্টমেণ্টের, তারা খালি তাঁর চিন্তা করবে। কিসে তাঁর দর্শন হয় সর্বদা সেই চেষ্টা। তাঁরা কারণশরীরের আহারের জন্য ছুটাছুটি করছেন। তিনি বলতেন, এই স্থূলশরীরের ভিতর সূক্ষ্মশরীর রয়েছে। তার ভিতর কারণশরীর। তার ভিতর মহাকারণ। মহাকারণ মানে ঈশ্বর। ভক্তরা এই কারণশরীর দিয়ে তাঁকে দর্শন করেন। কখনও কারণ মহাকারণে লয় হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়। ঠাকুর এই কারণশরীরকে বলতেন ভাগবতী তনু। এই শরীরে নিত্য আহার দিতে বলেছিলেন।

সেকেণ্ড ডে-তে (দ্বিতীয় দিনে) আমায় বলেছিলেন এই কথা। আমি বলেছিলাম কিনা—তা'হলে সকলকে বলে দেওয়া উচিত মাটির পুতুলকে পূজা না করে। ঠাকুর শুনে বললেন, এই যা! তোমাদের কলকাতার লোকদের এই দোষ। খালি লেকচার দেয়। তখন ব্রাহ্মসমাজে এইসব কথা হতো কি না। ঠাকুর তক্ষুণি বলে দিলেন, তুমি তাঁকে ডাক। আলাদা থাক আছে যারা ওসব করবে।

এইটি অবতারের আদেশ—'তুমি তাঁকে ডাক'। এইটি আমাদের করা উচিত। এইটিই আদর্শ। তুমি নিজেকে সামলাও। তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন। তোমার কিছুই ভাবতে হবে না।

শ্রীম (আক্ষেপের সহিত)—ঠাকুরের কাছে এই মহাবাক্য শুনেছি। কিন্তু এই দুঃখ রইল, নির্জনে নিশ্চিন্ত মনে তাঁকে ডাকতে পারলাম না। এমন অতুল ঐশ্বর্য তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। এই ঐশ্বর্য উপভোগ করতে পারলাম না নিশ্চিন্ত হয়ে। তাঁর এই সব মহামন্ত্র ভাবতে পারলাম না, এই দুঃখ রয়ে গেল।

শ্রীমর এই মনোন্নয়নকারী মধুর ও বলিষ্ঠ আক্ষেপোক্তি আরও কিছুক্ষণ চলিত। ভক্তগণ পর পর গৃহে প্রবেশ করাতেই সেই ভাবপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রথমে ডাক্তার, পরে ছোট জিতেন ও রমণী আসিলেন। সকলের শেষে বীরেন।

শ্রীম আহার করিতে যাইতেছেন তিনতলায়। পাছে বাজে কথা

হয় সেইজন্য 'কথামৃত' তৃতীয় ভাগ হাতে লইয়া, দ্বাদশ খণ্ড বাহির করিলেন। জগবন্ধু পাঠ করিতেছেন। তিনি এখন নীচে গেলেন।

শ্রীম আহারান্তে ফিরিয়াছেন। সুখেন্দুর পত্র রমণী পড়িয়া শুনাইতেছেন। তিনি এবার অর্ধকুম্ভে এলাহাবাদ গিয়াছেন। দীনেশ রেঙ্গুনে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন, ভক্তসভায় এ সংবাদও আসিয়াছে।

শ্রীম (ভক্তগণের প্রতি)—কর্ম ফুরালেই চলে যেতে হয়। আর থাকবার যো নাই। আমাদের ফ্রেণ্ড দীনেশ চলে গেলেন।

কর্ম সকলকেই করতে হয় একটু আধটু। সব তাঁর কর্ম করা যাচ্ছে জেনে করলে আর গোল বাধে না।

সত্ত্বগুণী কর্মীর লক্ষণ আছে। তিনি হবেন 'মুক্তসঙ্গ' আর 'অনহংবাদী'। 'ধৃত্যোৎসাহ সমন্বিত' আর 'সিদ্ধাসিদ্ধ নির্বিকার'। তমোগুণীর কর্ম আলাদা, যেন আঠার মাসে বছর।

কিন্তু সকলকেই কিছু না কিছু কর্ম করতেই হবে। তাঁর এই সৃষ্টিতে সকলেই একটু co-operation (সহযোগ) করতে হয়। এখানে non-cooperation (অসহযোগ) চলে না।

আর একটি কথা ঠাকুর বলেছিলেন, মনে আসছে না। কি কথাটা—এ-ই-ই, হাঁ। ঠাকুর বলতেন, 'তিনি একবারে বুড়ীকে ছুঁতে দেন না। একটু খেলিয়ে নেন্।' একবারে ছুঁলে এই খেলা (সৃষ্টি) চলবে কি করে?

রাত্রি সাড়ে নয়টা।

মর্টন ইনস্টিটিউশন
৫০নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ
শুক্রবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল

দ্বিতীয় অধ্যায়

সব যেন দম-দেওয়া পুতুল

১

শ্রীম দোতলার বসিবার ঘরে উপবিষ্ট। এখন অপরাহ্ন তিনটা। আসামের ডাক্তার অক্ষয় আসিয়াছেন, সঙ্গে একজন বন্ধু। পড়াশোনা করার সময় হইতে অক্ষয় শ্রীমর পরিচিত। সুখেন্দুও কুম্ভমেলা হইতে ফিরিয়াছেন। ভোলানাথ, জগবন্ধু প্রভৃতিও আছেন। আজ ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪। ১১ই ফাল্গুন ১৩৩০ সাল, শনিবার।

শ্রীম (অক্ষয় ও সঙ্গীর প্রতি)—'সা চাতুরী চাতুরী'। যে চাতুরীতে সংসারে থেকেও ঈশ্বরের দিকে মন থাকে সেই চাতুরীই চাতুরী। অন্য চাতুরীতে কি হবে? মৃত্যু যে হাঁ করে রয়েছে! এক নিমেষে সব নিয়ে যাবে!

চিড়াভেজা বুদ্ধির কর্ম নয়। খাসা বুদ্ধি চাই। তারই কথা এখানে বলা হয়েছে। এই যে objectionable environments (প্রতিকূল পরিবেশ), এর ভিতর থেকে তাঁকে স্মরণ রাখা। এরই নাম চাতুরী। একেই ঠাকুর বলেছেন খাসা বুদ্ধি।

তাঁরই অবিদ্যামায়াতে ভুলিয়ে দেয় মানুষের divine origin (ভগবৎ-সম্পর্ক)। ভগবানের সন্তান মানুষ, সচ্চিদানন্দ তার স্বরূপ। অবিদ্যামায়া এটা ভুলিয়ে দেয়। বিদ্যামায়ার আশ্রয় তাই নিতে হয়। সাধুসঙ্গ হল সেটি—অর্থাৎ বিদ্যামায়া। সাধুরা সর্বদা এটি স্মরণ রাখেন। কি? না, তাঁর অবিদ্যামায়া সব ভুলিয়ে দেয়। তাই বিদ্যামায়াকে প্রার্থনা করেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' এই অবিদ্যার ভিতর থেকেও যে বিদ্যার আশ্রয় নেয় সেই ধন্য। কি না, আমি ঈশ্বরের সন্তান অনন্ত কাল ধরে। সংসারে পড়েছি তাঁরই অবিদ্যায়। তাই নিজে চেষ্টা করে এটা মনে রাখা, আর প্রার্থনা করা যাতে আর ভুল না হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কেউ জানেন শ্লোকটি ?

মোহন—যা রাকাশশীশোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী।
যা সৌন্দর্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী॥
যা গোবিন্দরসপ্রমোদমধুরা সা মাধুরী মাধুরী।
যা লোকদ্বয়সাধনীতনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—রাত্রির মধ্যে পূর্ণিমারাত্রি শ্রেষ্ঠ। 'রাকা' মানে চতুর্দশীর শেষ আর পূর্ণিমার প্রথম। সেই সময় চন্দ্রের কিরণ খুব উজ্জ্বল হয়। স্ত্রীলোকের ভিতর সতী শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরীয় মাধুর্যে মুক্ত হয়, বৈষয়িক মাধুর্যে বদ্ধ হয়—তাই ঈশ্বরীয় মাধুরী শ্রেষ্ঠ। আর যে বুদ্ধিচাতুর্যে সংসারও করা হয় আর অন্তে ঈশ্বরলাভ হয় সেই বুদ্ধির চাতুরীই শ্রেষ্ঠ চাতুরী।

ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, কি রকম বুদ্ধি গো, চিড়াভেজা বুদ্ধি তো নয়? একজন ঠাকুরকে বলছেন, ইনি বড় বুদ্ধিমান। তা'তেই ঠাকুর ঐ কথা বললেন। আবার জিজ্ঞাসা করছেন, এর অর্থ বুঝতে পারলে না বুঝি?' তারপর নিজেই অর্থ করছেন। যে-বুদ্ধিতে ভগবানলাভ হয় তার নাম খাসা বুদ্ধি। আর যে বুদ্ধি দিয়ে এদিককার সব হয়—গাড়ী ঘোড়া, ধন, ঐশ্বর্য, নাম, যশ—এই সব লাভ হয় তাকে বলে চিড়াভেজা বুদ্ধি, অর্থাৎ হীনবুদ্ধি। (সহাস্যে) তারপর বললেন, কামারপুকুরে তিন রকম দই পাওয়া যায়। খাসা দই, পাত্র উলটিয়ে ধরলেও পড়বে না। মাঝারী, একরকম আছে। আর এক রকম আছে, তা'তে জলের কাজ হয়—জলবৎ তরল। চিড়া জল দিয়ে ধুয়ে তারপর দই দিয়ে মেখে খায়। এই দই জলের কাজও করে, দইয়ের কাজও করে, তাই চিড়াভেজা দই বলে। জলের মত পাতলা। মানুষের বুদ্ধিও তেমনি। চিড়াভেজা বুদ্ধি মানে বিষয়বুদ্ধি, হীন বুদ্ধি, হাল্কা বুদ্ধি। খাসা বুদ্ধি মানে ভগবৎ-বুদ্ধি। (গানের সুরে) 'যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি)—কাশীতে ঠাকুর যেসব স্থানে গিছলেন তা দেখেন নাই বুঝি? সেসব দেখতে হয়। মহাতীর্থ সব। কেদার-

ঘাটে গিছলেন? রাজাবাবুদের বাড়ীতে থাকতেন। ঐ ঘাটের সঙ্গেই। হাত দিয়ে ধরা যায় এত কাছে। আমরা ওখানে গিছলাম।

অপরের কাছ থেকে জেনে নিতে হয় আগে। তারপর দেখা। লক্ষ্ণৌ থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে শুনেছি নৈমিষারণ্য। বড় ভাল জায়গা। এসব দেখলে উদ্দীপন হয়। কত সব ঋষিরা তপস্যা করেছেন।

শ্রীম (অক্ষয়ের প্রতি)—সুখদুঃখ আছেই। এর হাত থেকে রক্ষা নাই, দেহ যতদিন আছে। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ, দেখ তাঁর কত দুঃখ। নারদ দর্শন করতে গেলে তাঁকে বললেন, আমার কোন দিকে যাবার যো নেই। কারুকে ভালবাসার যো নেই। একজনকে ভালবাসলে হয় আর একজন নারাজ। তাই অন্তরে রাখতে হয় ভালবাসা। আমার অবস্থা কাঠের মত।

কাঠ ঘষে ঘষে আগুন জ্বালায়। একে ঘর্ষণ, তা'তে আবার অগ্নি, দু'দিকে জ্বালা। হরিবংশ, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে তাঁর কথা আছে। সব কথা reliable (বিশ্বাসযোগ্য) যদিও নয় তবুও একটা glimpse (আভাস) পাওয়া যায়, সেই mighty personality-র (বিরাট পুরুষের) একটা পিক্‌চার (ছবি) পাওয়া যায়।

দুঃখ কষ্ট না হলে কি চরিত্র তৈরী হয়? বিবেকানন্দ তাই বলতেন, যার দুঃখ কষ্ট হয় নাই জীবনে সে যে baby (শিশু), বয়সে বৃদ্ধ হলেও। 'বন থেকে বেরলো টিয়া সোনার টোপর মাথায় দিয়া।' ওদেশ থেকে এসে বলেছিলেন এই মহাসত্যটি। যাদের জীবনে বিপদ হয় নাই, যারা দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জরিত হয় নাই, তারা শিশু। দুঃখ কেন দেন তিনি? মহৎ কাজ করাবেন বলে, majestic heightএ (তুঙ্গ শিখরে) তুলবেন বলে।

শ্রীকৃষ্ণের এই দুঃখের কথাটি নারদ বিশ্বদেবকে বলেছিলেন। ইনি আবার যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন দুর্দিনে। বলেছিলেন, এই যে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং ভগবান, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, তাঁর কত দুঃখ সহ্য

করতে হচ্ছে। জ্ঞাতিদের দারুণ যন্ত্রণা সয়েছেন। আবার চোখের সামনে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল। নিজের পুত্র-পৌত্রাদি সব মরলো পরস্পর মারামারি করে। অপরের দুঃখ হবে তা'তে আর আশ্চর্য কি।

শ্রীম চুপ করিয়া আছেন।

সুখেন্দু (শ্রীমর প্রতি)—মনোরঞ্জন শুকলালবাবুকে না জানিয়ে কাশী যাবার ইচ্ছা করেছেন।

শ্রীম—জানালে কি সব হয়? কর্ম কি ছাড়ে? একটি ভক্ত (শ্রীম) ঠাকুরের দেশ দেখতে গিছলেন। তিনি রিপণ কলেজে পড়াতেন। তা'তে কর্মটি গেল। তিনবার এমনতব হয়েছিল তিনবারই নূতন কর্ম খুঁজে নিতে হয়েছিল।

সুখেন্দু বিদায় লইলেন। শ্রীমও নীচে গেলেন হাত মুখ ধুইতে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন। কথাবার্তা হইতেছে। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, ভোলানাথ, অক্ষয় প্রভৃতি রহিয়াছেন। শ্রীমর ইচ্ছায় ভোলানাথ মুখার্জী একটি গান গাহিতেছেন—'শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি'। 'বিকল্পবিহীন সমাধিবিলীন ব্রহ্মে চির লীন আসন তোমার।' তারপব শ্রীম একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তাহার মর্ম—ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবকে বরণ করা অনুচিত। নিজেই তাহাব ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যেটুকু 'ধ্রুব', মানে নিশ্চয়রূপ জানা আছে, সেটুকু করা ভাল। অধ্রুবকে বিশ্বাস করতে নাই। 'অধ্রুব' মানে, যার সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান নাই। অর্থাৎ, যা সহজাত ও সহজ তাই করবে। 'অধ্রুব' করতে গেলে কোনটাই হবে না। জানাটাও নষ্ট হবে।

অনেকে বলে, 'টাইম্ নাই', 'নির্জন কোথায় পাব'—এসব ওজর আপত্তি যত ঈশ্বরভজনের বেলায়। কেন? রাত্রিটা যে পড়ে আছে। তখন কর না। আর ছাদে বসে কর, নির্জন। সব নীচে ঘুমুচ্ছে তখন ভোঁস্ ভোঁস্ করে। কি বলে?—'যে খেলে, সে কানাকড়িতে খেলে।'

শ্রীম (অক্ষয়ের প্রতি)—মঠে গিছলেন আপনারা? মঠে যেতে হয়। আর মঠের সব minutely (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে) দেখতে হয়। কোথায় রান্না হচ্ছে, কোথায় তার যোগাড় হচ্ছে, সব দেখা উচিত। তারপর গোশালা, বাগান, এসবও খুঁটিনাটি দেখতে হয়। শুধু ঠাকুরঘরটি দেখলে মঠ দেখা হলো না। সমস্ত ছবিটি চাই। ভাল করে দেখা থাকলে ধ্যানের সময় সব ফস্ করে মনে আসবে।

প্রথমে ধ্যান করতে হয় হাতের অলঙ্কার, তারপর আঙ্গুল। তারপর সব অঙ্গ দপ্ করে মনের সামনে এসে পড়ে। সাকার ধ্যানের এই নিয়ম।

লোকে যে তীর্থে যায়, সেখানেও এই রকম করতে হয়। ভাল করে সব দেখে নিতে হয়। রোজ তো আর যেতে পারে না। খুব ভাল করে দেখে এলে রোজ ঐসব আবার দেখা যায় ধ্যানে। এখানে বসেও তীর্থ করতে পারবে তখন মনে। শরীরটা নাই বা গেল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আমাদের original knowledgeও (প্রথম জ্ঞানও) এই করে হয়েছে। দেখে দেখে হয়েছে। ঠাকুরের মহাবাক্য রয়েছে আবার। মনই সব। মন যেখানে, তুমিও সেখানে।

দুই বন্ধুর একজন গেল বেশ্যালয়ে, আর একজন ভাগবতপাঠে। যে বেশ্যালয়ে গেল তার মন রইল ভাগবতপাঠে। আর যে রইলো ভাগবতপাঠে তার মন গেল বেশ্যালয়ে। মৃত্যুর পর একে নিয়ে গেল যমদূত নরকে। আর ঐ ব্যক্তি গেল বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুদূতের সঙ্গে।

মনে করুন, একজন কালীঘাট দর্শন করতে গেল। প্রথমে মাকে দর্শন করা উচিত। অবশ্য আদি গঙ্গা স্পর্শ করবে। তারপর মায়ের শোবার বিছানা, ভৃঙ্গার যাতে জল রয়েছে, ঘণ্টা, দেয়াল, ভিতরের সিঁড়ি, এই সব small thingsও (ছোটখাট দ্রব্য) দেখা উচিত। বাইরে গিয়ে নাটমন্দির, ভক্তদের ধ্যানমূর্তি, বলির স্থান, এসব দেখবে। মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে গেলেও এইরূপ করতে হয়। বলরামবাবুর বাড়ী, গিরিশবাবু ও রামবাবুর বাড়ী, এসবও ভক্তদের দেখা উচিত। ঠাকুর এসেছিলেন এসব স্থানে, তাই তীর্থ। আদি নববিধান ও সাধারণ

ব্রাহ্ম সমাজেও গিছলেন। আবার 'সোসাইটির' কথাও বলেছিলেন। ওখানে তার দিয়ে skeleton (কংকাল) বেঁধে রেখেছে, দেখেছিলেন। এসব দর্শন করতে হয়।

কেন করতে হয় এসব দর্শন? মানে, মন একেবারে ঠাকুরে মগ্ন হয় না। এসব সামান্য জিনিসে অনায়াসে মনকে রাখা যায়। তার ধর্মই এই, সে concrete (স্থূল জিনিস) ছাড়া ভাবতে পারে না বেশী। সামান্য একটা জিনিসে মন থাকলেও ওর দ্বারা আসল বস্তুতে, ইষ্টেতে মন যায়। তখনই আদর্শের কথা মনে হয়। শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভগবানকে ধ্যান করা, তাঁকে দর্শন করা এই জীবনেই।

পূজা করে লোক ফুল চন্দন ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিয়ে কেন? ঐ কারণ। এসব বাহ্যপূজা। এ দিয়ে ভিতরে সূক্ষ্ম তাঁকে চিন্তা করতে পারবে বলে। স্থূলের সহায়তায় সূক্ষ্মে মনকে নেওয়া। মানসপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। ওটা প্রথমে হয় না, তাই বাহ্যপূজার দরকার। Advanced stageএ (সাধনায় অগ্রসর হলে) মানসপূজা হয়। ঈশ্বরকে মন প্রাণ শরীর সব অর্পণ করে ফেলে তখন। বাকী রাখে নি কিছুই। তাই মনে পূজা।

অক্ষয়ের সঙ্গী (শ্রীমর প্রতি)—আমরা অর্থ উপায় করি। কিন্তু কি ভাবে তা ব্যয় করা উচিত তা জানি না। এ সম্বন্ধে একটু বলে দিলে ভাল হয়। আপনারা না বলে দিলে কে আর বলবে আমাদের?

শ্রীম—যা উপার্জন করা যায় সবই দিতে হয় তাঁকে। কিছু দিলাম, কিছু না, তা হয় না। খানিকটা তোমার, খানিক আমার, এ চলবে না। সবই তাঁকে দিতে হয়। তাঁকে তো আর দেখা যায় না, এখন কোথায় দেওয়া? কোথায় দিলে তিনি পান? কোথায় তাঁর প্রকাশ বেশী? যেমন জল সর্বত্রই আছে বটে, কিন্তু প্রকাশের তারতম্য আছে। কূপ থেকে পুকুরের বেশী প্রকাশ। তারপর নদী, সাগর।

মন্দিরাদিতে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী। তিনি ইচ্ছা করে এসব স্থানে প্রকট হয়ে ভক্তের পূজা নিচ্ছেন। দুঃখী লোক তাঁকে ডেকে ডেকে এসব স্থানে জাগ্রত করেছে। তাই উপার্জনের প্রথম চতুর্থাংশ

দিতে হয় এসব স্থানে তাঁর পূজায়। দ্বিতীয় ভাগ, সাধু ভক্তের সেবায়। সাধু ভক্তে তাঁর প্রকাশ বেশী অন্য লোক থেকে। তৃতীয় অংশ দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। দরিদ্রনারায়ণেও তাঁর প্রকাশ বেশী অপরেব চাইতে। দুঃখে মানুষ তাঁকে স্মরণ করে বেশী। তাই তাদের ভিতর বেশী প্রকাশ। তারপরের অংশ, অর্থাৎ শেষের এক-চতুর্থাংশ পরিবারের সেবায় খরচ করা। নিজের familyতে (পরিবাবে) ভগবানের বেশী প্রকাশ দেখলে চলবে না (সকলের হাস্য)। ঠাকুর বলেছিলেন, ছেলেকে ভালবাসবে, সেবা করবে—কিন্তু গোপালভাবে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—সর্বদাই যোগে থাকতে হয়—কখন কাল আসে তার যখন ঠিক নাই! তাঁর নাম করতে হয় মনে মনে। যেমন ঘড়ির কাঁটা টক্‌টক্ করে সর্বদা। এই দেখুন না, আমাদের প্রিয় ভক্ত দীনেশবাবু চলে গেলেন। কখন দেহ যায় নিশ্চয় নাই। তাই যাতে আমরা যোগভ্রষ্ট না হই, সর্বদা এটা লক্ষ্য বাখা উচিত।

শ্রীম (সঙ্গীর প্রতি)—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥

এটি কর্মযোগের কথা। গীতায় আছে। ভগবান স্বয়ং এই কর্ম ব্রহ্মাকে বলেন। ব্রহ্মা বলেন মনুকে। মনু বলেন ইক্ষ্বাকুকে। তারপর অনেক কাল লোক ভুলে গিছলো। আবার ভগবান অর্জুনকে বললেন এই গুহ্য কথা। বড় প্রিয় যারা তাদের বলে থাকেন অবতারগণ। কৃষ্ণ বলেছেন অর্জুনকে। আর ঠাকুর বললেন আমাদের। আমরা তাঁরই কথা আপনাদের শোনাচ্ছি।

তাই পুত্রকে গোপালভাবে সেবা করতে হয়। কোন আশা নিয়ে নয়। কি, আমি এখন তার সেবা করছি, সে বড় হলে আমার সেবা করবে, এই ভাব নিয়ে নয়। এরূপ কোন returnএর (প্রতিদানের) আশায় নয়। ভগবান এইরূপে এসেছেন আমার কাছে, এই ভাবে। এরই নাম নিষ্কাম সেবা। সকলের উপরই এই ভাব রাখা ক্রমে।

যোগী হতে বলেছেন ভক্তদের। ‘তস্মাৎ যোগী ভব, ‘তস্মাৎ

সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর'—এই সব মহাবাক্য রয়েছে গীতায়। যোগীর লক্ষণ বলেছেন ঠাকুর। পাখী ডিমে তা দিচ্ছে। মারো, উঠবে না। কিন্তু অন্য পাখী একটু কিছুতেই উড়ে যায়। যোগীদের সেই অবস্থা। মন পড়ে আছে ঈশ্বরে। বাইরে হয়তো সব কাজ করছে। যোগী ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন।

লোকে বলে—মশায়, নির্জনে ধ্যান করতে বলেছেন ঠাকুর। এখন নির্জন পাই কোথায় ? দিনরাত কাজকর্ম করতে হচ্ছে। এর উত্তর—রাত্রে কর তাঁর ধ্যান। রাতটি দিয়েছেন কেন ? ভক্তরা তখন তাঁকে ডাকবে বলে। যারা তাঁকে ডাকবে তারা জাগবে। অন্যরা ঘুমুবে। যোগী জাগে, ভোগী ঘুমোয়।

২

শ্রীম ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন। জগবন্ধু পড়িতেছেন। মঙ্গলাচরণের ভগবানের ধ্যান পড়া শেষ হইল। অক্ষয় ও সঙ্গী বিদায় চাহিলেন। শ্রীম বলিলেন, একটু শুনে যান। এই নৈমিষারণ্য আরম্ভ হল মাত্র।

কংসবধের সময় ভগবান মথুরায় গিছলেন। তখন এক তাঁতীর ছেলে বড়ই সেবা করেছিল। ঠাকুর বৈকুণ্ঠ থেকে একটি রথ পাঠিয়ে দিলেন প্রসন্ন হয়ে, তাকে নিয়ে যেতে। সে-রথ দেখেই তার মা বলে উঠলো, 'ও ঠাকুর, স্বর্গে গেলে তাঁত বুনবে কে ? তাঁতীর ছেলে স্বর্গে গেলে বন্ধ হবে তাঁতবোনা। ও ঠাকুর, অমন কাজটি করো না।' (সকলের হাস্য)। (অক্ষয় ও সঙ্গীর প্রতি) এই তাঁতীই হবেন হয়তো আপনারা। আচ্ছা, আসুন।

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা আর গেলেন না। বসিয়া পাঠ শুনিতেছেন। প্রথম অধ্যায় শেষ হইল। শৌনকাদি ঋষিগণ সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন। ঋষিগণ বলিতেছেন, কলির জীব অল্পায়ু, অলস ও মন্দবুদ্ধি। আবার রোগাদি বহু বিঘ্নে

জর্জরিত। এ সময়ে দীর্ঘ ব্যয় ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞাদি সম্পাদন সম্ভব নহে। তাই আমরা ভগবানের লীলাকথা শুনিতে চাহিতেছি। কারণ, ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করিলে সংসারত্নঃখের অবসান হয়। কলির পক্ষে এই সহজ পথ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ইনি যা পড়লেন তার সার তু'টো জিনিস। প্রথমটি, 'ভক্তিই সার'। আর দ্বিতীয়, নৈমিষারণ্যের সিন্‌টি। বহু ঋষি একত্র হয়েছেন। ভগবানের চিন্তা করছেন ব্যাকুল হয়ে। সূত তাঁদের ভাগবত শোনাচ্ছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—তিনি কি কাণ্ডটাই করেছেন! এই দেখুন না, মানুষকে কেমন করে তৈরী করেছেন। Finite hyphen Infinite (জীবই শিব)। Finite-এর (সীমাবদ্ধ জীবের) ভিতর মানুষ Infinite-এর (অসীম বা ঈশ্বরের) চিন্তা করতে পারে। কি আশ্চর্য! এই জন্য সব মানুষকে পূজা করা উচিত—তাঁর মন্দির বলে। অন্য প্রাণীদের সে possibility (সম্ভাবনা) নাই।

বড় জিতেন (প্রার্থনার ভাবে)—দিন না, মশায়, Infiniteকে চিনিয়ে। তা'হলে finiteএ (সংসারে) থেকেও বেশ থাকা যাবে।

শ্রীম গানে উত্তর দিতেছেন।

গান। শ্যামধন কি সবায় পায়, কালীধন কি সবায় পায়।
অবোধ মন বোঝে না, একি দায়,
শিবের অসাধ্য সাধন, মনমজানো রাঙ্গা পায়।
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয়, যে ভাবে মায়,
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, যে চরণ ধ্যানে না পায়;
নির্গুণ কমলাকান্ত, তবু সে চরণ চায়।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। কখন বোঝা যায়? সাকার দর্শন, আবার নিরাকার দর্শনের পরে। সাকার দর্শন মানে, দর্শন দিয়ে কথা কওয়া। নিরাকার দর্শন, সমাধিতে মগ্ন হওয়া।

ঠাকুর বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, 'না রে, তোর কথা ল'তে পারলুম না। মা বললেন, (দর্শন) কি করে মনের ভুল হবে। আমি যে কথা কইছি। তা আবার মিলছে যে।' বিবেকানন্দ hallucination (মতিভ্রম) বলতেন কি না, ঠাকুরের দর্শনাদিকে। প্রথম প্রথম ঐরূপ বলতেন। তখন ব্রাহ্মসমাজে খুব যাতায়াত ছিল। তার পরের কথা আছে তাঁর রচিত স্তব, আরাত্রিক ও প্রণাম মন্ত্রে, কি চক্ষে দেখতেন ঠাকুরকে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঈশ্বর কথা না কইলে বেদ হয় কি করে? বেদ তো তাঁরই কথা।

এই গানটা গাইতে গাইতে ডান সাহেবের (Dunn) মৃত্যুর কথা তিনি মনে তুলে দিলেন। আপনা থেকে মনে উঠে পড়লো।

মনে হচ্ছে সব যেন দম-দেওয়া পুতুল। এই হাসি তামাসা, নাচ গান, যেই দম ফুরিয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল। কোন্ দেশ থেকে এসেছে .to try his fortune (অদৃষ্ট পরীক্ষায়)—কাজকর্ম কর্মচারীগিরি কত হলো। আবার সব শেষ হল। এখন দুই-তিন দিন চলবে এই ভাব। আবার যেই সেই। এমনি মহামায়ার কাণ্ড! সব ভুলিয়ে দেয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ভক্ত কি কম জিনিস! চৈতন্যদেব ভক্ত define (সংজ্ঞা) করেছিলেন, যাকে দেখলে ভগবানের উদ্দীপন হয়, তাকে বলে ভক্ত। একেবারে ভগবানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভক্ত কত বড় জিনিস! 'In the world, but not of the world.' (কাদায় থেকে, গায়ে কাদার দাগটুকুও নাই)।

শ্রীম. (যুবকের প্রতি)—শরীরটা এমনি করে তৈরী যে, সব ভুলিয়ে দেয়। এর ভিতর থেকে আবার response (উত্তর) আসছে। তা'তেই ভাল লাগিয়ে দেয়। এমন যে মৃত্যু সামনে রয়েছে তাকেও বুঝতে পারছে না!

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিস্ময়ে গান ধরিলেন।

গান। চমৎকারা রচনা তোমার শোভার আধার।

শ্রীম—Question (প্রশ্ন) হচ্ছে, কে দম দিচ্ছে ? সেই মানুষটি কে ? খুব interesting question (কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন) বটে। রামপ্রসাদ তার জবাব দিয়ে দিলেন, 'জেনেছি, দেখেছি, আশায় বুঝেছি—সকলই তোমার চাতুরী।'

এটিও গাহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—সব ভুলিয়ে দেয়।

আবার গান ধরিলেন। এবার মত্ত হইয়া।

গান। ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী,
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী।
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনী।
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞা পুরে,
তান লয় মান সুরে ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী।
মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয় ;
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ-আচ্ছাদিনী।

ডাক্তার বক্‌সী (শ্রীমর প্রতি)—আচ্ছা, প্রকৃতি মানে কি ? গীতায়ও আছে এ কথা।

শ্রীম—Sense-worldএর (বাহ্য জগতের) নামই প্রকৃতি। তোমার 'প্রকৃতি' ভাল, এর 'প্রকৃতি' খারাপ—এইখানে প্রকৃতি মানে অন্য—nature, character (স্বভাব, চরিত্র)। প্রকৃতির পারে যাওয়া মানে, sense-world (বাহ্য জগৎ, সংসার) জয় করা।

জগবন্ধু—তাকেই কি জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা হয় ?

শ্রীম—হাঁ, তাকেই জীবন্মুক্ত, বিদেহ অবস্থা বলে।

এক একটা শব্দের অনেক মানে আছে ডিকস্‌নারীতে। Real (সত্যিকার) মানে সকলে ধরতে পারে না। একটা মানে দিনকতক একভাবে ধরে নিলে। বহুদিন এইভাবেই হয়তো কেটে গেল।

আবার আর এক রকম মানে নিলে। এই করে অনেক ঘোরে। 'লজিকে' (Logic—ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রে) chapter on Fallacy (ভ্রমজ্ঞান-নামক অধ্যায়) আছে। আপনি তো পড়েছেন 'লজিক' ? ওখানে এসব আলোচনা হয়েছে। একটা শব্দের ঠিক মানে প্রায়ই লোক ভুলে যায়।

ধরুন, 'কর্ম'। ধরতে গেলে সবই কর্ম। পূজা পাঠ জপ ধ্যান জ্ঞান ভক্তি যোগ—এ সবই কর্ম in the strict sense (সাধারণ ভাবে)। আবার দেখুন, কর্মকে জ্ঞান ভক্তি ও যোগ থেকে আলাদা করা হয়েছে। Generic sense, (ব্যাপকভাব) আবার particular sense (বিশেষভাব), দুই অর্থেই used (ব্যবহৃত) হয়।

বড় জিতেন—Genus and species (জাতি আর ব্যক্তি)।

শ্রীম হুঁ। Genus and species (জাতি ও ব্যক্তি, সমষ্টি আর ব্যষ্টি)।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—আবার ঠাকুর দু'টি সাধুকে বলছেন, 'আচ্ছা জী, আপনারা যা করেন সব নিষ্কামভাবে করেন তো ?' (বড় জিতেনের প্রতি) কেমন না ?

বড় জিতেন আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম—দেখুন, এখানে কত বড় comprehensive view (ব্যাপক দৃষ্টি) নিয়েছেন। পূজা পাঠ জপ ধ্যান জ্ঞান ভক্তি যোগ, সবই এর ভিতরে রয়েছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তিনিই সব বুঝিয়ে দেন। আপনার মা, পর তো নয় ! প্রকৃতি জয় কি সহজে হয় ? তাঁর কৃপা চাই।

ডাক্তার বক্সী—দেন না এটি করিয়ে।

শ্রীম ভ্যানভ্যান প্যানপ্যান করলে কি হয়। ভ্যানভ্যানানি প্যানপ্যানানি ভাল নয়। তিনি আপনার মা। চব্বিশ ঘণ্টা এই করলে কিছু হবে না।

কাশীপুর বাগানে ঠাকুর বলেছিলেন—একি, তোমরা অমন বেজার হয়ে বসে কেন? তাঁর তখন খুব অসুখ। ভরসা দিয়ে বলছেন, তিনি আপনার মা। ভয় কি আমাদের তাঁর কাছে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—প্রার্থনা করা আর শরণাগতি—এ-বই আমাদের অন্য উপায় নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন এই কথা। বললেন, তোমার প্রকৃতিতে কর্ম রয়েছে। যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে। তবে তোমায় একটা উপায় বলে দিচ্ছি। সব আমার জন্য কর, তোমার নিজের জন্য নয়। তা'হলে কর্মফল তোমাকে আর বাঁধতে পারবে না। বললেন, ছি, ছি, তোমার এই হৃদয়-দৌর্বল্য ছাড়। 'ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ'। তোমার মত বীরের এ বিষণ্ণ ভাব শোভা পায় না। ওঠ, আমার কাজ জেনে এ যুদ্ধ কর। আবার ধমকও দিলেন। বললেন, যদি আমার কথা না শোন, তবে সমূলে বিনষ্ট হবে—'বিনঙ্‌ক্ষ্যসি'।

মানুষের যুদ্ধ তো সর্বদাই লেগে আছে। তাই ready (প্রস্তুত) থাকতে হয় সর্বদা। কখন কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসে ঠিক নাই। সন্ত্রস্ত থাকতে হয় সঙ্গীন চড়িয়ে। পাকা খেলোয়াড় ছাড়া সংসারে থাকা চলে না। বড় হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হয়।

ডাক্তার কার্তিক বক্‌সীর প্রশ্নোত্তরে এই কথাগুলি শ্রীম অতি উত্তেজিত ভাবে বলিলেন।

এখন রাত্রি দশটা। শ্রীমর রাত্রির আহারে আজ বড় দেরী হইয়া গেল। ভৃত্য ঘরে আহার রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে কাহাকেও কিছু না বলিয়া। আহারের দেরী দেখিয়া বড় জিতেনবাবু দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন বারবার। শ্রীম তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন—কি আর হয়েছে। খাওয়ার অভাব কি? কত জায়গা তিনি করে রেখেছেন। এই মনে করুন, গদাধর আশ্রমে গেলে সেখানেও খাওয়ার আছে।

শ্রীম স্বগৃহে থাকিয়াও কি মনে করেন ধর্মশালায় নিবাস?

কলিকাতা
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার

তৃতীয় অধ্যায়

ঘরের ছেলে ঘরে যাবে

১

সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন বিছানায়। কাছে অন্তেবাসী। আজ রবিবার। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ১২ই ফাল্গুন, ১৩৩০। খানিক পর স্বামী শান্তানন্দ আসিলেন। ইনি সম্প্রতি বেলুড় মঠে রহিয়াছেন, কাশীতে থাকেন। তারপর প্রবেশ করিলেন বিনয় ও কিরণ। কিরণ বিনয়ের ভাই। কলেজে পড়ে। সর্বশেষ আসিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ বড় জিতেন, সঙ্গে আট-নয় বছরেব ভাইয়ের মেয়ে। কথাবার্তা চলিতেছে।

স্বামী শান্তানন্দ (শ্রীমর প্রতি)—কমলেশ্বরানন্দের অবস্থা কিরূপ? কেউ কেউ বলে, মাথা খারাপ হয়েছে।

শ্রীম—লোকে ঐ রকম বলে থাকে। ঠাকুরকেই বলতে ছাড়তো না। আমাদের মনে হয়, এটা তা নয়। ঈশ্বরচিন্তা বেশী করলে বায়ুবৃদ্ধি হয়। ঠাকুর বলতেন, 'তখন মিছরীপানা খেতে হয়। আর বাদাম তেল মাখতে হয়।' আর কথা ,কয়ে কয়ে tired (ক্লান্ত) হলে একটু ঘুমুতে বলতেন। সামান্য ঘুমুতেই ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। তিনি নিজেও তাই করতেন। ভক্তদের বলতেন, 'তোমরা একটু বাইরে গিয়ে বসো। আমি অমন (চোখ বুঁজিয়া নিদ্রার অভিনয় করিয়া) করে নি।' তারপর দরজা সব বন্ধ করে পনের মিনিট, আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতেন।

অন্তেবাসী শ্রীমর কথামত দশটি সিঙ্গারা ও চারটি রসগোল্লা আনিয়াছেন। শ্রীম নিজ হাতে লইয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিলেন। তারপর অন্তেবাসীর হাতে দিয়া বলিতেছেন, 'প্রথমে এঁকে (সাধুকে) আর এঁকে (কুমারীকে) দাও। মিষ্টিটা সবই এঁর

(সাধুর) হাতে দাও। সিঙ্গারা সকলকে বেঁটে দাও।' শান্তানন্দজী একটি রসগোল্লা কুমারীর হাতে দিলেন। আর একটি কিরণকে। কিরণ লইতে রাজী না হওয়ায় শ্রীম বলিলেন, 'সে কি? সাধুর প্রসাদ নিতে হয়।' কিরণ উহা লইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীম দোতলার ঘরের মেঝেতে বসিয়া আছেন, পূর্বাস্য। ধ্যান করিতেছেন। আজ রবিবার। সাবাদিন ভক্ত সমাগম হইয়াছে। তাই ক্লান্ত। আবার সর্দি হইয়াছে। পাশেই দুর্গাপদ, বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু। গরমে শ্রীমর কষ্ট হইতেছে।

বড় জিতেন (শ্রীমব প্রতি)—শুনলাম গবমে সর্দি হয়েছে। তা'তে বড্ড weak (দুর্বল) করেছে নাকি? কেমন শরীবেব অবস্থা এখন?

শ্রীম—না, তেমন কিছু নয়। চলুন, in terms of Infiniteএ (অনন্তের কথা, ঈশ্বরের) কথা বলা যাক। এ সব তো আছেই। এই নিয়ে অত কেন?

বিচারের সময় ক্রাইস্টকে জজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'by what authority doest thou these things?' তিনি বলতেন কিনা, 'I am the son of God' (আমি ঈশ্বরের সন্তান)। তাই জজ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাব authority (অধিকার) কোথা থেকে এলো, এ কথা বলবার?

আবার ওরা বলত, পুরোহিতরা, আমরা এব্রাহামের ছেলে। কিন্তু আচরণে অতি হীন হয়ে পড়েছিল। তাই ক্রাইস্ট তাদের তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'Out of these stones He can raise children unto Abraham' (এই পাথর নুড়ি থেকে তিনি জন্ম দিতে পারেন হাজার হাজার এব্রাহামের ছেলের)।

তাই আমরা সকলে কলের পুতুল। যতক্ষণ দম আছে নাচা হচ্ছে। লেকচার হচ্ছে। যেই দম ফুরিয়ে গেল, অমনি এই (হাত দিয়ে নীচে পড়ার অভিনয়)। আচ্ছা, দম দেয় কে? সে লোকটা কে?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর সর্বদা বলতেন, মা-ই সব করছেন। লোক এসেছে দেখে বলতেন, মা এরা আমার কাছে আসছে? থ্যাক্ থু, ছি ছি! তোমার কাছে আসছে। অন্তরে বাহিরে তাঁকে সর্বদা দেখতেন। তিনিই সব করছেন।

বড় জিতেন—এটি বুঝিয়ে দিন না। তা হলেই তো হয়ে গেল।

শ্রীম (উত্তেজিতভাবে)—এতে জ্যাঠামি চলবে না। তুমি বল আর নাই বল, সবই তিনি করছেন।

বড় জিতেন—আজ পড়ছিলাম—দেব, মানব ও দানব গেল ব্রহ্মার নিকট উপদেশ নিতে। ব্রহ্মা দেবতাকে বললেন, 'দ'। মানব গেল তাকেও বললেন, 'দ'। আবার দানবকেও বললেন, 'দ'। প্রথম 'দ'র মানে দমন। দ্বিতীয় 'দ'র মানে দান। আর তৃতীয় 'দ'র মানে দয়া। এখন 'দ'র আসল মানেটা বুঝিয়ে দিন না।

শ্রীম (অধিক উত্তেজনার সহিত)—এক-একজনকে তিনি এক এক রকম বোঝান। আমরা হীন অধিকারী জেনেও আমাদেব এক রকম বুঝিয়েছেন। আমরা এই বুঝেছি, সবই তিনি কবছেন। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়, সব তাঁর কাজ। এতে আমাদের বিশ্বাস আছে।

আহা, সেই দুপুর বেলা আজও মনে পড়ছে। একজন এসে জিজ্ঞেস করলেন, উপায় কি? ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস।' গুরুবাক্য-বই আমাদের উপায় নাই। ওটি হলে সব হয়ে গেল। নিজের কোনও ভাবনা নাই। গুরুবাক্য যেমন ভেলা। তরঙ্গায়িত সমুদ্রে যেমন ভেলা ধরে থেকে রক্ষা পায়, গুরুবাক্য তেমনি ভেলা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একটি পথিক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। একজন ভিখারী ভিক্ষা চাইলে। সে একটি পয়সার বদলে একটা টাকা দিল। অনেক দূর চলে গেছে—ভিখারী, আবার ডাকলো—'শুনুন মশায়'। ভিখারী ভেবেছে, লোকটা অতি বোকা। একটা পয়সা দিলেই হতো। তা না দিয়ে একটা টাকা দিয়েছে। হয়তো আরও পাওয়া যাবে চাইলে। পথিক ফিরে এলো। তখন ভিখারী

বলছে, 'বড় রৌদ্র, চলতে কষ্ট হয়। আপনার ছাতাটি দিলে খুব ভাল হয়।' পথিক ছাতা দিয়ে চলে গেল। এবারও ভিখারী ভাবছে, আরো চাইলে আবও পেতাম। লোকটা বড় বোকা। আবার ডাকছে, 'মশায়, আব একটিবার শুনুন'। অমনি সে ফিরে এল। ভিখারী তাকে বললে, 'আমার চলতে বড় কষ্ট হয়। ঘোড়াটি আমায় দিয়ে যান।' পথিক এবাব টাকা, ছাতা ও ঘোড়া সব নিয়ে প্রস্থান করলো। বেশী চাইলে আবার সব নিয়ে যায়।

বড় জিতেন (আর্তস্বরে)—ও বাবা, তবে তো বড় মুশকিল দেখছি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—লেকচার অনেকে দেয় কিন্তু শোনে কে? সুভদ্রা হরণ হলো। মিটিং বসেছে, কি করা যায়। সকলে লেকচাব দিচ্ছে, খুব লম্ফ ঝম্ফ। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ালেন। অমনি সব চুপ। আগে গোলমাল হচ্ছিল। তা হবে না? তিনি যে কৃতী। সকলেই শুনতে চায় তাঁর কথা। সকলেব কথা কি শোনে লোক? কৃতীব কথা শোনে।

শ্রীম (ভরসার সহিত)—কেন দেখা দেন না? তা তাঁর ইচ্ছা। কারো কাবো দ্বারা সাধন ভজন করিয়ে নেবেন লোকশিক্ষার জন্য। শেষে দেখা দেবেন না তো কি? ঘবের ছেলে যে। ঘবেব ছেলে ঘরে যাবে।

(স্বগতঃ) উপায় কি? না, গুরুবাক্যে বিশ্বাস। এরও আবার ডিগ্রি আছে। বলেছেন, কেউ দুধ শুনেছে। কেউ দুধ দেখেছে। কেউ দুধ খেয়েছে। ঈশ্বব দর্শনের পর পাকা বিশ্বাস হয়। সেইটে 'দুধ খাওয়া'।

শ্রীম ক্ষণকাল নীরব। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি)—সকলেই কি ঠিক দাম দিতে পারে? দেখ না, মানিকটার দাম বেগুনওয়ালা বললে ন'সের বেগুন। কাপড়ওয়ালা বললে ন'শ টাকা। আর জহুরী দিলে এক লাখ টাকা।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—মা-ঠাকরুন বলতেন, 'স্নেহ, মায়া, এসব আমার থাকবেই। তা তোমাদের তো মানতে বলছি না।' শরীর ধারণ করেছেন যে! এসব থাকে।

ঠাকুর বলতেন যারা যেতেন তাদের, 'আচ্ছা, তোমরা রোজ রোজ আস কেন? সাধুকে লোক এক আধবার দেখে। তোমরা বুঝি আমার আপনার লোক, অন্তরঙ্গ? তোমরা বুঝি মানিক নাড়াচাড়া কর?' তাই তো অন্তরঙ্গদের জন্য অত ব্যাকুল হতেন।

মহেন্দ্র ডাক্তার, তিনকড়িবাবু, এঁরা বলতেন, 'He is very expert in this matter (তিনি বড়ই বাক্‌পটু)।' Intellectual sideটা (মনীষার দিকটা) নিয়েছেন এঁরা। যেমনি ভাব, তেমনি লাভ।

ঈশ্বরকে দেখে তৃপ্তি মিটে না, satiety (সন্তোষ) লাভ হয় না—কাশীপুর বাগানে একজন ভক্ত এই কথা বলেছিলেন। শুনে ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তা কি হয়, তাঁকে দেখে তৃপ্তি মেটে না?' 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।'

শ্রীম যে ঘরে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন তাহার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে শ্রমজীবীদের পল্লী। এখানে কতকগুলি হিন্দুস্থানী মুসলমান চর্মকার পাদুকা তৈয়ার করে। তারা ভক্তিমান লোক। মাঝে মাঝে ঈশ্বরীয় ভজন কীর্তন করে। আজও তাই হইতেছে। ধূপের সুগন্ধ শ্রীমর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই দেখুন, যে রূপ রসে আবদ্ধ করে, আবার তা'তেই মুক্তও হয়। শুধু মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। ধূপের সুগন্ধ আসতেই আর এক রকম হয়ে যাচ্ছে মন। ভজনের স্বর মনকে টেনে উপরে নিয়ে যাচ্ছে। অবসর সময় কীর্তন করে আর সারাদিন কাজ করে ঐ সামনের দোকানের লোক। যে মাটিতে পতন তা ধরেই আবার উত্থান।

আহা, মহম্মদ কি কম ভালবাসা দিয়ে গেছেন! সুফিদের ভিতর খুব ভক্ত আছে। একবার মহম্মদের অসুখ। বাড়ীর কাছেই

একটি মসজিদ। পাঁচশ' ভক্ত একত্রিত হয়েছেন সেখানে। তাঁরা শুনলেন, মহম্মদ আসতে পারবেন না, খুব অসুখ। অমনি সকলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। ক্রন্দনের রোল শুনে মহম্মদ আর স্থির থাকতে পারলেন না। সেবকদের কাঁধে ভর করে তাঁকে আসতে হল বাড়ী থেকে। এর নাম ভালবাসা। আহা, কত ভালবাসা ছড়িয়ে গেছেন মহম্মদ!

ঠাকুর একদিন 'গৌর গৌর' বলছেন। একটি লোক বলছেন, 'গৌর' বলছেন কেন? 'কালী কালী' বলুন। ঠাকুর উত্তর করলেন, কি জানি বাপু, আমার ঐ রকম। তোমাদের স্ত্রীপুত্র রয়েছে। পাঁচ-জনের সঙ্গে কথাবার্তায় দিন কাটে। আমার তো তা নয়। তাই কখনও 'গৌর গৌর' করি, কখনও 'কালী কালী', কখনও অন্য নাম। এইসব করে দিন কাটাই।

গদাধর আশ্রমে একটি সাধু আছেন। ষোল বছর বয়স থেকে রাখাল মহারাজের কাছে ছিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কোথায় যাবে—ভুবনেশ্বর, কি অন্য কোথাও?' সাধুটি উত্তর করলেন, 'প্রাণ খালি ভালবাসা চায়। যেখানে ভালবাসা পাওয়া যাবে মন সেখানে যেতে চায়।' তা চাইবে না? রাখাল মহারাজের ভালবাসায় মঠে আসে। বয়স এখন আটাশ। সেই ভালবাসা ছাড়া আর কিছু তো জানে না। আহা, ভালবাসা ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। ভালবাসা এমনি জিনিস। তাই তো ঠাকুর অত করে বলতেন, 'কথাটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দে প্রেম।'

শ্রীম স্থির হইয়া শ্রমজীবীদের ভজন শুনিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আহা, কি গলাটি! Outpouring of the soul (অন্তরের আকুল ক্রন্দন)। It is a sight for the gods to see, (দেবগণও মোহিত হন এ দৃশ্য দেখে), যখন soul (আত্মা) pour (ভাব প্রকাশ) করছে। গানেতে soul-এর (প্রাণের) আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ পায়।

নাবালকের ভার গভর্ণমেণ্ট নেয়। বড় হলে নেয় না। কেন

নেয়? না, সে এস্টেট চালাতে পারবে না বলে। তেমনি ঈশ্বর নেন ভার। যারা তাঁর উপর সব ছেড়ে দেয় তাদের ভার তিনি নেন। ছাড়বে না, অথচ তিনি ভার নিন expect (আশা) করা কি করে হয়?

পরদিন প্রভাত। উজ্জ্বল আকাশ আর স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ। শ্রীম চারতলার ছাদে পাদচারণ করিতেছেন। সঙ্গে •জগবন্ধু ও বিনয়। পূর্বদিক আলো করিয়া সূর্য উঠিতেছে সায়েন্স কলেজের উপর দিয়া। আবার পশ্চিম আকাশে এখনও চাঁদ দেখা যাইতেছে। শ্রীম এই নৈসর্গিক সুদৃশ্য ভক্তদের দেখাইতেছেন। বলিলেন, দেখুন, দেখুন, কি সুন্দর উঠছে! একসঙ্গে সূর্য ও চন্দ্র দেখা যাচ্ছে। বেশ ছাদটি! রোজ উঠছে বলে আমরা আশ্চর্য মনে করি না। কিন্তু কি আশ্চর্য! একই আকাশে চন্দ্র সূর্য। তেমনি একই মানুষে জ্ঞান-ভক্তি লাভ হয়, যেমন প্রহ্লাদ, ঠাকুর বলেছিলেন। একটি ভক্তের (শ্রীমর) প্রার্থনা ছিল জ্ঞান ভক্তি দুই-ই হয়। ঠাকুর শুনে বললেন ভরসা দিয়ে লম্বা গলায়, হবে না কেন। তাঁর ইচ্ছায় সবই হয়। আধার বড় হলে ঐ হয়।

রবিবার। ২রা মার্চ, ১৯২৪। ঠাকুরবাড়ী। শ্রীম পূজা করিতেছেন। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। পূজারীর আসনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে কোশাকুশি। হাতে কুশি। ঠাকুরকে শীতল নিবেদন করিতেছেন। ঠাকুবঘরের সম্মুখের বারান্দায় ভক্তসমাগম হইয়াছে। শ্রীম ঘর হইতে বলিতেছেন, জগবন্ধুবাবু, মাদুর পেতে আপনারা বসুন। আর ললিতবাবুকে মহাদেবের ঐ গানটি গাইতে বলুন। ললিত গাহিলেন, 'মহাদেব পরমযোগিন্ মহতানন্দে মগন।' শুকলাল, মনোরঞ্জন প্রভৃতি আসিয়াছেন।

একঘণ্টা পর শ্রীম দোতলায় নামিলেন। ভক্তসঙ্গে বড় ঘরে বসিয়া আছেন পূর্বাস্য চেয়ারে। ভক্তগণ সম্মুখে। তাঁহারা সকলে প্রসাদ পাইতেছেন।

মনোরঞ্জন কাশী, বিন্ধ্যাচল দর্শন করিয়া আজ ফিরিয়াছেন।

তাহারই গল্প হইতেছে। শুনিয়া শ্রীম উত্তর করিলেন, 'এক একটা দিনে যেন হিন্দুধর্ম মূর্তিমান হয়ে উঠে। চন্দ্রগ্রহণের দিন ঐরূপ হয়েছিল। আবার কাল আছে শিবরাত্রি। লোক যেন ধর্মের উন্মাদনায় মত্ত হয়ে যায়। এইটিই ভারতের রূপ, এইটেই ভারতের হৃদয়। সব ছাড়তে পারে। কিন্তু ধর্মটি বাদে। তাই সনাতন ধর্ম বলে। মানে, যা চিরকাল আছে ও থাকবে। ঋষিরা এই ভিত্তির উপর ভারত গড়েছিলেন, আত্মজ্ঞানের ভিত্তি। এই জ্ঞান লাভের জন্যই বাইরের এসব প্রয়োজন—তীর্থ, তপস্যা, উৎসবাদি।

ডাক্তার বক্‌সী আসিয়াছেন, সঙ্গে পরিবার আর ভাই বিনয়। শ্রীম ঘরের বাহিরে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলেন। একটি ভক্তের কানে কানে বলিলেন, 'আট পয়সার রসগোল্লা নিয়ে আসুন।' কিছুক্ষণ পর সকলে চলিয়া গেলেন। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, 'আপনি আগে খেয়ে আসুন। এখানে প্রহরী থাকবেন। আমি স্কুলবাড়ী গিয়ে শুই। তারপর এগারটার সময় ওরা (মেয়েরা) এলে ওখানে চলে যাবেন।' শ্রীম স্কুলবাড়ী চলিলেন।

৩রা মার্চ, শিবরাত্রি। অতি প্রত্যূষে শ্রীম মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন কম্বলাসনে, পূর্ব দক্ষিণ কোণে, পশ্চিমাস্য। জগবন্ধুকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। অনেকক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর দেবদেবীর নাম করিতেছেন 'শিব শিব', 'দুর্গা দুর্গা', 'কালী কালী', 'রাম রাম', 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ', 'গঙ্গা গায়ত্রী' ইত্যাদি। শেষে, 'শিব শিব মহাদেব' বলিতে বলিতে শিবের গান করিতেছেন। 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা', 'ভাঙ্গ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ', ইত্যাদি কয়েকটি গান গাহিলেন। এখন নয়টা। মধ্যাহ্ন আহারের পর বারটার সময় শ্রীম গদাধর আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমর কথায় জগবন্ধু গেলেন দক্ষিণেশ্বরে কাশীপুর হইতে বিনয়কে সঙ্গে লইয়া। তারপর বেলুড় মঠে। এখন সন্ধ্যা সাতটা। শিব-পূজার সব আয়োজন হইতেছে ভাঁড়ারের সামনে। মঠ হইতে তাঁহারা কালীঘাটে গেলেন। মাকে দর্শন করিয়া

নকুলেশ্বর শিব দর্শন করিতে গেলেন। রাত্রি দশটায় গদাধর আশ্রমে ফিরিলেন।

শ্রীম গদাধর আশ্রমের তিনতলার ছাদে বসিয়া আছেন। বিনয় ও জগবন্ধু প্রণাম করিয়া সমস্ত দিনের বিবরণ বলিলেন। তাঁহারা উপবাসী। শ্রীম বলিলেন, a good days work—আজের দিনটা সফল হল। উপবাস থেকে সাধু, তীর্থ দর্শন হল। কিন্তু যখন শুনিলেন, শান্তানন্দজী প্রভৃতি সাধুরা মঠে পূজা দর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন, তখন তিনি স্নেহ-তিরস্কারের সুরে বলিলেন, 'সব ভাল হল। এটি ভাল হয় নাই। মঠেই থাকা উচিত ছিল আজ। সাধুরা অত করে বললেন।'

গদাধর আশ্রমের নীচের ঘরে শিবপূজা হইতেছে। পূজারী ভাব মহারাজ, তন্ত্রধারক লক্ষ্মণ মহারাজ, পরে কমলেশ্বরানন্দজী। সাধু ও ভক্তে গৃহ পূর্ণ। দ্বিতীয় প্রহরের পূজার শেষে শ্রীম পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উপরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

এখন মধ্যনিশা।

ভবানীপুর, কলিকাতা
গদাধব আশ্রম। ৩রা মার্চ, ১৯২৪ খ্রী:
২০শে ফাল্গুন ১৩৩০ সাল, শিবরাত্রি

চতুর্থ অধ্যায়

কষ্ট কি ইষ্ট

১

মর্টন স্কুল। শ্রীমর চারতলার ঘর। আজ ৫ই মার্চ ১৯২৪, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল বুধবার। এখন সন্ধ্যা ছয়টা। শ্রীম ট্রাঙ্ক খুলিয়াছেন। ঠাকুরের কথামৃতের ডায়েরীর রাশিতে উহা পূর্ণ

অন্তেবাসীকে বিস্ময়ে বলিতেছেন, হায় হায়। এগুলি যে অত যত্ন করে রেখেছি, প্রাণপাখী বের হয়ে গেলে এর কি হবে? প্রাণপাখী তো বের হয়ে যায়। এ সব পুরোনো যত স্মৃতি।

শ্রীমর পার্থিব সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'কথামৃতে'র ডায়েরী।

একটু পব ধ্যান করিতেছেন বিছানায় বসিয়া, উত্তরাস্য। পিছনের বেঞ্চিতে বসা সেবক। কিছুক্ষণ পর আসিলেন ছোট জিতেন। দেড় ঘণ্টা ধ্যানেব পব চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ভজন গাহিতেছেন।

গান। শিবসঙ্গে সদা বঙ্গে আনন্দে মগনা মা।

গান। নিবিড় আঁধারে মা তোব চমকে ও রূপরাশি।

গান। ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপবা।

গান। সদানন্দময়ী কালী।

গান। মন কি তত্ত্ব কব তাঁরে।

গান। বলরে শ্রীদুর্গা নাম (সবটা)।

গান। জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী তুমি নিত্যানন্দস্বরূপিনী।

ভাবেতে তন্ময় হইয়া শ্রীম গান গাহিতেছেন। চক্ষু মুদ্রিত। বাহ্য লক্ষ্য অন্তর্হিত। অন্তবে যেন একটি জাগ্রত ও জীবন্ত ভাব-প্রস্রবণ বহিতেছে। এই প্রস্রবণের কথঞ্চিত ভাব-সলিল উচ্ছ্বাসে তীর বাহিয়া ভজনরূপে মুখকমল হইতে নির্গত হইতেছে।

বড় জিতেন ইতিমধ্যে আসিয়াছেন। ভজন শেষ হইলেও একটি প্রশান্ত প্রবাহ ঘরে বহিতেছে। অনেকক্ষণ পর শ্রীম স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে বড় জিতেনের সহিত কথা কহিতেছেন। সব কথা করুণা-মাথা। তাঁহার গৃহের সকল কুশল সংবাদ লইতেছেন। ছেলেরা কেমন, পরিবার কোথায়, ইত্যাদি। পরিবার দেশে আছে জানিয়া মাঝে মাঝে গিয়া তাহাদের দেখিয়া আসিতে বলিতেছেন। এই উপলক্ষে যদি দুই-চার দিন নির্জনবাস হয়। শ্রীম ইচ্ছা করেন বড় জিতেন মাঝে মাঝে বাহিরে যান, অবসর নেন। বড় জিতেনের কয়েকটি ছেলেই উচ্চশিক্ষিত।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আপনার ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না ?

বড় জিতেন—আজ্ঞে, না। দেখে তাই মনে হয়। Bread problemএর (অন্ন সমস্যার) জন্য হয় তো হবে। ভাল করে উপার্জনক্ষম না হলে বিয়ে করবে না এই ভাব।

শ্রীম—এদের অত পড়িয়েছেন। আরও কিছু খরচ করা উচিত। কখনও কখনও মঠ আর দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাওয়া উচিত। সাধুসঙ্গ যখন করছে না, তখন বোঝা যায় বিয়ে করার ইচ্ছা আছে। মঠে নিয়ে গেলে যদি সংস্কার থাকে ভিতরে তাহলে সাধুসঙ্গে জেগে উঠবে। তা না হলে যেমন চলছে তেমনি চলবে। ওখানে (মঠে) কত এম-এ, বি-এ. পাশ করা লোক আছে। আবার বি.এলও আছে। মিহিজামে যখন ছিলাম ওখানে একজন মঠ থেকে গিছলেন এম.এ, বি.এল পাশ—আহা কি ভাব! আমরা পুরোনো লোক বলে ঠাকুরের কথা শুনতে গিছলেন। মঠের সাধুরা সর্বদা ঠাকুরের চিন্তায় মগ্ন। আর একজন গিছলেন। তিনিও এম.এ পাশ। শুনছি, বম্বে মঠে আছেন। খুব serious (নৈষ্ঠিক) মঠের এঁরা। এঁদের সঙ্গে আলাপ করলে আপনার ছেলেরা বুঝতে পারবে সাধুরা কি ভাবেন, এঁদের চিন্তা কোন্ দিকে চলছে। এম.এ, বি.এর তো অভাব নাই, কত হচ্ছে। দু' পাতা মুখস্থ করে হয়ে গেল। ছি, ছি, ওসব আবার life (জীবন)! দাঁড়াতে পারে এঁদের কাছে – এসব এম.এ, বি.এ ? এঁরা যা best thoughts (শ্রেষ্ঠ চিন্তাসমূহ), যা philosophy (দর্শন শাস্ত্র) সে সবই আয়ত্ত করে ফেলেছেন। তাই মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে যেতে হয় ওঁদের কাছে মঠে। মাসে একবার করে নিয়ে যাওয়া উচিত। বছরে বারো বার তাহলে হলো। এ আর পারবেন না আপনি ?

বড় জিতেন—ওরা মঠে গেছে।

শ্রীম—একদিন গেলে হয় না। Repetition (পুনঃ পুনঃ যাওয়া) চাই। যদি ওখানে যেতে ভাল না লাগে তবে বোঝা যাবে

ঐ পবিত্র জীবনের ইচ্ছা নাই। আর যদি stong protest (আপত্তি) না করে যেতে—এ-এ না, এ-এ না করে (সকলের উচ্চহাস্য) তবে বোঝা যাবে, গেলেও হয়। নেমতন্নে দেখেন নাই? যদি বলা হয়, আর একটি সন্দেশ নিন, খানিকটা ইচ্ছা থাকলে বলে, এ-এ না, এ-এ না। তখন পাতে ফেলে দিলে খেয়ে ফেলে। যতক্ষণ না ব্যাঘ্রঝম্প দিচ্ছে ততক্ষণ পাতে ফেলতে থাকে। ব্যাঘ্র-ঝম্প মানে (হাত দু'টি বিছানায় লাগিয়ে) তেমনি করে পাতের উপর পড়া। তখন আর দেওয়া চলে না। কি বলে, 'হা হা দত্ত্বাৎ। হুঁ হুঁ দত্ত্বাৎ। ন দত্ত্বাৎ ব্যাঘ্রঝম্পনে।' এইরূপ প্রবল আপত্তি না করা পর্যন্ত বুঝতে হবে ভিতরে ইচ্ছা আছে। আর মনে করুন, ঐ সাধুসঙ্গ thrown away হবে না (বিফলে যাবে না) বিয়ে করলেও। বীজ ভিতরে রয়ে গেল, কাজ অবশ্য করবে।

বড় জিতেন—কেন, এখানকার ভাব তো কিছু কিছু পেয়েছে। আপনার এখানে তো মাঝে মাঝে আসছে। একেবারে অন্যদের মত হবে না।

শ্রীম এই কথার উত্তর না দিয়াই তিনতলায় ভোজন করিতে নামিয়া গেলেন। ভোজনের পর আসিয়া উহার উত্তর দিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আমাদের কথায় যদি উপকার হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কথা আরও শুনতে হয়। আমরা বলছি মঠে নিয়ে যেতে। লেকচারে হয় না। তা যদি হতো তবে কেন ঠাকুর বলছেন, 'পড়ার চাইতে শোনা ভাল। শোনার চাইতে দেখা ভাল।' দেখতে হয় চোখে, ঐ সাধুদের life (জীবন) কি করে চলছে। ওঁরা highest ideal (সর্বোচ্চ আদর্শকে) worship (উপাসনা) করছেন। আর পবিত্র জীবন যাপন করছেন। শুধু ভক্তি করলে কি হয়, আমাদের কথা শুনতে হয়।

২

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কথা হইতেছে। যোগেন শ্রীমর চেষ্টায় এখন

ঐ মন্দিরের খাজাঞ্চি। সকলের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ঐ কর্ম ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছেন। শ্রীম নানা ভাবে তাহাকে বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ত্রিশ বছর ছিলেন। এমন স্থানে শত কষ্ট সহ্য করেও থাকা উচিত। এমন কি, বিনা পয়সায় থাকতে পারলেও মহাভাগ্য!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আমরা যাকে কষ্ট বলি তা কি ঠিক ঠিক দেখতে পাই—কষ্ট কি ইষ্ট! Retrospectively (পেছন ফিরে) দেখলে, সব মঙ্গল। একটি ছেলের তিন বছরের সময় মা মারা যায়, আর সাত বছরে বাপ। জেঠার কাছে আছে, ব্রাহ্মণ। বোনদের কাছেও থাকে কখনও। বাপ মা না থাকলে যা হয় তাই হতো। জেঠার ঘরে বাজার-টাজার করতো, বাইরের সব কাজ। পড়া পাঠশালা পর্যন্ত। মনের দুঃখে দরজা বন্ধ করে কাঁদতো।

মঠের সাধুরা ঘাটাল যান রিলিফ করতে। ওঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁরা ঐ ছেলেটিকে কোয়ালপাড়া মঠে নিয়ে যান। সেখানে মঠের জন্য মুষ্টিভিক্ষা করতো। সাধুরা বলে দিয়েছেন, মুষ্টিভিক্ষা আনবে, পয়সা নয়, খাবার, দিলে তাও নয়। ছেলেমানুষ দেখে অনেক পয়সা, খাবার এসব দিত। কখনও নিয়ে এসে মঠে বকুনি খেতো।

তারপর কলকাতা এসে গুরুলাভ হলো। আবার ব্রহ্মচর্যও হয়েছে। এখন গদাধর আশ্রমে আছে। ললিত মহারাজ পূজা শেখাচ্ছেন। আজকাল তিনজন গ্র্যাজুয়েট ভক্ত তাকে পড়াচ্ছে।

এখন কি করে বলবে, ওর দুঃখ! বাপ-মা মারা যাওয়ায় দুঃখে পড়েছিল বলেই তো এখন এই সুখটি হচ্ছে। তিন জন পড়াচ্ছে প্রাণপাত করে। আবার ধ্যান করে হরিণের চামড়ার আসনে বসে।

এ বিপদ কি বিপদ? কখনও একটু অসুবিধা হয় ভবিষ্যতে ভালর জন্য। (ডাক্তারের প্রতি) কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার সারাদিনের পরিশ্রমে নিদ্রাবিষ্ট। সেই অবস্থাতেই জড়িত

নাকী কণ্ঠে বলিলেন, 'আজ্ঞে, হাঁ'। অমনি সকলের উদ্দাম উচ্চহাস্য। ডাক্তার চকিত। শ্রীম আবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আর একটি ছেলে আই. এস্-সি. পাশ দিয়েছে। নোয়াখালী বাড়ী। গদাধর আশ্রমে থাকে আর সাধুদের সেবা করে। আশ্রমের অন্য কোনও advantage (সুযোগ সুবিধা) নেয় না। কিন্তু সর্বদা সেবা করে। প্রথমে ঐ আশ্রমের authorities (কর্তৃপক্ষ) তাকে থাকতে দেন নাই। তাই তাব বাপ বেলুড় মঠে গিয়ে higher authorities-এর (কর্তৃপক্ষেব) কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এলেন। বাপ বি.এ. পড়েছেন, মাস্টারী করতেন। এখন সব ছেড়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কবছেন। কি ব্যাকুলতা বাপেব—ছেলেটি যাতে সাধুসঙ্গে থাকতে পাবে! এখন নিশ্চিন্তি হয়েছেন। আমি তাই তাকে বললাম, তোমার বাপই তোমার গুরুর কাজ করেছেন।

গুরু কে? যে ভগবানের পথে নিয়ে যায়। বাপই তো তাকে মনে করুন, সাধুসঙ্গে নিয়ে গেল। আহা, এমন বাপও আছে! ছেলেটি দেড় ঘণ্টা ধ্যান করে। আশ্রমের জন্য বাজার করা, ফুল সাজান, চন্দন ঘষা, এইসব করে। উৎসবে প্রাণপাত করে খাটে।

আর একটি ছেলে কাঁথিতে সাধুদের রিলিফে help (সাহায্য) করতো। ওদের সঙ্গ পেয়ে এখন মঠে এসেছে।

এই সব ছেলেদের কি সৌভাগ্য! কিন্তু প্রথমে একটু অসুবিধার ভিতর দিয়ে গিয়েছে বলে তো! তা'হলে আর বিপদকে কি করে বিপদ বলা চলে, বন্ধু যে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যাদের সংস্কার আছে তারা সাধুসঙ্গ পেলে সাধু হয়ে যায়।

ঠাকুর বলতেন, 'আমাকে ওখানে (শ্রীমর স্কুলে) নিয়ে যেতে পার? আমায় দেখলে যাদের সংস্কার আছে তাদের চৈতন্য হয়ে যাবে।' আবার বলতেন, 'আমি এক ভাবের লোক দেখলে মিলিয়ে দি।'

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—তাই মঠে ওদের (ছেলেদের) নিয়ে যাওয়া উচিত। কিছু দিন আনাগোনা করলে তারপর বুঝা যাবে। তা না হলে শুধু কুমড়ো-কাটা বট্‌ঠাকুর হয়ে লাভ কি ?

বড় জিতেন—ছেলেরা রোজগার করতে পারে, না বলেই বিয়ে করে না।

শ্রীম—কেন, তার জন্য একটা তো উপায় করে (উচ্চশিক্ষা দিয়ে) দিয়েছেন। তাইতেই চলে যেতে পারে। সদ্‌বংশের মেয়ে দেখে বিয়ে দিন। সদ্‌বংশ মানে যাঁদের বাড়ীতে ঠাকুরপূজাদি হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মঠে উৎসব হবে। ঠাকুরের জন্মতিথি শুক্রবার। রবিবার সাধারণ উৎসব। ক'দিন ধরে মনটা খালি দক্ষিণেশ্বর-দক্ষিণেশ্বর করছে। আমাদের যে এত বয়স হয়েছে তা ভুলে যাই অনেক সময়। সেদিন ট্রামে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলাম। তা দেখে দু'তিন জন লোক sympathise (সহানুভূতি প্রকাশ) করলে। আমি দৌড়ে গিয়ে আবার উঠলাম। লজ্জা হলো তখন। গাড়ীতে বসে ভাবছি, এসব ঠাকুরের সাবধানবাণী। কিন্তু মন মানে কই ! এখনও পূর্বের মতো যেতে আসতে, দৌড়াদৌড়ি করতে ইচ্ছা হয়—কাটা রেলগাড়ীর মত। যখন তিনি ছিলেন, ঐরূপ যেতাম। তখন বয়স ছিল কম। এখনও ঐ কথা ভাবতে গিয়ে ঐরূপ করে বসি। বুড়ো যে হয়েছি তা ভুল হয়ে যায়।

আলমবাজার পর্যন্ত গেলেও খুব—কি সুবিধাই হয়েছে বাস হওয়ায় ! আর ঐটুকু হয়ে গেলেই হয়—আলমবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির। তা, আলমবাজার পর্যন্ত যাওয়াও কি কম ভাগ্যের কথা ! পথে সর্বমঙ্গলা দর্শন হয়। ঠাকুর ওখানে গিছলেন। আবার কাশীপুর বাগান। ওখানে দশ মাস ঘর করেছিলেন ঠাকুর। কত কাণ্ড হয়েছে ! ওখানেই অবতাররূপে আপনাকে প্রকাশ করলেন বিশেষ করে। মহাতীর্থ !

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বরানগরের কাছে একবার গাড়ীর চাকা

ভেঙ্গে যায়। (দীর্ঘ হাস্যের সহিত) বলরামবাবুর পাঁচসিকে ভাড়ার গাড়ী। কলকাতা যাওয়া-আসার ভাড়া ঠাকুর তিন টাকা দু'আনা করে দিতেন। বলরামবাবু ঐ দিনে পাঁচসিকে দিয়ে একটি গাড়ী করে দিলেন। ভাড়া কম শুনে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'অত কম কেন?' বলরামবাবু বললেন, 'ও রকম হয়।' (সকলের উচ্চ হাস্য)। তারপর চাকা ভেঙ্গে যায় বরানগরের কাছে! সেই সময় মথুরবাবুর ছেলে জুড়িগাড়ী করে যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বর। লজ্জায় ঠাকুর কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখলেন। পরে এই সব কথা গল্প করে ভক্তদের হাসাতেন।

বরানগরের বেণী সা'র আস্তাবল থেকে গাড়ী নেওয়া হতো। বাসে করে গেলে এই সব ঠাকুরের স্থান দর্শন হয়। বরানগরে গাড়ীর চাকা ভেঙ্গে যাওয়ার স্থানটিও দর্শন হয়। তারপর চার নম্বর রামরাজাতলা। ভবনাথের বাসা পাঁচ। ছয় নম্বর, ঈশান কবরেজের বাড়ী। ইনি ঠাকুরের চিকিৎসা করতেন। এঁর বাড়ীতে গিছলেন। এরই পাশে একটি গলি আছে, ওখানেও গিছলেন। এই হলো সাত। তারপর আলমবাজার মঠ। বরানগর থেকে উঠে মঠ এখানে আসে। এই সবই পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত। আলমবাজার অবধি গেলেও এই সব দর্শন হয়। আলমবাজার নটবর পাঁজার বাড়ীতেও গিছলেন। এ সবই এক একটি পুরানো পবিত্র land-mark (স্মৃতিচিহ্ন)।

কলিকাতা
৫ই মার্চ, ১৯২৪ খ্রীঃ, বুধবার

পঞ্চম অধ্যায়

অবতার-সমষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণ

১

মর্টন স্কুল। শ্রীম দোতলার ঘরে বসিয়া আছেন, কাছে জগবন্ধু। দুর্গাপদ মিত্র ('হিলিংবাম') আসিয়াছেন। একটু পর ফকিরবাবু। এঁদের সঙ্গে নানা কথা কহিতেছেন।

আজ ৬ই মার্চ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল, বৃহস্পতিবার। শুক্লা প্রতিপদ। এখন সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম কিয়ৎকাল ধ্যান করিয়া ভক্তসঙ্গে চারতলায় নিজের শয়নঘরে গিয়া বসিলেন। শ্রীম বিছানায় পশ্চিমাস্য। দুর্গাপদ চেয়ারে পূর্বাস্য। আর ফকির ও জগবন্ধু বেঞ্চিতে শ্রীমর বাম দিকে উত্তরাস্য উপবিষ্ট। আমহার্স্ট স্ট্রীটের একজন ডাক্তার শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। ফকির সেই কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ফকিরের প্রতি)—শেষকালটা ছেলেদের গোলমালে কষ্ট পেয়ে গেল। দেহ একবার ভাঙ্গলে আর সে দেহ ঠিক হয় না।

তপস্যার অনিয়মেও দেহ ভাঙ্গে। হরি মহারাজের ভেঙেছিল। অনেক তপস্যা করেছেন কিনা। যোগেন মহারাজ ছিলেন আর একজন সন্ন্যাসী ভক্ত। Constipation (কোষ্ঠকাঠিন্যে) ভুগে তাঁর দেহও একেবারে ভেঙ্গে গেল। দশ বছর ঐ ভাবে ছিলেন। রাখাল মহারাজ কম কষ্ট করেন নি! শ্রীবৃন্দাবনে একবেলা মাধুকরী এনে দু'বেলা খেতেন। রুটি শুকিয়ে যায়, তাই ভিজিয়ে রাখতেন। এই করে জ্বর হলো। অনেক কষ্টে একে-তাকে ধরে পাঁচ টাকা পাঠান হল। ভক্তও তখন সব নড়েভোলা, টাকা নেই। এখনকার মত তো আর ছিল না। বিবেকানন্দ ঐশ্বর্য প্রকাশ করার পর তো কত হচ্ছে।

ঠাকুর ভক্তদের কেন এতো ভালবাসতেন? তা ভালবাসবেন না! লোকে যাঁকে পাগল বলতো, তাঁরা প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভাল বাসতেন। সর্বদা যেতেন, যেমন আপনার লোকের কাছে যাওয়া আসা করে। ছয় টাকা মাইনেব পূজারী। প্রায় নিরক্ষর। দরিদ্রের ঘরে জন্ম। বাড়ীব লোক খেতে পায় না। আবার ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত। কলকাতার লোকেরা বলছে পাগল। ন্যাংটা। সেই অবস্থায় যাঁরা তাঁকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে ভালবাসতেন তাঁদেব জন্য ভাববেন না তো কি? তাঁরা তাঁকে চিনেছিলেন। তিনিও তাঁদের চিনেছিলেন। আবার মজা দেখ কেমন, যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ, প্রায় সকলেই 'ইংলিশম্যান'। কেউ কেউ স্কলাব ইউনিভার্সিটির। বেশ contrast (বৈষম্য)। এরূপ কেন হলো? তাঁর মহিমা তবেই প্রচার হবে ভাল। লোকে দেখে বুঝবে তাঁব ভিতব কি আছে, যাতে নবীন শিক্ষিত ভাল ঘরের সব লোক সব ছেড়ে তাঁকে ধবেছে। তাঁর দাসত্ব করছে। এই প্রশ্ন এসে যাবে। তা'হলেই লোকেব কল্যাণ। সাদা ব্যাকগ্রাউণ্ডে কাল রাখ, কালব উজ্জ্বলতা বাড়বে। তেমনি এ লীলা!

ভক্তরা কি তাঁকে চিনতে পাবতেন? তিনি কৃপা কবে নিজেকে চিনিয়ে দিলেন তাই! কি সাধ্য মানুষের তাঁকে চেনে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মানুষ হয়ে এসেছিলেন, কি কবে চিনবে মানুষ তাঁকে? এক সের ঘটিতে দশ সের দুধ ধরে না। তিনি না জানালে কেউ জানতে পাবে না। ভক্তদেব কাছে তিনি ধবা দিছলেন তাই ধরতে পেরেছে তাবা। 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।' (গীতা, ১০।১৫)। অর্জুন বলেছিলেন এই কথা। আর ভগবান বলছেন, 'দদামি বুদ্ধিযোগং তম্ যেন মাম্ উপযান্তি তে'। (গীতা, ১০।১০)। তাঁরই দেওয়া বুদ্ধিতে তাঁকে ধরতে পারে। অন্য আর উপায় নেই তাঁকে ধরবার।

অন্তেবাসী—স্বামীজীর ভিতর দিয়ে তো ঠাকুর নিজেই কাজ করছেন, তবে তো জগতের কল্যাণ হবে।

শ্রীম—তা আর বলতে? স্বামীজী নিজেই বলেছেন এই কথা।

ওদেশ থেকে এসে আমাদের বলেছিলেন, 'আমায় যেন গাই দুইয়ে নিচ্ছেন।' 'নাকে দড়ি দিয়ে নাচাচ্ছেন'। বলেছিলেন, 'পার্লামেণ্ট অব রিলিজিয়ানস্'-এ যা বলেছিলাম সবই তিনি বলিয়েছেন। আমার সব ভুল হয়ে গিছলো। তিনি আমার কণ্ঠে বসে কথা কয়েছেন।'

আজকাল অনেকে লেকচার দেয়। কিন্তু স্বামীজী কি lightএ (ভাবে, অর্থে) এসব কাজ নিতেন তা বোঝে না। অত তো লেকচার দিলেন ওদেশে। কিন্তু বললেন, 'যা কিছু সত্য বলেছি সব ওঁর। মিথ্যাগুলি আমার।' একেই বলে মহাপুরুষ! কি গুরুভক্তি! কি অদ্ভুত ত্যাগ! এক বিন্দুও credit (প্রশংসা) নিজে নেবেন না। সব শ্রীগুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ করলেন। এগুলি দেখতে হয় তাঁর এই অলৌকিক জীবনে।

ওদেশে যে কাজ করেছেন, লেকচার দিয়েছেন, এও এক রকম তপস্যা। কর্মযোগ। তাঁর কর্ম সাধকের কর্ম নয়। সিদ্ধির পরের কর্ম, প্রত্যাদিষ্ট কর্ম। ঠাকুর বলেছিলেন, 'নরেন (লোক-) শিক্ষে দিবে।' সব প্ল্যান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমেরিকা থেকে এসে মাদ্রাজে বক্তৃতা দেন—'Sages of India' (ভারতীয় মহাপুরুষগণ)। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য—এঁদের সকলের কথা বলে শেষে উপসংহার করলেন, But Sri Ramakrishna is the summation of all of them (কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন, এ সকল মহাপুরুষগণের ভাবঘন সমাহার মূর্তি)।

ছোট জিতেন প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—আবার দেখ, অত ঐশ্বর্য প্রকাশ হলো। কিন্তু সব ছেড়ে দিলেন। আমাদের কাছে খবর পাঠাতেন, 'তোমরা আমার খাওয়া-পরার যোগাড় করে দাও।' কখনও বা লোক মারফত সংবাদ পাঠালেন, 'আমার কোনও সুবিধা করে দিতে বলো।' ঐশ্বর্য ছুঁতে পারেন নাই। আবার বলতেন, 'প্রথম প্রথম বরানগর মঠে যেমন যেতাম পাঁচ পয়সার শেয়ারের গাড়ীতে, তেমনি করতে ইচ্ছা

হচ্ছে। করেওছিলেন দিনকতক। আলমবাজার মঠে যেতেন ঐরূপে। পূর্বস্মৃতি মনে উদয় হয়েছে কিনা!

বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে ঠাকুর ঐশ্বর্য প্রকাশ করালেন। তারপর তো মানবেই লোক। এতে আর আশ্চর্য কি? জগতের লোক ঐশ্বর্যের বশীভূত। তাদের কল্যাণের জন্য ঐশ্বর্যের প্রয়োজন। কিন্তু মাধুর্য প্রকাশ হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। সেটি বোঝবার লোক কম। যাঁরা সংস্কারবান, তাঁরাই বুঝেছিলেন ঐ রূপটি। কত কষ্ট করে যেতেন ভক্তরা হেঁটে হেঁটে ছয় সাত মাইল। যাওয়া-আসায় ১৪।১৫ মাইল হয়ে যেতো। তাইতো এখন মোটর হয়েছে শুনে কত আনন্দ হচ্ছে। প্রাণ চাইছে আবার ঐ রকম করি যাওয়া-আসা।

সেইজন্য ভক্তদের অত ভালবাসতেন। মায়ের কাছে তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছেন, 'মা, যাবা আন্তরিক এখানে আসে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।'

অশ্বিনী দত্ত আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন। বিবেকানন্দ লেকচারে থিওসফিস্টদের গাল দিয়েছেন কিনা, সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন আলমোড়ায়। বললেন, 'স্বামীজী, একটা নালিশ আছে। আচ্ছা, ঠাকুর তো কাউকে গাল দেন নাই। আপনি কেন তবে থিওসফিস্টদের গাল দিলেন?' স্বামীজী শুনে উত্তর করলেন, 'ও, আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি যা বলেছি সবই সত্যি! যা ঠাকুরের সঙ্গে মেলে তাই নেবেন। অন্যগুলি হয়তো আমি রাগের মাথায় বলেছি, গাল দিয়েছি।' অশ্বিনীবাবু আমাদের বলেছিলেন, 'স্বামীজীর এই কথা শুনে তাঁর উপর আমার ভক্তি একশ' গুণ বেড়ে গেল!' আহা, কি গুরুভক্তি!

ডাক্তার, বিনয় ও ছোট অমূল্য প্রবেশ করিলেন।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—গীতা পড়া গিছলো আজ একটু। সেখানে দেখলাম—বলা হয়েছে, প্রকৃতি থেকে এই সব বের হয়েছে যা কিছু, 'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'। ঠাকুর বললেন, 'তিনিই সব হয়ে রয়েছেন' দু'টো তো মিলছে না তা'হলে।

শ্রীম—গীতায় একথাও আছে 'তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।' তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্তা। বেদেও আছে, 'স ঐক্ষত'—তিনি ইচ্ছা করলেন, তবে এই ব্রহ্মাণ্ড হল। প্রকৃতিও যে তিনিই করেছেন যা থেকে এইসব হয়েছে বলছেন।

আর এইসব যা দেখছি জগৎ, এ তো relatively true to us (ব্যবহারিকরূপে আমাদের কাছে সত্য), আমরা conditioned beings (সসীম জীব) বলে। From the absolute point of view (পরমাত্মিক-তত্ত্ব দৃষ্টিতে) এসব কিছুই নাই। সব স্বপ্ন। গুরুর মুখ থেকে এমনতর কথাও শোনা গেছে। আমরা রূপ-রসাদি নিয়ে আছি কিনা, তাই এমনি দেখছি। কিন্তু বস্তুতঃ এসব কিছুই নাই। এইমাত্র তিনিই আছেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সীতা, হনুমান—ছায়াবাজীর পুতুল।

দেখুন না, ডান্ সাহেব (Mr. Dunn) চলে গেল। গুডস্ সাহেবও গেল। কুলি loaded pistol নিয়ে যাচ্ছে পিছনে পিছনে। হঠাৎ গুলি পড়ে হয়ে গেল। এই সব নিয়মিত খেলা। এসব বুঝবার যো নাই। আপনি বুঝতে চান কি করে। (ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে) এই যে আপনার sensation (বাহ্য জগতের জ্ঞান) হচ্ছে, কত কাণ্ড করে এটি হচ্ছে ভেবে দেখেছেন কি? এই শরীর, এর মধ্যে কত কাণ্ড হচ্ছে। এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সব বোঝা অসম্ভব। অনন্ত কাণ্ড তাঁর! অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে একেবারে মরমর হয়েছিলেন, অতবড় আধার, তবুও! 'ঠাকুর, সম্বরণ কর—ঠাকুর, সম্বরণ কর' বলে চীৎকার আরম্ভ করলেন। আপনার এক ছটাক বুদ্ধিতে কি বুঝবেন? Amateur religionএর (সখের ধর্মের) কাজ নয় এসব বোঝা। দিনরাত অন্য সব করা হচ্ছে, আর অবসরমত একটু 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করলুম। এই মনোভাবে কি তাঁকে বোঝা যায়? তিনি যা বলেছেন, তাই ঠিক। ঈশ্বর সব হয়ে আছেন, 'মা সব হয়ে আছেন।' এতে বিচারের অবকাশ নাই। বিচার বন্ধ। এটি প্রত্যক্ষ। অত উপদেশ—একেবারে

উপছে পড়ছে, তবুও বিচার? তাঁর কথার উপর বিচার নাই। তাঁর কথা শেষ কথা।

ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কইছেন। বলতে বলতে হঠাৎ মুখ বন্ধ হয়ে গেল। বলতেন, 'এই যা, মা মুখ বন্ধ করে দিলেন।' ঠাকুরের কথা revelation (দৈববাণী), তাই শোনা উচিত বিচার ছেড়ে।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—মুখ কেন বন্ধ করলেন?

শ্রীম—এই 'কেন'র উত্তর দেবে কে? Madame 'how' and Lady 'why'-র উত্তর দিবার লোক কেউ নাই। মানুষ বুঝবে কি করে Absolute-এর (পরমাত্মার) কথা? হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন আরও গুহ্য, শ্রোতা সইতে পারবে না বলে বন্ধ করে দিলেন।

ঈশ্বরের কাজ মানুষের বুদ্ধিতে বোঝবার যো নাই। লোকে যাকে দুঃখ বলে, retrospectively (পিছন ফিরে) দেখলে, তা অন্য রকম দেখা যায়। শৈশবে একটি ছেলে মাতৃপিতৃহীন হয়। এক রকম ভাসতে ভাসতে সাধুদের হাতে এসে পড়ে। এখন সে গুরুলাভ করে ব্রহ্মচারী। উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তার। কে ভেবেছিল, এই অনাথ বালকের এই সুবর্ণ সুযোগ আসবে? তাই পূর্বাপর দেখলে বোঝা যায়, সব মঙ্গলের জন্য হচ্ছে। ভগবান সর্বমঙ্গলময়, তাই তো ঋষিরা বলে গেছেন। ঠাকুরও বলেছেন এই কথা। এইটি বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা করতে হয়।

বড় জিতেন—প্রার্থনা কি করে করা? শুধু মুখে বললেই কি হলো?

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—হাঁ, প্রথমে মুখেই বলা। তারপর তাঁর সঙ্গে ভাব হলে, feeling-এর (প্রাণস্পর্শের) যোগ হলে আরও ভাল। তারপর প্রসাদধারণ। এটি হলো আর একটি গুহ্য। আরও বলবো, নৃত্য। তারপর repetition (আবৃত্তি)।

শ্রীম (কার্তিকের প্রতি)—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, প্রকৃতিই সব করায়। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।' (গীতা,৩।৩৩)।

আর একটি আছে। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (গীতা, ১৮।৬৬)। এ'দুটি ঘরে লিখে রাখলে ভাল। একটিতে ভয়, অপরটিতে ভরসা।

এইবার খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে অতি যত্নে কাছে বসাইলেন। ভক্তদের বলিতেছেন, 'এঁকে হাওয়া কর, হাওয়া কর।' একজন সেবক হাওয়া করিতেছেন। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, 'এই এঁরা তাঁর সময়ের লোক। ইনি ষোল বছরের ছিলেন যখন ঠাকুরের কাছে প্রথম যান।'

খোকা মহারাজকে ঠাকুর শ্রীমর কাছে যাইতে বলিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, এখন ইঁহারা উভয়েই বৃদ্ধ। এখনও ঠাকুরের আজ্ঞা পালন করেন। মাঝে মাঝে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসেন।

খোকা মহারাজ তৃষ্ণার্ত। ভক্তদেব তাই বলিতেছেন, 'কই সোডা আর সিগারেট?' অন্তেবাসী সোডার বোতল আর 'হাওয়া গাড়ী' সিগারেট এক প্যাকেট আর একটি দেশলাই আনিয়া দিলেন। তিনি সোডা পান করিতেছেন। খানিক পব দুইটি বড় রসগোল্লা ও দুইটি সন্দেশ দেওয়া হইল।

স্বামী সুবোধানন্দ—কাশীতে একজনের সঙ্গে দেখা হল। গীতা আধখানা তার মুখস্থ। খুব ফড়র্ ফড়র্ করে। বললুম, আধখানায় কি হবে? সবটা কর। সাধুরাও কেউ কেউ এই রকম করে। দু'চারটে শ্লোক মুখস্থ করে আবৃত্তি করে বেড়ায়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কাল ঠাকুরের জন্মতিথি। আজ তাঁর বিষয় একটু পড়লে ভাল হয়। (ছোট অমূল্যর প্রতি) আপনি কিছু পড়ুন।

ছোট অমূল্য এইমাত্র দেশ হইতে আসিয়াছেন। তিনি 'কথামৃত' খুলিয়া ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিতেছেন। পাঠ যখন অর্ধেক হইয়াছে, খোকা মহারাজ যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। শ্রীমর কথায় অন্তেবাসী আলো লইয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন। তিনতলা হইতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—এত শীঘ্র চলে এলেন ?

অন্তেবাসী—এখানে ঠাকুরের কথা পড়া হচ্ছিল। আলো নিয়ে যাওয়ায় সেটি বন্ধ হয়ে গেল বলে আমায় আর যেতে দিলেন না। আলো নিয়ে শীঘ্র ফিরে যেতে বললেন।

শ্রীম—তা'হলেও যেতে হয় !

এবার বাকী অংশটুকু শেষ হইল। শ্রীম বলিলেন, এবার দক্ষিণেশ্বর দর্শন করা যাক।

তাহাও 'কথামৃত' হইতেই পড়িয়া শুনান হইল।

বাত্রি দশটা।

২

আজ ঠাকুরের জন্মতিথি। ৭ই মার্চ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২৪শে ফাল্গুন ১৩৩০ সাল। শুক্রবার। শুক্লা দ্বিতীয়া। ভক্তগণ আজ কাশীপুর ডাক্তারগৃহে উৎসব করিয়াছেন। ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু সাড়ে পাঁচটায় বেলুড় মঠে যান। সেখান হইতে শেষ স্টীমারে বাগবাজার আসেন। তারপর ট্রামে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে। শ্রীমকে না পাইয়া পুনরায় মর্টন স্কুলে আসেন। শ্রীম ভক্তদের তিরস্কার করিতেছেন। বলিলেন, আজের দিনে মঠে থাকতে হয়। হৈ হৈ করে ঘুরলে কি হবে ? Greatest event (সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা) হলো আজকার ঐ সিন্‌টি—যখন ব্রহ্মচর্য নিয়ে বেরোয়, আর যখন নূতন সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করেন। এমন দিনে মঠ ছেড়ে আসতে নাই।

১০ই মার্চ সোমবার। সার্বজনীন উৎসব উপলক্ষে ভক্তরা মঠে গত দুই দিন বাস করিয়া ফিরিয়াছেন। এখন অপরাহ্ণ চারটা।

শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। পাশে জগবন্ধু। অনেকগুলি অধ্যায় পাঠ করিলেন। আর মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতেছেন। গুণত্রয়বিভাগ-যোগ পড়িতেছেন। বলিলেন, "সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হলেও বিপদ আছে। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, এই তিন গুণই চোর। লোককে বদ্ধ করে। সত্ত্বগুণেও বদ্ধ হয় জীব—

সুখে বদ্ধ হয়। 'সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি'। এখানে সুখ অর্থে কেউ কেউ বিষয়সুখ বলেন। কিন্তু আমাদের সেই অর্থ ভাল লাগে না। এখানে সুখ মানে, কর্মযোগ রাজযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ পালনে যে সুখ হয় সেই সুখ।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, গুণাতীত লক্ষণ, দৈবী সম্পদ, আসুরিক সম্পদ, পাঠ ও সামান্যভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। এইবার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ পড়িয়া শেষ করিতেছেন। পাঠ শেষ হইলে বলিলেন—ভগবান বলছেন, 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীত স উচ্যতে'। 'সর্বারম্ভ' মানে, all beginnings অর্থাৎ কর্ম কমে যাওয়ায় আর নূতন কর্মে জড়িত না হওয়া।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ শ্রীমর সম্মুখে পূর্ব ও পশ্চিমে মুখোমুখি বেঞ্চিতে বসিয়া আসেন। এখন ডাক্তার বিনয়, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ছোট অমূল্য, মণি, অমূল্যর সঙ্গী, জগবন্ধু প্রভৃতি বসিয়া আছেন। কথাবার্তা হইতেছে।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—ভবানীপুর দৌড়ান কেন? ওখানে কি?

শ্রীম—ভবানীপুর কম জায়গা গা! একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে একটি গল্প করতেন। ইনি মাঝে মাঝে একটা স্বপ্ন দেখতেন। সব জলে জলময়। সব ডুবে গেছে। একটি জাহাজ জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন ব্রাহ্মণ ঐ জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। একটি লোক জিজ্ঞাসা করলো, 'প্রভো, আপনি যাচ্ছেন কোথা?' ব্রাহ্মণ বললেন, 'ভবানীপুর'। লোকটি বললে, 'তাহলে আমায়ও সঙ্গে নিয়ে চলুন। কেমন করে যাচ্ছেন আপনি এই জলে?' 'জলের নীচে সাঁকো আছে। তুমি এইটে দেখে রাখ। পরে এসো। তোমার একটু দেরী আছে।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। সেই 'ভবানীপুর'। একি কম জায়গা!

শ্রীম কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পুনরায় কথা চলিতেছে।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—আপনি যে এই দুইদিন মঠে ছিলেন, এটি বেশ করেছেন। বাৎসরিক উৎসব এটি। তা'তে আবার important (প্রধান) উৎসব। তার মধ্যে greatest event (সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা) হলো ঐ সিনটি। নূতন ব্রহ্মচারী ও নূতন সন্ন্যাসী দর্শন। প্রথম দর্শনটি একেবারে টাটকা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বিবেক বৈরাগ্যের জমাটবাঁধা মূর্তি, ঈশ্বরের জন্য সর্বস্বত্যাগরূপ ব্রত নিয়ে যখন বেরোচ্ছেন সাধুরা। এ ছেলেখেলা নয়! সংসারের সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রত নিয়েছেন, তাঁকে দর্শন করতে হবে। তাঁরা বুঝেছেন, ঈশ্বর আগে, সংসার পরে—God first, world second—not vice versa. বেদে তাদের কথাই বলেছেন, 'বহ্নিরধূমকঃ', মানে জ্বলন্ত অগ্নি—জ্ঞানের, ত্যাগ-বৈরাগ্যের।

সন্ন্যাসীরা স্নান করছেন, তারপর ভিক্ষা করছেন গৈরিক বস্ত্রে, এ দৃশ্যটি দর্শন করলে হাজার বছরের তপস্যা হয়ে যায়। লোকে থিয়েটার যাত্রা দেখে পয়সা খরচ করে। বক্সে বসে পঁচিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা খরচ করে। আর এর যদি পয়সা লাগতো তা'হলে এর দাম নেই, অমূল্য। যাত্রার লোক সাধু সাজে কেন? Impression (রেখা) পড়বে বলে মনে। ঐটি দেখলেও impression (দাগ) পড়বে। বেশী পড়বে। যারা highest ideal (সর্বোচ্চ আদর্শ) চায় এই জীবনেই, তাদের পক্ষে এটি বড়ই প্রয়োজনীয়। আর যারা গৃহে আছে তাদেরও কম প্রয়োজন নয়। তাদের অর্ধেক চৈতন্য হয়ে যায়। সম্পূর্ণ তাদের মত হতে না পারুক, অর্ধেক তো হবে।

এ সব ক্রিয়াকর্মের বিধান শাস্ত্র দিয়েছেন কেন? না, এসব দেখলে লোকের চৈতন্য হবে, তাই। হাজার বই পড়, কিছুই হবে না। একদিন ঐটি দেখলে তার ঢের বেশী কাজ করবে।

মঠে রাত্রিবাস করা, তার মানে কি? রাত জেগে তাঁর পূজাদি দর্শন করা, তাঁর চিন্তা করা। মঠে এক বছর বাস দশ বছর তপস্যার

সমান। (ছোট জিতেনকে) আপনি তো পূর্বের ন্যায় রাত্রিবাস করতে পারেন মঠে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি তিরস্কারের সুরে)—হৈ হৈ করে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ালে কি হবে? যারা highest ideal (ঈশ্বরকে) চায় তাদের ওখানে থাকতে হয়। সাধুদের সব কাজ দর্শন করতে হয়। আর সেবা করা। এই change of life (জীবন-পরিবর্তন) দেখলে চৈতন্য হয়। What man has done man can do—(মানুষ যা করেছে, মানুষই তা করতে পারে) ওদের মত হতে ইচ্ছা হয়। অন্য সময় এটি হয় না। এর অর্থ বোঝা যায় না। তখন মনে হয় তাঁরাও মানুষ, আমিও মানুষ, কিন্তু কত তফাৎ। এই difference (প্রভেদ) অন্য সময় বোঝা যায় না।

মণি—কখনও মনে হয় এখানে (শ্রীমর কাছে) এলে ওখান (মঠ) থেকে বেশী উদ্দীপন হয়।

শ্রীম—জেঠামি করলে কি হবে? শুধু মুখে বললে হয় না। মঠে গিয়ে ওসব দেখতে হয়!

রাত্রি দশটা।

শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। তাঁহার সম্মুখে বেঞ্চিতে মুখোমুখি দুই সারিতে ভক্তগণ বসিয়াছেন। শুকলাল, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বিনয়, ছোট অমূল্য, রমণী প্রভৃতি। নির্মল আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে। শ্রীমর সম্মুখে নির্মল আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে ধ্রুব। শ্রীম আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখুন, দেখুন এই সপ্তর্ষি। এঁরা অনেক কাজের লোক। এই ধ্রুবর চারদিকে ঘুরছেন। আগে ঘড়ি ছিল না। তখন ধ্রুব ও সপ্তর্ষি দিয়ে সময় নিরূপণ করতো। ধ্রুবকে পয়েন্ট করে তার উপর একটা perpendicular (লম্ব) আর একটা horizontal line (সমান্তরাল রেখা) টানলে four right angles (চার সমকোণ) হয়ে গেল। সপ্তর্ষির উপরের

তারাছুটি join (সংযুক্ত) করে বাড়িয়ে ধ্রুবর সঙ্গে মিলিয়ে দিলে এ একটা right angleকে (সমকোণকে) divide (বিভাগ) করবে। ঐ angleটি (কোণটি) মেপে সময় বলা যায়। প্রতি ঘণ্টার পনের ডিগ্রির angle (কোণ) হয়। ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরে এক দিনে, ২৪ ঘণ্টায়।

শ্রীম কিছুকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বীরেনবাবু বেশ করেছেন। এক হাজার টাকা দিয়ে একটা মোটর কিনেছেন। রোজ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাচ্ছেন। এটর্নির কাজ করেন। এতো কাজ অফিসে, কথা বলার অবসর নেই। সেদিন একজন গিয়েছিল তিন ঘণ্টা বসে থাকার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হল। এতো কাজের ভিতরও মোটর থাকায় বাড়ীতে গিয়ে কাপড় ছেড়ে ফস্ করে দক্ষিণেশ্বর চলে যান। মোটর থাকায় এটি সম্ভব হল। আর হাজার টাকা কি, যারা টাকা রোজগার করে তাদের কাছে? ঠাকুর বলতেন, 'টাকা থাকলে অর্ধ জীবন্মুক্ত।'

শ্রীমর লক্ষ্য শুকলাল। কয়েকবার তাঁহাকে সৎসঙ্গের জন্য গাড়ী করিতে বলিয়াছেন। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—যার এদিকে হয়, তার ওদিকেও (ঈশ্বরের দিকেও) হয়। (বিনয় ও ছোট অমূল্যর প্রতি) ডাক্তারবাবু দক্ষিণেশ্বর গেছেন। আপনাদের এখানে আসা উচিত হয় নাই। Servant (চাকর) বাড়ীতে থাকে কি? ঠাকুর কোথায় থাকে? সব ফকির হলে হয় কি করে?

বিনয় ও ছোট অমূল্য কাশীপুরে ভক্তদের বাড়ীতে থাকেন।

শ্রীম (সহাস্যে জনৈক ভক্তের প্রতি)—এমন চালাক লোক আছে কেউ কেউ। তারা ভাবে, বাড়ীর সকলে খুব মায়াতে পড়ুক। আমি কেবল তাঁকে ডাকি। ওটা কিন্তু স্বার্থপরতা। যে উদার সে সকল জীবের কথা ভাবে। চণ্ডীতে দেবতারা বলছেন, মা, আমাদের কল্যাণ কর, আর জগতের সকলের কল্যাণ কর।

'ত্রৈলোক্যবাসিনামিড্যে লোকানাং বরদা ভব।' আজ সকালে স্বপ্ন দেখলাম, ঠাকুর ছাদে পায়চারী করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি করছেন? ঠাকুর বললেন, 'ভক্তদের কল্যাণের জন্য ভাবছি।'

আজ ভোরে শ্রীম ঘর হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া আনমনাভাবে ছাদে দীর্ঘ পদক্ষেপে বেড়াইতেছিলেন। তখন জগবন্ধু, বিনয় ও অমূল্য ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—ক্রাইস্ট একটি ভক্তকে বলছেন, চল আমার সঙ্গে—'come and follow me'. ভক্ত বললেন, 'যাই কি করে? বাড়ীতে একজনের মৃত্যু হয়েছে, সৎকার করতে হবে।' তিনি উত্তর করলেন, 'Let the dead bury their dead: Ye come and follow me'. যারা মরে আছে তারাই মড়ার সৎকার করবে, তুমি চলে এসো। প্রথম 'dead' (মৃত) মানে যারা সংসারাসক্ত। বলতেন, সংসারে সব করবার সময় পরেও পাবে, কিন্তু আমায় পাবে না চিরকাল—'Me, ye have not always.'

রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
১১ই মার্চ, ১৯২৪ খ্রীঃ
২৮শে ফাল্গুন ১৩৩০ সাল, মঙ্গলবার

ষষ্ঠ অধ্যায়

সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ দক্ষিণেশ্বর

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ঘর। সকাল সাতটা। আজ ১২ই মার্চ ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল। বুধবার।

শ্রীম বিছানায়, পশ্চিমাস্য। সিলেটের গোপাল আর জগবন্ধু উত্তরাস্য বেঞ্চে বসা। তাহাদের সঙ্গে একথা সেকথা হইতেছে।

ক্ষণকালমধ্যে যোগেন ও খোকা আসিয়া উপস্থিত। যোগেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খাজাঞ্চি। খোকা তার পুত্র। শ্রীমর চেষ্টায় কর্মটি যোগাড় হইয়াছিল। অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া অমিল হওয়ায় যোগেন ঐ কর্ম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইচ্ছা দেশে গিয়া থাকে। পুনরায় দারপরিগ্রহেরও অনিচ্ছা নাই। বয়স পঞ্চাশ। যোগেন শ্রীমর কাছে নানা অসুবিধার পসরা খুলিয়া দিলেন।

শ্রীম (উত্তেজিতভাবে, যোগেনের প্রতি)—আপনি থাকতে পারছেন না ওদের সঙ্গে! ঠাকুর থাকতেন কি করে? ত্রিশ বছর কাটালেন ওখানে। ঐ খাওয়ার দিকে দৃষ্টি না দিলে সব গোল চুকে যায়। কর্মচারীদের দুই একবার বলতেন। তারপর না হয় তো নাই বা হলো। খাওয়া নিয়ে ঝগড়া! ছি ছি, কি হীনবুদ্ধির কথা! বিদ্যেসাগর মশায় বলতেন, তিনমুঠো চাল ফুটিয়ে খাব নুন দিয়ে। কেন যাবো দাসত্ব করতে? আমি ব্রাহ্মণ, তিন বাড়ী হাঁটলে তিন মুঠোর ব্যবস্থা হয়ে যায়।

এই নরহরিকে দেখুন না, ভাল সাধু। তা আর হবে না! কেমন সদ্‌বংশ। আপনার কাকা সাধু হয়ে গেছেন ষোল বছর হলো। সদ্‌বংশ মানে যে বংশে ঈশ্বরকে অনেক ডেকেছে। ব্রাহ্মণেরা ঈশ্বরকে অনেক ডেকেছে। অমন সাধুর সেবা করা ভাল। (গোপালের প্রতি) চাকরী করতো? একখানে রসুই বামুন ছিল। বাপ-মাকে টাকা দিতে হয়। তা হলেই বা। ঠাকুরও ছ' টাকা মাইনের চাকরী করতেন (হাস্য)।

যোগেন—নরহরির খাওয়া-থাকার সুবিধা করে দিয়েছি।

শ্রীম—ও! আপনি ভাবছেন তার কষ্ট হবে। তা নয়। ঠাকুর বলতেন, 'আগুন জ্বাললে বাদুলে পোকার অভাব হয় না (হাস্য)। অনেক আসবে তখন সেবা করতে। কেউ হয়তো কৃপা করে সাহায্য করবে।

কিরণবাবুকে আপনার সাহায্য করা উচিত। কেমন সব

নিষ্কাম কর্ম করছেন। আপনাকে রেখেছেন তাঁর সুবিধা হবে বলে। এখন আপনার নিজের কাজটি (ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা) হয়ে গেল। এখন ওদের যা হবার হোক।

এমন স্থান! সেখানে, মনে করুন, নুন ভাত দিলেও বেঁচে যাই। আপনি তো সব পাচ্ছেন।

ঠাকুর বলতেন, দুপুরে বারুদ-ঠাসা খাবে।' রাত্রে সামান্য কিছু জলযোগ করা। তা না হলে যে যোগভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর বেশী খেলেও একবার এদিক, একবার ওদিক গড়াতে হবে। ভবানীপুরে সেদিন একজন ডাক্তারও এই কথাই বললেন। বেশী খেলে এপাশ ওপাশ করতে হয়। কি দরকার ঐসবের। সন্দেশ, ফল মিষ্টির ওপর নজর না দিলেই হল। দু'টোর সময় হোক, তবুও খেতে তো পাচ্ছেন। বিকেলে আর একটু হলেই হল। তা আবার আপনি বিকেলে অমন চৌদ্দখানা লুচি পাচ্ছেন। তাতেও হয় না?

ঠাকুর কিন্তু একজন ভক্তকে বলেছিলেন, 'এই রইলো তোমার কুটীর। শাকভাত রেঁধে খাবে। আর সারাদিন ঈশ্বরের নাম করবে।' দেখুন life (জীবন) কেমন simplified (সরল) হয়ে গেল।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—তাহলে বলুন, আপনার মতলব ভাল ছিল না। তা না হলে এমন স্থান ছেড়ে চলেছেন। আচ্ছা, আপনার দেশের বাড়ীর দাম কত হবে? (যোগেন আম্‌তা আম্‌তা করায়) না না, এখন কত হবে? এক টাকাও তো হবে? ও, তাও নয়! তার জন্য আপনি যেতে চাইছেন এমন স্থান ছেড়ে?

আর মনে করুন, বিপদ না হলে কি মানুষ হয়? বিবেকানন্দ বলতেন ওদেশ থেকে এসে—যারা বিপদে পড়ে নাই তারা babies (শিশু)। পাণ্ডবদের কত বিপদ! ভাইরা ধরে বসলো, তুমি বল, আমরা যুদ্ধ করি। যুধিষ্ঠির বললেন—'ভাই, আমরা রাজার ছেলে। আমাদের অবসর খুব কম। ঈশ্বর আমাদের খুব ভালবাসেন বলে এই বনবাসে এনে রেখেছেন। তাঁর নাম করতে

পারবো বলে ! এখন সব সময় তাঁর নাম করতে পারছি। রাজ্যে থাকলে নানা ঝঞ্ঝাট, নানা বিঘ্ন। বেশ সুখে আছি। তাঁর অপার দয়া। তা নইলে যে তাঁকে ভুলে যেতাম বিষয়-মদে মত্ত হয়ে !

দেখুন, কেমন কথা। বিপদ না হলে মানুষ বড় হয় না। গীতায় আছে 'গতব্যথঃ'। মানে, যার অনেক দুঃখ কষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর কিছুতেই কিছু করতে পারছে না—'স্থিতপ্রজ্ঞঃ'।

বিবেকানন্দ ঋষিকেশের কালী কমলীওয়ালা বাবার গল্প করতেন। উত্তরাখণ্ডের তীর্থস্থানের রাস্তাঘাট খুব খারাপ ছিল। দুর্গম হয়ে গিছলো। বাবা কালী কমলীওয়ালা শেঠদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে ঐ সব তীর্থ সুগম করে দিয়েছেন। আজকাল তাই কেদার, বদরী, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী এসব স্থানে বহু লোক যাচ্ছে। তারপর নানা স্থানে সত্র, সদাব্রত করে দেওয়ায় সাধুরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভজন করতে পারছেন। কিন্তু তিনি নিজে কিছুই ভোগ নেন নাই। মাত্র একখানা কালো কম্বল পরে থাকেন। নিজহাতে রুটি বানিয়ে সাধুদের দেন। আর নিজেও তা ভিক্ষা করে নেন্ দশজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে।

দেখুন না, বিবেকানন্দ। কত করলেন, কিন্তু নিজে কোনও ভোগ নিলেন না। ছুঁলেনও না। আমাদের কাছে ভিক্ষা চাইতেন, লিখে পাঠাতেন, 'তোমরা আমার খাওয়ার পরার একটা যোগাড় করে দাও।'

শ্রীম (সকলের প্রতি)—কি করা যায় ? প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। যাদের সঙ্গে বনে না তাদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকতে হয়। তা বলে এলাহাবাদ চলে যাবেন না (সকলের হাস্য)। হাঁ, একজনকে একটু সরতে বলায় একেবারে এলাহাবাদ চলে গেল (সকলের উচ্চহাস্য।)। আপনি তা করবেন না। অন্ততঃ তিন হাত তফাৎ থাকবেন। এসব ঝগড়া হয়েই থাকে শরীর ধারণ করলে। কি করা যায়।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—ঠাকুরকে কত কথা বলতো। একবার

মা-ঠাকরুনকে প্রণাম করে একজন কয়েকটা টাকা দেয়। Authorities (মালিকরা), ত্রৈলোক্য প্রভৃতি বললে, 'ছোট ভট্চাযি্য মশায় পরিবার এনে রেখেছেন টাকা রোজগার করবেন বলে।' ঠাকুর এই কথা বলে মার কাছে কাঁদতেন—'মা ওরা একথা বলে!' তা কি করা যায় বলুন? এসব হবেই। নিজেকে সামলিয়ে নিতে হয়।

আপনি বলছেন, পারবেন না থাকতে ওখানে। আচ্ছা, লোকে বনে বাঘ ভাল্লুকের ভিতর থেকে কি করে তপস্যা করছে?

যোগেন (পুত্র খোকার প্রতি)—বল না খোকা, কি কববো!

শ্রীম—হ্যাঁ হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করুন মন্ত্রীকে। ইনি এঁর মন্ত্রী। বাড়ী না গিয়ে ওখানে ফিরে যান। ওকে (খোকাকে) বরং নরহরির সেবা করতে বলুন। সাধুসেবা আগে করুক। তারপর যা ভাল লাগে তা করতে পারবে পরে। এইতো ম্যাটি ক হলো মাত্র। ফল বের হোক। তারপর যা হয় করবেন। এখনই কি হয়েছে?

শ্রীম (সেবকের প্রতি)—সংস্কার না থাকলে সাধুর কাছে থাকতে পারে না। ঠাকুর বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়া এলেন। একটি ছেলে বসে ছিল। ওর ঠাকুরকে ভাল লাগছে না। এমন করে পাশ কাটিয়ে বসে রইলো। সাধুসঙ্গ সহ্য হচ্ছে না। উমেদারীতে এসেছে। টাকা কড়ি করবে, নাম টাম হবে—এই হলো ওদের aim (লক্ষ্য)। কেন ভাল লাগবে ঠাকুরকে? তাই আগে সাধুসেবা করুক (খোকা) তারপর যা হবার হবে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আচ্ছা, ব্রাহ্মণ কি কম জিনিস! ঠাকুরের খুব অসুখ করেছিল! ঠাকুরের মা ন'বতে থাকেন। এসে ঠাকুরকে বলছেন, 'বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের পাদোদক খাও। ভাল হয়ে যাবে।' ইংলিশম্যানরা এসব কথা শুনলে ঠাট্টা করে। দেখেন নাই, রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, 'দিন না আমার পা-টা ভিজিয়ে।' ওরা অমনি পা ভিজিয়ে দেয় (হাস্য)।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি)—অমন স্থান দক্ষিণেশ্বর! ওখানে

আপনার দেহ গেলেও কত তপস্যার ফল। একটি ভক্তকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওখানে (পঞ্চবটীতে) থাক।' ভক্তটি বললেন, 'কেন? এখানে দেবে না (নহবতের উপর)?' ইনি poet (কবি) কিনা, গঙ্গা দর্শন করবেন উপর থেকে। ঠাকুর বললেন, 'তা দেবে না কেন? কিন্তু ওখানে কত নাম হয়েছে! অথচ এ কথা বলেন নাই একবারও, 'আমি ভগবানের সঙ্গে ওখানে কত আলাপ করেছি।' নিজে credit (বাহবা) নেবেন না। ভক্তটি পঞ্চবটীর কুটীরে শেষে রইলেন। ওটা মাটির ঘর ছিল। আহা কি স্থান! ওখানে একঘণ্টা থাকলেও রক্ষা নাই! আর আপনি অবলীলাক্রমে রয়েছেন। আপনার একটা right (দাবী) রয়েছে ওখানে থাকবার, কর্মটি করেন বলে।

যোগেন (হতবুদ্ধি হইয়া)—তা'হলে কি করবো, বলুন?

শ্রীম—তা কি আমরা বলতে পারি, কি করবেন? আমরা এই পর্যন্তই পারি যতটা বলা হল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলে দেবেন মনে। মন যাই বলবে তাই করুন।

যোগেন (ছেলের প্রতি)—কি বলিস খোকা? এখন যে কথা বলছিস না।

শ্রীম (সহাস্যে)—হাঁ মন্ত্রীমশায়ের পরামর্শ নিন।

(গম্ভীরভাবে) যারা এখন এরূপ করে তারাই আপনার সেবা করবে যদি ওরূপ না করেন।

শ্রীমর কৃপায় যোগেনের সৎবুদ্ধি ফিরিল। পুত্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ফিরিয়া গেল।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—'যদি যাও বঙ্গে, কপাল যাবে তোমার সঙ্গে।' ভিন্নদেশী একজন লোক আসবে বাংলায়। আর একজন তাকে এই হিতোপদেশ দিয়েছিল। কপাল সর্বত্র সঙ্গে যাবে। এই সব লোক ঐশ্বর্য চায়। ওরা কি ঐ সব পবিত্র স্থানে থাকতে পারে? আহা, কি স্থান! জগতে এখন সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভগবান মানুষ হয়ে ওখানে ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন। কত তপস্যা, কত দর্শন! কত কথা

হয়েছে ভগবানের সঙ্গে! তারপর ভক্তসঙ্গে কত লীলা হয়েছে! ওখানে রয়েছে, তা খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করছে। নীচের কর্মচারীরা একটু এদিক ওদিক করে। কি করে বেচারীরা? গরীব লোক, চলে না পরিবারের খরচা। তাই খাবারটা, ফলটলটা একটু টানাটানি করে। উনি খাজাঞ্চি হয়ে যান ঝগড়া করতে এসব নিয়ে! ছি, ছি, খাবার নিয়ে ঝগড়া! কিই বা কাজ, একটু বাজার করা! সেও মায়ের সেবা। এই মনে করুন,সংসার সাগরে ঝাঁপ মারতে চলছিল আর কি!

শ্রীম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। তারপর গোপালের সঙ্গে কথা হইতেছে। গোপাল শ্রীহট্টের আশ্রমে থাকে।

শ্রীম (গোপালের প্রতি)—ইন্দ্রদয়ালবাবুর শরীরের উপর আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। সেবার যেন ত্রুটি না হয়। কত কাজ, কতগুলি আশ্রমের চিন্তা। খুব সাবধান। তার বয়স এখন চল্লিশের উপর হয়েছে।

বিশপ-অব-নরফক্ 'টাইমস'-এ বেশ লিখেছিলেন মিশনারীদের কথা। বলেছিলেন,"এই যে মিশনারীরা চাঁদা তোলে, কেন? সব আপনাদের সুবিধা হবে বলে। একটা কাজ করছে। তার নাম করে নিজেদের ভাল ভাল ঘর, গাড়ী এসবের যোগাড় হয়ে গেল। কিন্তু ক্রাইস্টের শিষ্যরা তা করতেন না। তাঁরা একেবারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁদের ভাব ছিল apostolic (সর্বস্বত্যাগী ঈশ্বরপ্রেমিক)। আমি জানি, আমার এই কথায় অনেকে রাগ করবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে হক্ কথা না বলে থাকতে পারলুম না। সত্য বলতেই হবে।'

সকাল সাড়ে নয়টা।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। শ্রীমর ডান হাতে বেঞ্চিতে ছোট জিতেন ও জগবন্ধু বসিয়া আছেন পশ্চিমমুখী। এখন রাত্রি প্রায় নয়টা।

আজ ১৩ই মার্চ, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ৩০শে ফাল্গুন ১৩৩০ সাল। বৃহস্পতিবার।

শ্রীমর দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি কি ভাবিতেছেন। আকাশে অগণিত তারা মোতির মত ঝুলিতেছে। কি চিন্তায় শ্রীম বিভোর। অনেকক্ষণ গত হইল। হঠাৎ শ্রীমর মনের ফাঁক বহিয়া তুই একটি চিন্তাকণা বাহিরে আসিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখুন, এইসব তারা—আকাশ। নক্ষত্রের মধ্যে তিনি হলেন চন্দ্র। মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ। আর ঋতুর মধ্যে বসন্ত। এই এখন যা চলছে। এই স্নিগ্ধ ফুরফুরে হাওয়াটি বসন্তের। 'নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী,' (গীতা, ১০।২১) 'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং' 'ঋতুনাং কুসুমাকরঃ' (গীতা, ১০।৩৫)। আপনারা বসে বসে এইগুলি ভাবতে থাকুন।

ভক্তদের এই পাঠ দিয়া শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—কৃষ্ণমঙ্গল যাত্রা হচ্ছে ঐখানে। ঘরের অত কাছে হচ্ছে। খবর রাখতে হয় আগে। আর, একমাস ধরে হচ্ছে। শুনছি, কাল শেষ হবে। মনে থাকলে হয়। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) এক মতে আছে সবই নিরাকার। ভাঙ্গা আর্শিতে গাছের ছাপ পড়লে যেমন দেখায়, তেমনি আমাদের বুদ্ধির উপর ছাপ পড়ে এরূপ দেখাচ্ছে। বস্তুতঃ এসব কিছুই নাই। সব নিরাকার।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—ভাঙ্গা আর্শি, তা'তে গাছের ছাপ পড়েছে, কেমন দেখাবে ?

ছোট জিতেন—সব ভাঙ্গা ভাঙ্গা। পূর্ণ ছবি নয়, তাই ভাঙ্গা।

শ্রীম—ভাঙ্গা! তেমনি finite (সসীম) আমরা। Finiteএর (সসীমের) ছাপ পড়ায় এত সব দেখছি। এরকম এক মত আছে। বস্তুতঃ সবই নিরাকার। (সহাস্যে) বিশ্বাস হয় ?

ছোট জিতেন—কেন হবে না ?

শ্রীম—ঠাকুর যেকালে বলেছেন, সব মত সত্য, তখন মানতেই হবে।

(ভক্তদের প্রতি) একটু গীতা শুনুন। (জগবন্ধুর প্রতি) আলোটা আনুন।

শ্রীম হ্যারিকেনের আলোতে গীতা পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম--গীতা যে শোনায় তার পরাভক্তি লাভ হয়। আর সে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয়তর হয়। আর যারা শোনে তাদেরও ভাল হয়। আমি শোনাচ্ছি আমার ভাল হবে।

(ছোট জিতেনের প্রতি)—তাই মনে করুন, আপনাকে জোর করে ঐ লোকটি (কালীঘাটে) গীতা শুনিয়ে দিলেন। ভারি চালাক লোক। এতে তার ভাল হবে। আপনাকে ভক্ত জেনে উপযুক্ত পাত্র মনে করেই শুনিয়েছেন।

শ্রীম অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৭—৭২ শ্লোক পড়িয়া শুনাইতেছেন।

শ্রীম—এই দেখুন বলছেন ভগবান যারা গীতা শোনায় তাদের লাভ। যারা শোনে তাদেরও লাভ। নিজে নিজে পড়লেও লাভ। বলছেন, 'জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ শ্যামিতি মে মতিঃ' পড়লেই জ্ঞানযজ্ঞ হয়। তাতেই ভগবানের পূজা হয়। শুধু আগুনে ঘি দিলেই কি যজ্ঞ হয়? এতেও হয়। প্রত্যহ এক অধ্যায় করে পড়া উচিত। এই যে আমরা পড়ছি এতেই পূজা হয়ে যাচ্ছে। গদাধর আশ্রমেও দু'এক অধ্যায় রোজ পড়ি।

আবার পড়িতেছেন দ্বাদশ অধ্যায়। ভক্তের লক্ষণ। ষোড়শ থেকে বিংশ শ্লোক পর্যন্ত। 'অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ' ইত্যাদি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠিক ঠিক ভক্ত 'অনিকেতঃ', মানে তার ঘরবাড়ী নাই। ক্রাইস্টও বলেছেন, 'but the son of man hath not where to lay his head'—ঠিক 'অনিকেতঃ' এইটে। এ সময়ে তার দৃষ্টান্ত ঠাকুর। কালীমন্দিরে আছেন। দারোয়ান ভুল করে এসে ঠাকুরকে বললে, এখান থেকে চলে যাবার হুকুম

হয়েছে। গামছাখানা কাঁধে। শুনে সেই অবস্থায় বের হয়ে যাচ্ছেন। মথুরবাবুর ছেলে ত্রৈলোক্য দেখতে পেয়ে বললেন, 'আপনি ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়?' ঠাকুর সহাস্যে বললেন, 'এই যে তোমার দারোয়ান যেতে বললে।' ত্রৈলোক্য দুঃখিত হয়ে বললে, 'না, না, আপনি ফিরে আসুন। দেখুন তো কি অন্যায় তাদের।' আবার হাসতে হাসতে ফিরে এলেন।

হৃদয় মুখুজ্যেকে কালীবাড়ী থেকে বের হয়ে যেতে কর্তারা বললে। দারোয়ান ভুল করে এসে ঠাকুরকে বলেছিল। ত্রৈলোক্য তাই ঠাকুরের কাছে নালিশ করলো (হাস্য)।

বাড়ীঘরের কোন খেয়াল নাই। সর্বদা 'মা মা'। সঙ্গে যাঁর মা, তাঁর কি ভয়? এখানে বলেছেন, 'অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ' যে, সেই ঠিক ভক্ত। মানুষের থাকার জায়গা না থাকলে অস্থির হয়ে পড়ে মন। কিন্তু যে ঠিক ভক্ত অর্থাৎ যার মন ভগবানে মগ্ন তার বাড়ীঘর না থাকলেও মন স্থির। কেন না, ভগবান অচল অটল শান্তস্বরূপ। তাঁ'তে মন যার তিনিও ওরূপ।

'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী,' 'শুভাশুভপরিত্যাগী', 'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ'—এসবও ভক্তের লক্ষণ। সাংসারিক বিষয়ে মন নাই। বিষয়চিন্তা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। মন পরমেশ্বরে লগ্ন। এখানে দ্বন্দ্বের অবসর কোথায়? ভিতরে যাঁকে দেখছে, বাইরে তিনিই বহুরূপে। জীবজগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব—সবই তিনি। সব একাকার। এই অবস্থা অহরহ ঠাকুরের জীবনে দেখেছি।

এইবার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৩—৬৬ শ্লোক পড়িয়া শেষ করিলেন।

শ্রীম—এটিকে বলছেন 'সর্বগুহ্যতমং'। তুমি আমার অতি প্রিয়, তাই তোমায় বলছি এই গুহ্য কথা—ভগবান অর্জুনকে এই কথা বললেন। সেই 'সর্বগুহ্যতমং' বিষয়টি কি? 'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'। অর্থাৎ মন প্রাণ সব আমায় সমর্পণ কর। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ', তাতেই তোমার পরমানন্দ প্রাপ্তি হবে। 'সত্যং প্রতিজানে' সত্য করে ভগবান বলছেন।

এ অবস্থাও ঠাকুরের দেখেছি। মা-বই কিছু জানেন না। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে সর্বদা মা। ঘুমুচ্ছেন—ঘুম অতি সামান্য ছিল, এরই ভিতর 'মা মা' করে উঠছেন। যেমন শিশু করে থাকে। মাতৃগর্ভে শিশু রয়েছে। তার জীবন-মরণ, আহার, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। মায়ের অস্তিত্বে তার অস্তিত্ব। ঠাকুরের তেমনি দেখেছি। মনটা মায়ের সঙ্গে একাকার হয়ে রয়েছে। শরীরটি যন্ত্র। মা যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলছে। ভিন্ন ও অভিন্ন এক সঙ্গে।

শ্রীম (জিতেনের প্রতি) – এই যে সংসারে duties—'সর্বধর্মান্' এও করতে হয় না তাঁকে ভাব দিলে ; আম্-মোক্তারী দিলে। তিনিই ভক্তের সব ভার নেন। এই যে সাধুরা বাপ-মার সেবা ছেড়ে চলে আসেন, তার জন্য তাঁদের প্রত্যবায় হয়। কিন্তু, যেহেতু তাঁরা মন প্রাণ দিয়ে ভগবানকে চিন্তা করতে চেষ্টা করছেন, তা'তেই সেই প্রত্যবায় বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক ঠিক তাঁকে মন না দিতে চেষ্টা করলে, ধর্ম পালন না করবার জন্য যে পাপ সে অবশ্য হবে। শরণাগত হলে আর কোনই বালাই নাই। তাই অর্জুনকে বলছেন, তুমি যুদ্ধ কর। এর লাভ লোকসান, সব ফল আমাতে সমর্পণ কর। তুমি কোনই benefit (লাভ) নিও না। তাঁর যন্ত্র হলে আর পাপপুণ্যের বিচার নাই। মন যদি তাঁ'তেই রইল সেই অবস্থায় কি দেখছে— মরণ মারণ সব এক। তিনি মরছেন, তিনিই মারছেন।

এ খুব উঁচু কথা। দু'একটা জগতে হয় এরূপ আদর্শ। অপরের কাজ হয়ে যায় অল্প স্বল্প করতে চেষ্টা করলেই।

ডাক্তার বক্সী ও বিনয়ের প্রবেশ।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—খবর কি? গিছলেন? কেমন দেখলেন? বাঁচবেন তো?

ডাক্তার—বেঁচে যাবেন।

শ্রীম—আহা, আপনার কথায় আশ্বাস হচ্ছে। মনে এখন আর আশঙ্কা নাই।

মর্টন স্কুলের একজন শিক্ষক সাধু হইয়াছেন। নাম দ্বারকাদাস বাবাজী। তিনি গুরুতর অসুখে ভুগিতেছেন। শ্রীম তাঁহাব সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারই কথা হইল।

শ্রীম (সহাস্যে)—ডাক্তাবরা সব পাবে। ভাল জায়গা কেটেও ঘা করতে পারে (সকলের হাস্য)। সার্জনবা খুব আনন্দ করে কাটতে হলে। হয়তো গোটাকতক কাঁচা দাঁতই তুলে ফেললে (সকলের হাস্য)। হয়েছিল একবার এইরূপ। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মামলা। অন্য পক্ষ আগেই বলে গেছে ডাক্তারকে। 'মশায, ওব একটু মাথা গবম। ওব কথা শুনবেন না।' লোকটিকে নিয়ে যেন বেড়াতে এসেছে ডাক্তাবেব কাছে। একজন একটু ইঙ্গিত কবতেই ডাক্তার তাকে ধরে নিয়ে কয়েকটা কাঁচা দাঁত তুলে ফেললে। সে ব্যক্তি যন্ত্রণায় চীৎকাব করছে। 'আব না না' বলছে। কে শোনে কাব কথা! ডাক্তার ধমক দিয়ে বলছে, 'না তোমাব কথা শুনছি না' (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (ডাক্তাব বক্সীব প্রতি)—দ্বারকা বাবাজী যেখানে আছেন সেটা কি স্বর্ণময়ীর বাগান (মানিকতলায়)?

ডাক্তাব—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম—ও বাগানটা আমাদের খুব familiar (পবিচিত)। (শ্রীমর চোখে হাসি)। ওটা খুবই familar (পরিচিত)। যখন স্কুলে পড়াশোনা করছি তখন বোজ বিকেলে ওখানে বেড়াতে যেতাম। তখন কিন্তু অতদূর বলে মনে হতো না। এখন শুনলেই ভয় হয়। আর ওদিকে বড় খালটার পারেও বেড়াতে যেতাম। তখন দূরেব কথা বা ভাবনা মোটেই ছিল না। গড়ের মাঠে হেঁটে যাওয়া, মনুমেণ্টে ওঠা—এসব কষ্ট বলেই গণ্য হতো না। ঐ বয়সে ওদিকে লক্ষ্যই থাকে না। উঠন্ত বয়স। কিন্তু বার্ধক্যে এক পা এগোতে হলেই ভয় হয়।

(সহাস্যে) আর একদিনের কথা বেশ মনে পড়ছে। আমি আর একটি বন্ধু গেছি ওখানে মানিকতলায় স্বর্ণময়ীর বাগানে।

তখন আমি বি. এ. পড়ছি, কি পাশ করেছি। খুব জল হল। আমরা বারান্দায় অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি আর থামছে না। রাত্রি হয়ে গেছে। তখন উড়ে চাকরগুলি ভাবলে, চোর এসেছে। আর অমনি লোহার ডাণ্ডা বার করে মার। আমার গায়ে পড়ে নাই, কিন্তু সঙ্গে যিনি ছিলেন তার গায়ে খুব পড়লো। একেবারে মর মর। আমরা বলছি, আমরা চোর নই, আমরা বাবু। কে শোনে সে কথা। তারপর বুঝি আলোতে মুখ দেখে মারা বন্ধ করলে। ঐ বন্ধুটি শেষে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তারপর জুনিয়ার সেক্রেটারী গভর্নমেন্টের। ওটা স্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস। (সহাস্যে) এমন মার, একেবারে মর মর !

জগবন্ধু—আপনারা—

শ্রীম—দাঁড়ান দাঁড়ান। শেষ হয় নাই এখনও। আর একটি মজা আছে। ঐ দিন (বলিতে বলিতে হাসির উচ্ছ্বাসে প্রায় দমবন্ধ) আবার জামাই-ষষ্ঠী (সকলের উদ্দাম হাসির রোল)।

প্রায় দশ মিনিট পর পুনরায় শান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—ঐ বাগানের কুঠীর উপরের ঘরে আমাদের যাতায়াত ছিল।

মর্টন স্কুল
১৩ই মার্চ, ১৯২৪

সপ্তম অধ্যায়

ভবতারিণীর পদপ্রান্তে

১

মর্টন স্কুলের ছাদ। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। তাঁহার ডান হাতে বেঞ্চিতে বসা জগবন্ধু ও ছোট জিতেন। এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। ডাক্তার বক্সী ও বিনয় আসিয়াছেন।

ডাক্তার ও বিনয়ের মৃতাশৌচ। তাঁহাদের বাড়ীর ঠাকুরপূজা আজকাল তাই ছোট অমূল্য করেন। তাঁহারা তিন জনে পাশাপাশি বিছানায় শয়ন করেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি)—অশৌচ নিয়ে এক বিছানায় শুতে দিতে নাই। ঠাকুরসেবা করেন কিনা। আলাদা বিছানা করা উচিত। চাদর টাদর ধুয়ে রৌদ্রে দিবেন। আর আজ সকালে অমূল্যবাবুর কালীঘাটে যাওয়া ঠিক হয় নাই। এতে পূজার বিঘ্ন হয়।

ডাক্তাব—অশৌচ নিয়ে পূজোর বাসন মাজা যায় কি ?

শ্রীম—হ্যাঁ, নেবার সময় গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া উচিত। আপনাদের কাছেই তো গঙ্গা। তা'হলে আর কি ? জল তো যথেষ্ট পাওয়া যায়। তা-ও হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বাসন মাজা উচিত। এসব মানতে হয়। ধর্মলাভ বড় কঠিন জিনিস ! ছোটখাট বিষয়ে মন গঠিত হয়। সংযম, পবিত্রতা, অধ্যবসায় শিক্ষা হয়। তবে ঐ মন দিয়ে তাঁকে লাভ হয়—ঐ সংস্কৃত মনে। মোড় ফিরিয়ে দিলেই হল মনেব তাঁব দিকে।

আর, সাধুদের এক বিছানায় বসতে দেওয়া উচিত নয়। স্বতন্ত্র ভাল আসন দেওয়া উচিত।

ডাক্তার—অশৌচ নিয়ে ঠাকুরঘরে যাওয়া উচিত কি ?

শ্রীম—বাইরে থেকে তো দর্শন হয়। তা' হলেই তো হ'ল। এসব মানতে হয়।

জগবন্ধু—খুব ঠেকা হলে কি করে পূজা হবে ?

শ্রীম—অন্য লোক ধরে আনতে হয়। বড়ই মুশকিল এসব। তবে সিদ্ধপুরুষ হলে স্বতন্ত্র কথা। তিনি সব পারেন, তাঁর দোষ নাই। তিনি তো নিজে কিছু ভোগ করেন না। নিজেকে অকর্তা বলে জেনেছেন। তা'হলেও লোকশিক্ষার জন্য এসব মানতে হয় তাঁকেও।

বড় লোক হওয়া ভারী শক্ত। তাঁদের খুঁত সহজেই ধরে কিনা লোক। লোকে বলে, কেন কৃষ্ণই তো অর্জুনকে বলেছিল, শিখণ্ডীকে

রথাগ্রে বসাতে। তা নইলে যে ভীষ্মবধ হয় না! নপুংসক দেখে আর যুদ্ধ করলেন না ভীষ্মদেব।

আবার যুধিষ্ঠিরকে শিখিয়ে দিলেন বলতে, 'অশ্বত্থামা হতঃ'। যুধিষ্ঠির বললেন, 'এ কি করে বলি?' কৃষ্ণ বললেন, 'তা তুমি বোঝ। তা নইলে তোমার সব যাবে।' তবে দ্রোণের বধ হয়। কোন মহাপুরুষ আবার 'ইতি গজঃ' লাগিয়ে দিয়েছেন। Original (প্রথমে) ঐ ছিল 'অশ্বত্থামা হতঃ'।

আবার, কর্ণের রথের চাকা দেবে গেছে। কর্ণ বললেন, 'যুদ্ধ বন্ধ হোক্। চাকা তুলে নি।' অপ্রস্তুত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেই; এইটে ছিল নিয়ম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'এইবার একে মার। এই ব্যক্তিই তোমার অভিমন্যুকে বধ করেছিল। এই ব্যক্তিই তোমার সর্বনাশ করেছে, তোমার হেন করেছে, তেন করেছে। মার মার, তোমার মহাশত্রু এ।'

(ভক্তদের প্রতি) আচ্ছা, যুদ্ধে বুঝি এসব দোষের নয়? রামচন্দ্র, বালীবধের সময় কি করলেন? সীতাকে লোকরঞ্জনের জন্য বনে দিলেন। শম্বুককে মারলেন। এগুলি লোক খুব ধরে। তাই বড় হওয়া বড়ই কঠিন।

ডাক্তার ও ছোট জিতেন প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—আপনারা যেতে পারেন একদিন বিকেলে স্কুল-ছুটির পর। রামবাবুর বাগান, সুরেশবাবুর বাগান দর্শন হবে। এ সব মহাতীর্থ! আর দ্বারকা বাবাজীকে দেখে আসবেন। আমাদের কথা বলবেন তাঁকে।

জগবন্ধু—স্কুলে ভক্ত ছেলেরা আছে। ও পাড়ায় ওদের বাড়ী। ওরাও বাবাজীর সংবাদ নিতে পারে। আমরাও রোজ তাদের কাছে বাবাজীর সংবাদ পেতে পারি।

শ্রীম—ভক্ত ছেলে থাকলে চিঠি লিখেও পাঠাতে পারে, ছুটি থাকলে।

শ্রীমর দৃষ্টি আকাশে।

শ্রীম (বিনয় ও জগবন্ধুর প্রতি)—চেয়ে দেখুন না একবার, কি কাণ্ডখানাই করেছেন। আকাশ, তারা, চাঁদ—অনন্ত কাণ্ড তাঁর! তিনিই আবার মানুষ হয়ে আসেন। সম্প্রতি এসেছেন ঠাকুর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ইচ্ছামাত্র হয়, তিনি বাক্যমনের অতীত। তিনিই মানুষ হয়ে এসেছেন—এ কি কবে বিশ্বাস করে মানুষ? তিনি কৃপা না করলে, ধরা না দিলে চেনা যায় না!

২

মর্টন স্কুলের চারতলার ঐ ছাদ। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট উত্তরাস্য। ভক্তরা সব সামনের বেঞ্চিতে পূর্ব-পশ্চিমে মুখোমুখী বসিয়াছেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ মোহনবাঁশী, রাখাল ও মনোরঞ্জন আসিয়াছেন। তারপর বড় জিতেন, ডাক্তার ও বিনয় আসিলেন। জগবন্ধু পূর্ব হইতেই আছেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। আজ ১৮ই মার্চ ১৯২৪, শুক্রবার। অশ্বিনীবাবু আসিয়াছেন। ইনি মায়ের মন্ত্রশিষ্য, সরকারী কর্মচারী। ধ্যানান্তে শ্রীম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অশ্বিনীর প্রতি)—আপনি যাবেন। অনাদি মহারাজ গীতা পড়াচ্ছেন। সাধুমুখে শুনতে হয় শাস্ত্র। ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, গীতা পড়নি? গীতা পড়ো। এতে যুক্ত আহার-বিহারের কথা আছে। গীতার কথা কাটবার যো নাই। গীতা সর্ব শাস্ত্রের সার।

অনাদির স্বভাবটি বেশ। ভারি মিষ্টি স্বভাব। ঘর করেছি কিনা এদের সঙ্গে মিহিজামে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—অন্য কথা হচ্ছে। ঠাকুর ফস্ করে কথার current (স্রোত) ফিরিয়ে দিলেন। খুব মোলায়েম ভাবে। অপরে টেরও পায় নি যে কথার মোড় ফিরে গেছে। Aggressive wayতে (জোর করে) নয়। ঐ একটি অদ্ভুত কৌশল দেখেছি।

কথা কওয়ার সময় মানুষের হুঁশ থাকে না। একেবারে ডুবে যায় তা'তে। তিনি ঐ current-টা (প্রবাহটা) ঈশ্বরের দিকে direct (চালিত) করতেন।

ঠাকুর বলতেন, অনেক কষ্টে একজন আগুন করলো। তখন অন্যেও পোয়াতে পারে কিনা বল? সাধুরা কত কষ্ট করে তপস্যা করে বুঝেছেন কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ।' সেগুলি অনায়াসেই পাওয়া যায় গেলে।

অশ্বিনী—অনাদি মহারাজ একদিন বলেছিলেন—দেখুন, এইখানেই আফিস হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

'সৎকথা' পাঠের কথা উঠিল। ঐ পুস্তকের 'বিজ্ঞান' অধ্যায়ের সম্বন্ধে কথা হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ কবিতার কথা আসিয়া পড়িল।

শ্রীম (অশ্বিনীর প্রতি) —ওদেশের (ওয়েস্টের) কবিতা কেবল ভোগের জন্য। বেশীর ভাগই ভোগের কথা। এদেশে কিন্তু তা হয় না। দেখুন, কালিদাস কি সুন্দর description (বর্ণনা) দিয়েছেন হিমালয়ের! 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।' 'দেবতাত্মা' বলেছেন। শিবের সমাধির চিত্র যা এঁকেছেন কলম দিয়ে, কি সুন্দর!

ক্রমওয়েল সেকস্‌পিয়র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। 'তুমিই আমাদের সর্বনাশ করেছ' এই বলে। মিলটন্‌কে মাথায় রাখলেন। পিউরিটান কিনা! তখনও বুঝতে পারেন নাই সেকস্‌পিয়রের দাম। বলেছিলেন, তুমিই নাটক নবেল থিয়েটারের সৃষ্টি করেছ।

কিন্তু সেক্‌সপিয়রের শুধু human natureএর (মানুষের প্রকৃতির) এক একটি পিকচার এঁকেছেন। ইনি যা দেখেছেন তাই এঁকেছেন। অমুক অমুককে ভালবাসে, এসবই বেশী। সমাজে এর সংখ্যাই তো বেশী। ক'টা লোক puritan (নীতিবাদী)!

ওদেশে প্রায় ভোগের জন্যই কবিত্ব। প্রকৃতিকে তারা ভোগের বস্তু মনে করে। স্ত্রী প্রকৃতির highest manifestation (সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ); quintessence of beauty—সৌন্দর্যের জমাটবাঁধা

মূর্তি। যেখানে সৌন্দর্য, সেখানেই প্রকৃতি। স্ত্রীলোক highest (সকলের বড়)।

শ্রীম আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। আকাশ ভরিয়া তারা জ্বলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দেখুন, দেখুন ঐ দিকে চেয়ে। কি করে রেখেছেন! এই বাইরে এই কাণ্ড, আবার (বক্ষ দেখাইয়া) এইখানে, ভিতরে।

রাস্তা দিয়া বরযাত্রীদল দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। বাজনা বাজিতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—শুনুন, কি সুন্দর বাজনা! শব্দের ভিতর এই সৌন্দর্যকে দিয়েছেন। এটি মানুষ করে নাই। ঈশ্বর করেছেন। এইসব সৌন্দর্য যিনি করেছেন তিনি কত সুন্দর!

বিয়ে করতে যাচ্ছে। এ ব্যবস্থাও তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। তবে তো সৃষ্টি থাকবে। আবার একদল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এ দুই-ই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে।

ছেলেদের বইয়েতে আছে, 'ফড়িংবাবুর বিয়ে, যাচ্ছেন তিনি বাজনা নিয়ে।' ফড়িংবাবুই বটে। ফড়িংবাবু মানে—moth, perishable—দু'দিনের জন্য। ফড়িং আর মানুষে পার্থক্য এই, মানুষ ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারে। তা না করলে মানুষও ফড়িং-এর মত তুচ্ছ।

৩

দক্ষিণেশ্বর মন্দির। মা ভবতারিণীর সম্মুখে চত্বরে দাঁড়াইয়া শ্রীম মাকে দর্শন করিতেছেন। সঙ্গে বীরেন। ইনি এটর্নি। আজ রবিবার—ছুটি। তাই শ্রীমকে সঙ্গে লইয়া মোটরে আসিয়াছেন। এখন অপরাহ্ণ ছয়টা।

ডাক্তার, বিনয় ও জগবন্ধু একসঙ্গে শ্রীমকে প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম বিস্ময়ে বলিতেছেন—ওমা, আপনারা কোথেকে এলেন? হাঁপিয়ে গেছেন যে!

কাশীপুর ডাক্তারের বাড়ী হইতে ইঁহারা আসিয়াছেন ডাক্তারের গাড়ীতে।

শ্রীম নাটমন্দিরের ভিতর দিয়া প্রাঙ্গণে নামিলেন। ঠাকুরের প্রাচীন ভক্ত কিশোরী রায় আসিয়া শ্রীমকে নমস্কার করিলেন। তিনিও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীম বিষ্ণুমন্দিরে প্রণাম করিয়া চরণামৃত লইতেছেন। অঙ্গনে নামিয়া সিঁড়ির নীচে উত্তরাস্য হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। আর মুখে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' এই নাম। তারপর উত্তর দিকের শেষ শিবমন্দিরের সোপানে, অঙ্গন হইতে তৃতীয় ধাপে, মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিতেছেন, ঐ ধাপের উত্তর প্রান্ত হইতে আড়াই হাত দক্ষিণে। বলিতেছেন, 'ঠাকুর এখানে বসে থাকতেন অনেক সময়। যে ফটো এখন সর্বত্র পূজিত হয়, সেটি এখানেই নেওয়া হয়। গভীর সমাধিতে মগ্ন।'

এইবার 'শিব শিব' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। রামলালদাদা যুক্ত করে নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীমও যুক্ত করে নত হইয়া প্রতি-নমস্কার জানাইলেন।

শ্রীম ঠাকুরের ছোট শয্যার মাঝামাঝি মেঝেতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ঐখানে মেঝেতে বসিয়া বলিলেন, আলোটা ঐখানে রাখুন তো একজন। আমি প্রথম দিন এসে হ্যারিকেনটা ঐখানে দেখেছিলাম। ঠাকুর এইখানে বসা খাটে, পূর্বাস্য। জগবন্ধু হ্যারিকেনটা উঠাইয়া ছোট খাটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দেয়ালের কাছে মেঝেতে রাখিলেন। শ্রীম ধ্যান করিলেন খানিক। পুনরায় বলিতেছেন—গাইয়ে নাই কেউ? এখন উঠিয়া ঠাকুরের শয্যাদ্বয় প্রদক্ষিণ করিতেছেন। দুইটি খাট ও শয্যা উত্তর দিকে জোড় হাতে স্পর্শ করিয়া ঐ হাত মস্তকে স্থাপন করিলেন। এইবার গোল বারান্দায় দাঁড়াইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। এখন ভাটা। গঙ্গার অপর পারে বালি ও উত্তরপাড়া। বিজলীর আলো দেখা যাইতেছে।

শ্রীম গঙ্গার বড় ঘাটে আসিয়াছেন। উপরের দিক হইতে

দ্বিতীয় সোপানে বসিলেন, উত্তর দিক হইতে আট হাত দক্ষিণে। বলিতেছেন, এইখানে ঠাকুর এসে বসতেন কেশব সেনেরা এলে। (অন্তেবাসীর প্রতি) এইটে ভিজিয়ে আনুন তো। অন্তেবাসী গামছাখানা ভিজাইয়া আনিয়া শ্রীমর হাতে দিলেন।

পুনরায় কালী মন্দিরে। নীচের চত্বরে মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। আশে পাশে ভক্তগণ। সম্মুখে মা ভবতারিণীর দর্শন হইতেছে। অন্তেবাসী শ্রীমর ডান হাতে বসিলেন। তাঁহাকে শ্রীম বলিলেন, আপনি এখানে বসুন। অন্তেবাসী উঠিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়াছেন। ডান হাতের স্থানটি—যেখান হইতে অন্তেবাসী উঠিয়া গেলেন—দেখাইয়া বলিতেছেন, ঠাকুর আমাকে সঙ্গে করে এখানে বসেছিলেন। আমি এইখানেই বসেছিলাম! এমনি বসন্ত কাল তখন। চাঁদও এইখানেই ছিল।

চাঁদ উপরে পূর্বাকাশে।

নাটমন্দিরের উত্তরের দুইটি স্তম্ভ দেবীর সম্মুখের নীচের চত্বরের গায়ে। ইহার পূর্ব দিককার স্তম্ভটির আধ হাত উত্তরে চত্বরে ঠাকুর বসিয়াছিলেন। অথবা, উত্তর-দক্ষিণ একটি রেখা টানিয়া নাটমন্দিরকে ঠিক দুই ভাগ করিলে, পূর্ব ভাগের উত্তর-পশ্চিমের স্তম্ভ হইতে চত্বরে আধ হাত উত্তরে ঠাকুর বসিয়াছিলেন। শ্রীম বলিতেছেন, এইখানে বসে প্রার্থনা করেছিলেন, 'দেহসুখ চাই না মা। অষ্ট সিদ্ধি চাই না মা। শত সিদ্ধি চাই না মা। লোকমান্য চাই না মা। শরণাগতি, শরণাগতি, শরণাগতি। আর এই করো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।'

(ভক্তদের প্রতি)—'সদানন্দময়ী কালী' এই গানটি গান না আপনারা। এই বলিয়া শ্রীম নিজেই আরম্ভ করিলেন। ভক্তরাও সঙ্গে যোগদান করিলেন—বীরেন, ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, মহেশ চৈতন্য, গদাধর প্রভৃতি।

গান। সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী।

তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি।

আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশী-ভালী।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
সবেমাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন রাখ তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি॥
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে মা গালাগালি।
এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম-দুটো খেলি॥

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবির কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা
সেই দেশের এক লোক পেয়েছি॥
কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্দী করেছি।

শ্রীম কালীমন্দিরের সম্মুখে চত্বরের দক্ষিণ প্রান্তে মধ্যস্থলে বসিয়াছেন। সম্মুখেই মা কালী। শ্রীমর ডান দিকে ঠাকুরের আসনে স্থান ছাড়িয়া দিয়া জগবন্ধু ও গদাধর গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছেন। শ্রীমর বামদিকে ডাক্তার, বিনয় ও মহেশ চৈতন্য পূর্বাস্য। সকলে ইংরেজী 'ই'র (E) আকৃতিতে বসা।

শ্রীম মা-কালীকে প্রণাম করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তারপর রাধাকান্ত মন্দির। রাধাকান্ত মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। রামলালদাদা উত্তরের দরজা খুলিয়া দিলেন। শ্রীম কিছুক্ষণ দাদার সঙ্গে কথা কহিয়া উত্তরের বারান্দা দিয়া ডাক্তারের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। ভক্তরা বীরেনের মোটরে। রাত্রি সাড়ে এগারটায় মর্টন স্কুলে।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
১৬ই মার্চ ১৯২৪, ২রা চৈত্র ১৩৩০
রবিবার। দশমী ও একাদশী (শুক্লা)

অষ্টম অধ্যায়

খাদ না হলে গড়ন হয় না—ভীষ্মদেব

১

মটন স্কুল। চারতলার ছাদ। বসন্ত কাল। রাত্রি সওয়া নয়টা। আকাশে চাঁদ। মধু রজনীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে পৃথিবী প্লাবিত। শ্রীম বাঘাম্বরী কম্বলে উপবিষ্ট ছাদের, উপর উত্তরাস্য। পাশে দুই দিকে বড় জিতেন, মনোরঞ্জন, ডাক্তার, বিনয়, বলাই ও জগবন্ধু।

আজ ১৭ই মার্চ, ১৯২৪ খ্রীঃ। ৩রা চৈত্র, ১৩৩০ সাল। সোমবার।

আধ ঘণ্টা পূর্বে শ্রীম দোতলার সিঁড়ির সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া ভক্তদের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। হঠাৎ চাঁদের কথা মনে পড়ায় ভক্তদের বলিলেন, 'চলুন যাই, চাঁদ দেখি গিয়ে—আমাদের চাঁদ।'

শ্রীম সর্বদা বলেন, 'এই চাঁদ ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। ইনি তাঁর সাক্ষী। আমাদের অতি আপনার জন। আবার "নক্ষত্রাণামহং শশী" এ-ও আছে! ইনি আবার কবিও বটে।' এই সব মিলিয়া চাঁদ শ্রীমর অত প্রিয়।

প্রশস্ত ছাদে চাঁদের আলোর বন্যা। শ্রীম আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। কি অদ্ভুত তাঁর চরিত্র! ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়! সর্বদা ব্যস্ত কি করে peace (শান্তি) হয়, কি করে জগতের কল্যাণ হয়! যুদ্ধের আগে দুর্যোধনের কাছেও গেলেন peaceএর (শান্তির) জন্য। তখন ওরা তাঁকে বেঁধে আটক করে রাখবে বলে ঠিক করেছিল। জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'শুনতে পেলাম ওরা আমায় বাঁধবার চেষ্টায় আছে। আমি এদের দেখিয়ে দিতাম কে কাকে বাঁধে। আপনি সামনে তাই বিরত হলাম। আপনার সামনে পাপাচরণ করবো না, ধৃষ্টতা হবে।'

যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য কত চেষ্টা। কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি প্রথম পাণ্ডব। আমরা আপনাকে রাজা করবো। আপনি যুদ্ধে বিরত হন।' তার পর কর্ণের জন্মের সকল বৃত্তান্ত বললেন। কর্ণ উত্তর করলেন, 'সকলে জানে আমি সূত্রধর অধিরথ ও রাধার সন্তান। তাঁদের জাতে বিয়েও করেছি। ছেলেপুলে হয়েছে। এসব ছেড়ে কি করে যাই। বিশেষতঃ, দুর্যোধন আমার উপকার করেছেন। লোকে বলবে কি?' এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় আলিঙ্গন করে চলে এলেন। বলতে বলতে এলেন, 'দেখছি সব যাবে তা'হলে, আপনি যখন এলেন না।' আহা, কত চেষ্টা যাতে রক্তপাত না হয়!

শ্রীম—ভীষ্ম শরশয্যায়। তিনি পাণ্ডবদের বলছেন, 'যিনি আমাদের সঙ্গে সর্বদা ঘুরছেন তিনিই পুরাণ-পুরুষ।'

জগবন্ধু—পাণ্ডবরা চিনতে পারেন নাই?

শ্রীম—কখনও পারতেন, আবার ভুলে যেতেন। তাঁকে ভাই মনে করতেন।

বড় জিতেন—অত বড় লোক ভীষ্ম! কিন্তু যুদ্ধে indifferent (উদাসীন) হয়ে রইলেন কেন?

শ্রীম—সব তাঁর ইচ্ছা। কি করে মানুষ বুঝবে তাঁর কাজ। তাঁকে কি মানুষ বুঝতে পারে? ভীষ্ম একটি character (চরিত্র) করবেন এই করে। তাই হলো। লোক শিখবে ঐ ভীষ্মচরিত্র দেখে। সব তো আর একরকম প্রকৃতি নয়। তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন object lessons (শিক্ষা)।

হতে পারে ভীষ্ম দৈববাণী কি আকাশবাণী পেয়েছিলেন—কি কারো আদেশ পেয়েছিলেন। এত বড় মহাপুরুষ, আদেশ পাওয়া সম্ভব। বলতে পারেন, 'সবই তো মিথ্যা। সবই যাবে। যাবার সময় এসেছে। তুমি ঐ পক্ষে থেকেই যুদ্ধ কর।' কারণ unreportedও (অজ্ঞাতও) থাকতে পারে। সবেরই কি রিপোর্ট হয়েছে? অনেক আবার প্রক্ষিপ্তও ঢুকেছে।

এ-ও হতে পারে। এতকাল কৌরবদের সঙ্গে রইলেন। সত্য

করতে পারেন। দুর্যোধন ধরতে পারেন—'আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন' বলে। এতদিন একসঙ্গে থেকে adaptation (স্নেহাসক্তি) হয়ে যেতে পারে। হয়তো কথা দিয়ে ফেলেছেন, 'আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো!'

এ-ও হতে পারে। ভীষ্ম জানতেন শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। মানুষ হয়ে এসেছেন। তিনি যখন সঙ্গে আছেন তখন কোনও অমঙ্গল হতে পারে না। যুদ্ধ হোক বা না হোক। যেখানে ছিলেন সেখান থেকে তাঁর লীলা দেখছেন যন্ত্রবৎ।

দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, মত দিলেন বটে। কিন্তু 'অলক্ষণ দেখলে ধনুর্বাণ ত্যাগ করবেন'—একথাও বললেন। শ্রীকৃষ্ণ একথা জানতেন, অন্তর্যামী। তাই তো শিখণ্ডীকে বসাতে বললেন অর্জুনের রথে। তাকে দেখে যুদ্ধ ত্যাগ করলেন। শিখণ্ডী নপুংসক—অলক্ষণ।

ঠাকুর বলতেন, 'খাঁটি সোনায় কাজ হয় না। খাদ মিশালে তবে হয়।' তাই একটু খাদ হয়তো ছিল। এতে আশ্চর্য কিছু নয়। একটু খাদ না থাকলে কি করে অত কাণ্ড হয়—এই মহাভারত'!

শ্রীম—ধৃতরাষ্ট্রেরও গুণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ কত মান দিতেন। বিদুরও খুব মান্য করতেন। গান্ধারী সতী। ইনিও খুব ভালবাসতেন, কত সেবা করেছেন, অন্ধ তবুও। কিন্তু থিয়েটার-যাত্রাওয়ালারা এই চরিত্রটাকে খারাপ করে দাঁড় করিয়েছে।

শ্রীম নীরব কিছুকাল। পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি)—আপনি শোনেন নি বুঝি? মঙ্গলবারে হয়ে গেছে (গীতা ক্লাস অনাদি মহারাজের)। আপনি বেশ যেতে পারেন।

ভক্ত—সকালে স্নান করেই 'ল' কলেজে যাই। তারপর স্কুলে যেতে হয়।

শ্রীম—'ল' কলেজ সওয়া আটটায়। তা, ওখান থেকে পৌনে আটটায় চলে এলে হয়। আধ ঘণ্টা রইল হাতে। তারপর ক্লাস করে স্কুলে আসা যায়। এখন গরম পড়েছে। সাতটার আগে খেলেও হয়।

একসঙ্গে পাঁচটা কাজ কি করে করতে হয় তার দৃষ্টান্ত ঠাকুর বলেছিলেন। বলতেন, 'ওদেশে ঢেঁকিতে চিড়ে কুটছে একটি স্ত্রীলোক। হাত দিয়ে নাড়ছে ধানগুলি। ছেলেকে মাই দিচ্ছে, আর খরিদ্দারের সঙ্গে টাকাকড়ির হিসেব করছে। একসঙ্গে অতগুলি কাজ করছে কিন্তু প্রধান লক্ষ্য মূষল না হাতে পড়ে।'

গড়ের মাঠে উইলসনের সারকাস দেখে ঠাকুর বলেছিলেন—'দেখ, অভ্যাসে কি না হয়। চলন্ত ঘোড়ার উপর কেমন দাঁড়িয়ে পড়েছে, আবার নেমে যাচ্ছে। ঘোড়াটা তীরবেগে রিংএর চারিদিকে ঘুরছে। বিবি একপায়ে চট্ করে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে রিংএ ঘুরছে। আবার চট্ করে নেমে পড়ছে। তেমনি খুব অভ্যাস থাকলে সংসার করা যায় অনাসক্ত হয়ে ভগবানে মন রেখে।'

গদাধর আশ্রমে দেখি, ওরা চারটার সময় ওঠে—শীতকালেও ঐ। আর সারাদিন খাটছে। সকলেরই ঐ সময় ওঠা উচিত। ওদের সঙ্গে ঘর করে দেখেছি কি করে সময় কাটায়। কত কাজ করছে, অভ্যাস করেছে বলে। (ভক্তের প্রতি) বেশ পাবে। দেখুন না একদিন গিয়ে, সুবিধা হয় কি না। না হয় পরে না যাবেন।

কলিকাতা সহরে ভগবানের জন্য কে কি করিতেছে, শ্রীম তাহার সংবাদ লন সেবকদের দিয়া। কখনও নিজেও চলিয়া যান। এক একবার বলেন, ভগবানের জন্য কে কি করছে সবটা সিন্ একসঙ্গে দেখতে ইচ্ছা হয়। বৌদ্ধবিহার, থিওসফিকেল হল, আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, গুরুদ্বারা, গীর্জা, মসজিদ, মঠ, মন্দির, সিনাগগ্ সর্বত্র শ্রীমর গতিবিধি আছে এবং ভক্তদেরও প্রেরণ করেন।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। চাঁদের কিরণে আকাশ আবৃত। পৃথিবীও প্লাবিত। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। মেঝেতে কম্বলের উপর ভক্তগণ বসা—বড় জিতেন, শুকলাল, ছোট জিতেন, বিনয়, জগবন্ধু, মাখন প্রভৃতি। ছাদের উপর বসন্তের মোলায়েম

হাওয়ার সঙ্গে চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণজালের অবাধ আলিঙ্গন চলিতেছে। এখন রাত্রি আটটা।

আজ ১৮ই মার্চ ১৯২৪ খ্রীঃ, ৪ঠা চৈত্র ১৩৩০ সাল। মঙ্গলবার। জনৈক ভক্ত আজ সকালে গীতার প্রবচন শুনিতে গিয়াছিলেন। শ্রীম তাহার বিবরণ শুনিলেন। 'অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্'—এর শাঙ্কর ভাষ্য শুনিলেন। শ্রীম বলিতেছেন—এ-ও ঠিক। তা-ও ঠিক। 'আবার তার উপরও আরও কত কি হতে পারে' ঠাকুর বলতেন। যুক্তিযুদ্ধের কথায় বলিলেন, "ও বাবা, এ আবার কি? 'কে জানে কালী কেমন—।' "

বড় জিতেন—গীতা-মাহাত্ম্য বড় বাড়াবাড়ি।

শ্রীম—হুঁ। দুই-ই সত্য। এটা না থাকলে ওটা বোঝা যাবে না। যার এটা ভাল লাগবে, ওটা ভাল লাগবে না। ওটা হলে এটা না। ঠিক সব কথাই—অবস্থা ও রুচিভেদে।

গীতা কি বোঝা যায়? কি অদ্ভুত চরিত্র শ্রীকৃষ্ণের! পণ্ডিতের কাজ নয় এটি বোঝা। আর একজন শ্রীকৃষ্ণের মত দেখলে তবে বোঝা যায় কতক। আমরা যদি একটু বুঝে থাকি, তবে ঐ চরিত্র (ঠাকুরের) দেখেছি বলে। অন্যে কি করে বুঝবে? কি কাণ্ডই করে গেছেন! শুধু বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না। খালি সংশয় এসে পড়ে। বুদ্ধির সঙ্গে কৃপা আর বিশ্বাসের যোগ হলে বোঝা যায় কতক।

রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়। ঠিক তেমনি ব্যবহার। শ্রীকৃষ্ণও ক্ষত্রিয়, তাঁর আচরণও তাই। রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পা ধোয়ার ভার নিলেন নিজে। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' পাণ্ডবরা দ্বারকায় গেলেন রাজসূয়ের অনুমতি আনতে। বললেন, 'কি করে হয়! জরাসন্ধ যে নিজেকে রাজচক্রবর্তী বলে দাবী করেছে। তাকে আগে পরাজিত করা দরকার।'

তাই অর্জুন আর ভীমকে নিয়ে গেলেন জরাসন্ধের কাছে। রাজগীরে তার রাজধানী ছিল। তিনজনেরই অতিথি-ব্রাহ্মণের বেশ। সদর ফটক দিয়ে যান নাই। জরাসন্ধ ছিয়াশিজন রাজাকে বন্দী

করে রেখেছে। বাকী ষোলজন পেলেই এদের বলি দেবে, এই ইচ্ছা। খাওয়া দাওয়া সব হল অতিথির মত। এইবার শ্রীকৃষ্ণ আত্মপরিচয় দিলেন। আর আসার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করলেন। জরাসন্ধ রেগে গেল, বললে—তোমরা অন্যায় ভাবে এসেছো, দেয়াল ডিঙ্গিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন শক্তি থাকতে, সামনে অন্যায় হচ্ছে তার প্রতিবিধান না করলে পাপ হয়, তুমি বল একথা ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ কিনা? জরাসন্ধও শাস্ত্রজ্ঞ। কি আর বলে! তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অযথা লোকক্ষয়ের প্রয়োজন নাই। তোমাদের একজন আর আমাদের তিনজনের একজন—এ দু'জনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক। হার-জিত এর ফলাফলের উপর নির্ভর করবে। তাই হলো। ভীমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার পরাজয় হয়।

(ভক্তদের প্রতি) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ। সামনে অন্যায় হচ্ছে। শক্তি থাকতে প্রতিবাদ না করলে তোমার পাপ হবে। সোজা নয় জীবনধারণ। 'ওর হচ্ছে আমার কি', বললে হবে না।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—কত দিকে নজর দেখুন না। peace-এর (শান্তির) জন্য কত চেষ্টা। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমিই এ কাজের উপযুক্ত। তুমি যাও। তোমার তো শত্রু-মিত্র ভেদ নাই—'তুল্য মিত্রারি পক্ষয়োঃ'। এঁরা কখনও ধরতে পারতেন তাঁর স্বরূপ, আবার ভুলে যেতেন। শান্তির জন্য চললেন, রাস্তায় ক্যাম্প করলেন একস্থানে। সেখানকার ব্রাহ্মণেরা এসে উপস্থিত। সকলেই বলছে, আমাদের বাড়ীতে একবার যাবেন। তখন সন্ধ্যা। লোকশিক্ষার জন্য সেখানে সন্ধ্যা করতে হলো। তারপর সকলের বাড়ী গেলেন। গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। বলছেন, 'ক্ষত্রিয় রাজারা আপনাদের সেবা করছে তো? আপনাদের তপস্যার কুশল তো?' এই বিচিত্র চরিত্র!

শ্রীম অন্যমনস্ক। পুনরায় কথাপ্রসঙ্গ চলিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একটি ভক্ত খালি চেয়ে থাকতো ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর ঐটে লক্ষ্য করেছেন। তাই ইঙ্গিত করলেন,

'সবটা মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এল, তা'হলে আর বাকী রইল কি?' কিন্তু কর্ম না করে মানুষ থাকতে পারে না। কর্ম ছাড়া নড়বার উপায় নাই। বিরাটরাজার বাড়ীতে পাণ্ডবরা রয়েছেন। দূত গেল। বললেন, 'তোমরা বেশ আছ। ঈশ্বরের নাম করছ। রাজ্যে কি হবে?' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'তা কি হয়? এদের কর্ম করতে হবে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, রাজ্যশাসন এসব করতে হবে এদের। চন্দ্র, সূর্য, সকলেই কর্ম করছে।'

শ্রীম (যুবকের প্রতি)—দুর্যোধনের কাছে যাচ্ছেন শান্তি সংস্থাপনের জন্য। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। বললেন, 'দেখুন, শাস্ত্রে আছে আপনার কথা না শুনলে আপনার ছেলেরা, আপনি তাদের বেঁধে রাখতে পারেন।' গুপ্তচর আছে। এরা গিয়ে বললে একথা ওদের কাছে। ওরা শুনে, দুর্যোধন ও কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করলে শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে ফেলা যাক। আবার ওদেরও চর আছে। তারা এসে একথা শ্রীকৃষ্ণকে বললে (সকলের হাস্য)! ধৃতরাষ্ট্র শুনে, দুর্যোধনকে—ডাকিয়ে এনে তিরস্কার করলেন। বকুনি খেয়ে দুর্যোধন ফড়র-ফড়র করতে করতে চলে গেল। Peace (শান্তি) হল না। তখন সাত্যকী আর কৃতবর্মাকে নিয়ে ফিরে এলেন। ফ্রেণ্ডস্, আবার মন্ত্রী!

কি আশ্চর্য, contemporary (সমসাময়িক লোক) তাঁকে চিনেছিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার শত্রু-মিত্রে ভেদ নাই।

আবার কুন্তী প্রার্থনা করছেন, 'বাবা, দুর্দিনেই তোমায় পেয়েছিলাম। ঐ দুর্দিনটি যেন থাকে।' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাচ্ছেন। কুন্তী পিসিমা। তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছেন। কুন্তী বললেন, 'কি করে বলি, এখানেই থাক। ওদের প্রাণ কাঁদছে তো তোমার জন্য। ওরাও আমার আপনার জন। তবে এসো। কিন্তু এ বর দাও, সকল স্নেহবন্ধন কাটিয়ে যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে। বিপদে তোমায় পেয়েছিলাম। বিপদই যদি তোমায় পাবার উপায় হয়, তবে আমায় সারা জীবন বিপদ দাও।' ঠিক মানুষের মত উত্তর করলেন, 'এসব কি বলছেন পিসিমা!'

মানুষের ভাবেই কৃষ্ণ বললেন, 'অনেক দিন হয়ে গেল, পিতা-মাতাকে দেখি নাই। মনটা কেমন করছে! একবার শীঘ্র দেখতে যাব ভাবছি।' ঠিক মানুষ। কর্ণও চিনেছিলেন, তাই বলেছিলেন কৃষ্ণকে, 'পাণ্ডবপক্ষে এখন যাই কি করে? জানি সব নষ্ট হবে তোমার কথা না শোনায়; কিন্তু যাবার উপায় নাই।' কথা দিয়েছিলেন কিনা!

জগবন্ধু—কর্ণ কি জানতেন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে?

শ্রীম—আমরা এই question (প্রশ্ন) put (জিজ্ঞাসা) করেছিলাম। ঠাকুর বললেন, লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগে। তাঁর কাছে রয়েছেন, দর্শনই যথেষ্ট।

গদাধর দক্ষিণেশ্বর থাকে। গত রাত্রিতে আসিয়াছে।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—নুন ভাত হলেই হল। এক বেলা নাই বা হলো। বিদ্যেসাগর মশায় বলতেন, 'তিন বাড়ী থেকে চেয়ে নিয়ে তিন মুঠো চাল ফুটিয়ে নুন দিয়ে খাব।' কি জায়গা দক্ষিণেশ্বর, সেখানে থাকা! কত সুবিধা! একটু খাওয়ার কষ্ট হলোই বা। পেটে খেলে পিঠে সয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—মনটা খালি দক্ষিণেশ্বর-দক্ষিণেশ্বর করছে। একটা বাড়ী পাওয়া যায় কিনা—কে জানে। শিবতলার রাস্তায় ঐ বারুদখানার পাশের বাড়ীটা বেশ। ওটা হলে বেশ হয়! আর তো হবে না ভাগ্যে। তাই ইচ্ছা হচ্ছে, এখন কয়দিন থেকে এলে হয়।

(রহস্য করে) আচ্ছা, ভাত প্যাকেটে করে নিয়ে গেলে হয় না? জামা কাপড়ে না হয় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া যাবে। গঙ্গাজলের তো মাহাত্ম্য আছে। তা' হলে আর কি? প্যাকেটে করে ভাতে ভাত নিয়ে গেলুম। খুলে খেয়ে পেট ভরে জল খাও। বেশ হয় গেলে। কে যায়, অত নিয়ম পালন করতে? পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত পালন করা যায়। তার বেশী হলে আর কেন?

দশটা বাজিয়া গেল। ভক্তরা বিদায় লইলেন।

শ্রীম ছাদে বেড়াইতেছেন—চাঁদের দিকে চাহিয়া। এক একবার

দাঁড়াইয়া চাঁদ দেখিতেছেন। এখন এগারটা রাত্রি। একটি ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখুন, দেখুন, এই আমাদের চাঁদ।' ভক্তটি শ্রীমর কাছে দাঁড়াইয়া চাঁদ দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, চাঁদ তো সর্বদাই দেখছি। এতে আর নূতন কি আছে? বুঝি বা শ্রীম চাঁদে আর কিছু দেখিতেছেন। কি ভালবাসা এই চাঁদে।

পরের দিন রাত্রি দশটার পর। অন্তেবাসী বেলেঘাটা হইতে ফিরিয়াছেন। শ্রীমও গদাধর আশ্রম হইতে আসিলেন। অন্তেবাসী বলিলেন, 'শুকলালবাবুকে বলে এসেছি সব কথা, যা সব আপনি বলে দিয়েছিলেন।' শ্রীম বলিলেন 'কি বলেছেন আবার বলুন তো?' অন্তেবাসী বলিতেছেন, এখানকার পরিচয়ে যাদের সঙ্গে শুকলালবাবুর পরিচয়, তারা যদি তাঁর কাছে টাকাকড়ি চায় তবে আপনাকে না জানিয়ে কিছু না দেন। আর দ্বিতীয়, যদি টাকা দেন, তবে নাম সই করিয়ে একটা লেখা রাখেন।

শুকলাল বিত্তশালী। তাঁহার কাছে একজন ভক্ত ধার চাহিয়াছে। শ্রীম শুনিয়া চিন্তিত।

কলিকাতা
১৯শে মার্চ ১৯২৪ খ্রীঃ, বুধবার

নবম অধ্যায়

নিজ কানে শোনা, নিজ চোখে দেখা

১

মর্টনের চারতলার ছাদ। অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। সম্মুখে দুই দিকে বেঞ্চিতে সামনাসামনি ভক্তগণ বসা। এখন বড় অমূল্য, জগবন্ধু, সদানন্দ, লক্ষ্মণ ও শচীনন্দন প্রভৃতি রহিয়াছেন। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী মাধবানন্দ আসিয়াছেন। ইনি হিমালয়স্থিত মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষ। তিনি শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ে হাত দিলেন। শ্রীম বাধা দিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। শ্রীম কাহাকেও পায়ে হাত দিতে প্রায় দেন না, সাধুকে দেওয়া দূরের কথা। ভারতের জাগরণ ও স্বাধীনতার কথা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—ওরা (ইংরেজরা) এখনও পূর্বের ন্যায়ই terrorise (আতঙ্কিত) করতে চায়। কিন্তু তা তো আর চলছে না। এখনও বুঝতে পারে নাই। যখন বুঝতে পারবে তখন ফস্ করে হয়ে যাবে (স্বাধীন)। Spiritual force-এর (আধ্যাত্মিক শক্তির) কাছে কি material force (জড় শক্তি) দাঁড়াতে পারে?

শিখদের (নানকানা সাহেবের) জাটার মামলায় দেখছিলাম জজ বলছে, probably they used some fire arms (সম্ভবত তাহারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল)।

স্বামী মাধবানন্দ—জজের আসনে বসেছে কিনা, তাই মুরুব্বিয়ানা করছে।

এইবার ঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

মাধবানন্দ (শ্রীমর প্রতি)—ঠাকুর ক'বার তীর্থে যান? আপনি লিখেছেন দু'বার।

শ্রীম—হ্যাঁ, দু'বারই। একবার মথুরবাবুর সঙ্গে। আর একবার ওঁর ছেলেদের সঙ্গে। তখন কাশী পর্যন্ত রেল ছিল। রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে reference.(লেখালেখি) করে তারা যে 'ডেট' দেয়, আর যারা সঙ্গে গিছলো তাদেব দেওয়া 'ডেট' মিলিয়ে দেখলাম ঠিকই। আরও অনেক circumstantial evidence (পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য, ঘটনা) ছিল। আমরা যেতুম কিনা, জানবাজারে ও বারাকপুরে (রাণী রাসমণির বংশধরদের কাছে) এই সব সংবাদ সংগ্রহ করতে।

মাধবানন্দ—ঠাকুরের কথা শুনে তখনই লিখে ফেলতেন তো ?

শ্রীম—না, on the spot (সেই স্থানেই) লিখি নাই। সবই memory (স্মৃতি) থেকে লিখেছি বাড়ী এসে—কখন সারারাত জেগে। আমরা যা দিয়েছি তা অন্যের নিকট থেকে collection (সংগ্রহ) নয়। যা শুনেছি আমরা তাই লিখেছি। Historianদের (ঐতিহাসিকদের) মত collect (সংগ্রহ) করি নাই। অথবা antiquarianদের (পুরাতত্ত্ববিদের) মতও লেখা হয় নাই। সব নিজ কানে ঠাকুরের মুখ থেকে শোনা, নিজ চোখে দেখা।

মাধবানন্দ—এর মধ্যেই শত difference (মতভেদ) হতে লাগলো (ঠাকুরের জীবনী ও বাণী নিয়ে)।

শ্রীম—তা'তে আর আশ্চর্য কি! তা হয়। দেখুন না বাইবেল। চারটা গস্‌পেলের একটার সঙ্গে আর একটার মিল নাই। এতে আর তেমন কি আশ্চর্য আছে। আমরা কখনও একটা sitting (দিনের ঘটনা) সাত দিন ধরে লিখতুম, কার পর কি গান, সমাধি, এসব স্মরণ করে।

মাধবানন্দ—আমরা নামটা বদলিয়ে দি'। যেমন নরেন্দ্র আছে, convenience-এর (সুবিধার) জন্য স্বামীজী করে দি'।

শ্রীম—ছি, তা কি করতে আছে? তা'হলে faithfulness (বিশ্বস্ততা) রইল কোথায় ?

মাধবানন্দ—কালীপূজার দিন শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঠাকুর কা'কে সব নিবেদন করলেন ?

শ্রীম—নিজকেই নিজে নিবেদন করলেন।

মাধবানন্দ—ঠাকুরকে, কি মা-কালীকে?

শ্রীম—না। ঠাকুর নিজেকেই নিজে। সকলে যেই ফুল দিয়ে ঠাকুরকে পূজা করলেন, অমনি তিনি বরাভয়-মুদ্রা ধারণ করলেন। দুই হাতে বর আর অভয়, এই মুদ্রা (দুটি হাতে দেখাইয়া), এমন করে। তখন সকলের বুঝতে বাকী রইল না তিনি কে।

মাধবানন্দ—রামকৃষ্ণ নাম সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

শ্রীম—ঠাকুরের মুখে এ সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই। তবে এটা probable (সম্ভব) যে যখন familyর (পরিবারের) সকলের নামেই একটা 'রাম' আছে, তখন তা থেকেই 'রামকৃষ্ণ' হয়েছে। ওঁরা রামভক্ত কিনা। রঘুবীর গৃহদেবতা। গ্রামের লোক গদাই গদাই বলে ডাকতো। গদাধর নাম যে আছে তা'তো আমরা জানতুমই না। পরে জানা গেল। তোতাপুরী দেন নাই ঐ নাম, তার আসার পূর্ব থেকেই রামকৃষ্ণ নাম দলিলে রেজিস্ট্রী হয়েছে।*

মাধবানন্দ—কে একজন এসেছিলেন পূর্ণজ্ঞানী। তিনি কুকুরের মুখ থেকে কেড়ে খেতেন। তাঁর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত কে গিছলেন? হৃদয় কি হলধারী?

শ্রীম—হলধারী।

মাধবানন্দ—মেয়ের বাড়ী না গিয়ে বেলপাতা নিয়ে ফেরত এলেন বাড়ীতে। এখানে আপনি করেছেন হলধারীর বাপ, শরৎ মহারাজ করেছেন ঠাকুরের বাপ।

শ্রীম—আমরা ঐ রকম জানি।

মাধবানন্দ—একজন পণ্ডিতের কথায় অক্ষয় মাস্টারমশায় লিখেছেন, 'জুতো পায়ে দিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে এক খাটে গিয়ে বসলো।' এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীম—না, আমরা তখন সেখানে ছিলাম। পণ্ডিত মেঝেতে বসা।

---

* Vide, Deed of Endowment by Rani Rashmani 1861, 18th February. এখানে ঠাকুরের নাম লেখা আছে 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য'। তোতাপুরী আসেন পরে, 1864-এ।

ঠাকুর তাঁর বুকে পা দিতেই, 'গুরো, চৈতন্যং দেহি'—এই কথা তার মুখ থেকে বেরুলো। লোকটি খুব ভক্তিমান।

কবিরা অনেক সময় ভাবেন, এব বুঝি কোন রেকর্ডস্ নেই। তাই একটা করে দিলে। কবি যে, ও করবে না তো কি? আমাদের লেখা collection (সংগ্রহ) নয়। ঠাকুরের লীলা যা দেখেছি নিজ চক্ষে, যা শুনেছি নিজ কানে তাঁব মুখ থেকে, তাই লিখেছি।

এতক্ষণে বড় জিতেন, ডাক্তাব বক্সী, বিনয়, ছোট জিতেন, বলাই প্রভৃতি আসিয়াছেন। মনোবঞ্জন, মুকুন্দ, মাখনও ক্ষণকাল মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মাধবানন্দ—আশ্বিনেব ঝড়েব অবস্থায় ঠাকুব কয় বছব ছিলেন?

শ্রীম—সাত বছর। ঠাকুব বলতেন, তখন ওবা আমায় ধরে নিয়ে গেল বিয়ে দিবে বলে।

মাধবানন্দ—ঠাকুর বঙ্কিমবাবুর কাছে কা'কে পাঠিয়েছিলেন?

শ্রীম—গিবীশবাবু আর আমাদেব পাঠিয়েছিলেন এই বলে, 'যাও, বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ করে এসো।' ঠাকুবকে যেতে নেমন্তন্ন কবেছিলেন। কিন্তু ঠাকুব যেতে পাবেন নি।

মাধবানন্দ—কৃষ্ণদাস পাল ঠাকুরের কাছে গিছলেন?

শ্রীম—হাঁ। ঠাকুর কৃষ্ণদাস পালের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'কিন্তু খুব হিন্দু, জুতা খুলে ঘবে এলো' ঠাকুরের ঘরে। আর বলেছিলেন, 'তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি? সে বললে, জগতের উপকার করা! আমি বললাম, তুমি জগৎ দেখছ? বর্ষাকালে গঙ্গায় কেঁকড়ার ডিম দেখেছ? যত ডিম তত জগৎ—অনন্ত। তুমি তার উপকার করবার কে? তুমি তোমার নিজের উপকার কর। সব জীবরূপে তিনি। বহুরূপে তাঁর সেবা করে তুমি নিজে ধন্য হয়ে যাও। যাঁর জগৎ তিনি দেখবেন এসব। তুমি তোমার নিজের পথ দেখ।'

মাধবানন্দ—কেশব সেন মশায়ের সঙ্গে দেখা হয় কখন?

শ্রীম—এইটিন্ সেভেনটি ফাইভে (1875 A.D.)।*

মাধবানন্দ—নিরঞ্জন মহারাজ কখন আসেন?

শ্রীম—ভক্তের মত আসেন অনেক পরে, আমাদেরও পরে। নিরঞ্জন আগে একবার গিছলো দক্ষিণেশ্বর একটা পার্টির সঙ্গে 'স্পিরিচুয়েলিজম্' দেখতে। ঠাকুর তখনই তাকে single out (চিহ্নিত) করেন। ঠাকুরের কাছে আসবে বলে গিছলো, কিন্তু আসে নাই। তাই পরে যখন এলো—অনেক পরে, তখন বলেছিলেন, 'আচ্ছা তুই তো আসবি বলেছিলি। এলি না কেন? একটুও মিথ্যে কথা বলবি না।'

মাধবানন্দ—ফিফথ্ পার্ট বের করবেন নাকি? ওতে ওটা দিলে বেশ হয়, বঙ্কিমবাবুর সিন্‌টা।

শ্রীম—ইচ্ছা আছে। 'বসুমতী'র ওরা লোক পাঠিয়েছিল। ওরা বের করবে।

(সহাস্যে) অধর সেনের বাড়ীতে বঙ্কিমবাবু গেছেন। ঠাকুরও সেদিন সেখানে। ঠাকুর আসবেন বলেই অধরবাবু বঙ্কিমবাবুকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথা হয়েছিল। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি তো ভারী ছ্যাঁচড়া হে। নিজে যা নিয়ে আছ লোককে তো তাই করতে বলছ। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কিনা বলছ—নাম, যশ অর্থোপার্জন আর সন্তান উৎপাদন।'

অধরবাবু আর বঙ্কিমবাবু ইংরেজীতে কথা কইছেন। ঠাকুর রসিক পুরুষ। শুনে হেসে বললেন—'শোন, নাপিত বলেছিল, ড্যাম্ (damn) যদি ভাল হয়, তবে আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। খারাপ হলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাপ ড্যাম্। তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম্। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাডাম্ ড্যাম্ ড্যাম্।' (সকলের উচ্চহাস্য)।

একটা নাপিত এক বাবুকে কামাচ্ছিল। একটু লেগে যেতেই

---

* ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব সেনকে প্রথম দেখেন নৈনালের বাগানে। দয়ানন্দ সরস্বতী গিয়াছিলেন ওখানে। বিশেষভাবে পরিচয় হয় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়ার বাগানে।

বলে উঠলো বাবু, 'ড্যাম্'। ইংরেজী শব্দ, নাপিত তার মানে জানে না। তাই রেগে ঐ কথা বললো (হাস্য)।

বিদায় নেবার সময় বঙ্কিমবাবু ঠাকুরকে নেমন্তন্ন করলেন, 'বলুন, কবে পায়ের ধূলো দিবেন। ওখানেও ভক্ত আছে।' শুনে ঠাকুর বললেন, 'কেমন ভক্ত গা? যারা 'কেশব কেশব' করছিল সেরূপ ভক্ত তো নয়?' বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি রকম মশায়?' ঠাকুর বললেন, 'একটা স্যাকরার দোকান ছিল। একজন বাবু গেছে অলংকার গড়াবে বলে। সে শুনছে, দোকানের এক ব্যক্তি জপ করছে, 'কেশব কেশব'। হাতে তার মালা। আর একজন বল্‌ছে, 'গোপাল গোপাল'। আব একজন বলছে 'হরি হরি'। আর একজন বলছি, 'হর হর।' সকলেরই হাতে মালা, কপালে তিলক।

'কেশব কেশব' মানে, এইসব লোক কে? 'গোপাল' মানে, গরুর পাল, অর্থাৎ নির্বোধ। 'হরি হরি' মানে ও, হরণ করি তা'হলে? 'হর হর' মানে, হরণ কর (সকলের উচ্চহাস্য)।

বড় জিতেন—বঙ্কিমবাবু রসিক পুরুষ ছিলেন।

শ্রীম—হাঁ। রস টিকলো না। রস করতে গিছলেন। ঠাকুর রস ভেঙ্গে দিলেন।

বড় জিতেন—ঠাকুরের life (জীবনী গ্রন্থ) লিখছেন বুঝি এঁরা? কিন্তু—

শ্রীম (বাধা দিয়া উত্তেজিত ভাবে)—এঁরা লিখবেন না তো কে লিখবে? কত তপস্যা করেছেন এঁরা! বড় জিনিসের সঙ্গে অনেক কাল ঘর করেছেন। হিমালয়ে থাকেন কিনা!

আমরা দার্জিলিং থেকে এলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, উদ্দীপন হয়েছিল তো? আমরা তখন জানতাম না—'স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ'। পর্বতের মধ্যে হিমালয় ভগবানের রূপ। ঠাকুর বলেছিলেন, লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল। শিলিগুড়ির ওখানে গাড়ী উপরে উঠছিল। সামনে হিমালয় দেখে আমার চক্ষে জল এলো। ঠাকুর জানতে পেরেছিলেন। এঁরা সেই হিমালয়ে বাস করেন।

শ্রীম—মায়াবতীর আশ্রম থেকে বেশ কাজ হচ্ছে। অনেকগুলি বই বেরিয়েছে। এসব নিষ্কাম কর্ম। নিজের benifitএর (লাভের) জন্য নয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কর্ম না করে মানুষ থাকতে পারে? সঞ্জয় গেলেন বিরাট রাজার বাড়ীতে। পাণ্ডবরা ওখানে রয়েছেন বনবাসের সময়। সঞ্জয় পাণ্ডবদের বললেন, 'তোমরা বেশ আছ! বনে বনে ঘুরবে আর তাঁর নাম করবে।' শ্রীকৃষ্ণ শুনে মুখের উপরই শুনিয়ে দিলেন। বললেন, 'বাঃ, তুমি তো বেশ লোক। এখন ধর্ম শিখাতে এসেছ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তোমার ধর্মোপদেশ কোথায় ছিল? তুমি তো তখন ঐ সভাতেই ছিলে না? তাদের (পাণ্ডবদের) কত কর্ম বাকী রয়েছে। বললেই হলো, বনে বনে ঘুরে তাঁর নাম করবে!' দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—রাজ্যশাসন, কত কি তাদের করতে হবে। একেবারে উড়িয়ে দিলেন সঞ্জয়কে। কর্ম না করে মানুষ পারে না।

তবে কি কর্ম করবে? গুরু যা বলেছেন সেই কর্ম করা। যা তা কর্ম নয়। যদি কোন সিদ্ধগুরু থাকেন, যাঁর শরীর আছে, তিনি যে কর্ম করতে বলেন, সেই কর্ম করা। ঠাকুর একটি ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন এই কথা।

গীতায় আছে, কর্মকে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মকে যে অকর্ম জেনেছে, আর অকর্মকে—মনে কর্মের বাসনা আছে, বাইরে করছে না—কর্ম বলে জেনেছে, সেই ব্যক্তি কর্মের রহস্য জানে। সেই ঠিক ঠিক কর্ম করতে পারে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি)—সীতাপতির খুব memory (স্মৃতিশক্তি) আছে। কখন কি হয়েছে সব বলতে পারে। জিতেনটিও বেশ। ওরা মিহিজামে গিছলো।

স্বামী মাধবানন্দ মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—খুব মহৎ লোক এই সব সাধু।

ডাক্তার—খুব meritorious (গুণবান)।

শ্রীম—এখানে কিন্তু merit-এর (গুণের) কোন question (প্রশ্ন) আসছে না।—সব মায়ের ইচ্ছা। তিনিই ইচ্ছা করেছেন লোকশিক্ষা দেওয়াবেন এই এঁদের দ্বারা। তাই তিনি এই সব সাধু করেছেন।

বিড়াল যখন ইঁদুর ধরে তখন এক রকম করে ধরে। আবার যখন নিজের বাচ্চাকে ধরে তখন আর এক রকম। এতে মেরিট-ফেরিট (গুণগরিমা) খাটে না। তাঁর ইচ্ছা হলে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ভাঙ্গা পড়ো বাড়ীতে মহাযজ্ঞ হয়।

এমন অনেকে মঠে এসেছে তাদের antecedents (পূর্ব-জীবনে) তেমন বেশী কিছু নাই। হয়তো কেউ 'মাইনর' পর্যন্ত পড়েছে। আবার কেউ হয়তো বাপে-তাড়ান বকাটে ছেলে। মঠে এসে সেই ছেলে highest idealএর (সর্বোচ্চ আদর্শের) সঙ্গে contact (সংযোগ) হওয়ায় একেবারে changed man (নূতন মানুষ) হয়ে গেছে—এই দু'তিন বছরের মধ্যে।

শ্রীম (সহাস্যে)—তখন সবে দু' এক মাস হয়েছে ঠাকুরের দেহ গেছে। একজন ব্রাহ্ম বন্ধু আমাদের বলছেন, 'ওহে, তোমার কাছে নাকি পরমহংস মশায়ের কথা লেখা আছে। দিও দিকিন্ একবার আমায়। দিন পনের ছুটি আছে একটা কিছু লিখি (হাস্য)। এই রকম আছে বই-লেখা।

দেশ যত উপরে উঠবে তত ঠাকুরের ভাব ছড়াবে। এখন উঠছে, ক্রমে zenithএ (উচ্চ শিখরে) উঠবে।

বড় জিতেন—আবার পতন হবে।

শ্রীম—হাঁ। গ্লানি তো অবশ্যম্ভাবী। তিনি মাছের তেলে মাছ ভাজেন। কিন্তু ঢেউ এখন উঠছে। একেবারে উপরে উঠবে।

এখন বড্ড opportune moment (সুবর্ণ সুযোগ)। ঠাকুরের ভাব পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। তখনকার ভক্তরা সব আছেন। ঠাকুর বলতেন, অবতার এলে ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল। অন্য সময় জল কোথায় চলে যায় দূরে, অতি দূরে। এখন হাতের গোড়ায় জল

বলেছিলেন, গঙ্গায় জোয়ার এলে খাল বিল সব ভরে যায়। সব জলে জলময়। সর্বত্র জল।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
২০শে মার্চ, ১৯২৪ খ্রীঃ
৬ই চৈত্র ১৩৩০ সাল, বৃহস্পতিবার

দশম অধ্যায়

আম খেতে এসেছ আম খাও

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। জগবন্ধু ও গদাধর বসিয়া আছেন। শ্রীম আসিয়া চেয়ারে বসিলেন উত্তরাস্য। দেখিতে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন বড় জিতেন। তাঁহার পরনে আফিসের পোশাক আচকান। উনি ওকালতি পাশ, হাইকোর্টের বেঞ্চক্লার্ক। শ্রীমর রিপন কলেজের ছাত্র, খুবই ভক্ত। বয়স পঞ্চাশ, প্রায় স্থূলকায়। সঙ্গে একজন যুবক উকীল। বয়স পঁয়ত্রিশ। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। উভয়ে যুক্ত করে প্রণাম করিয়া শ্রীমর বাঁ দিকের বেঞ্চিতে বসিয়াছেন পূর্বাস্য। পরিচয় দিতেছেন বড় জিতেন, সঙ্গী বন্ধুর।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—পড়াশোনা খুব আছে, কিন্তু destructive (ধ্বংসাত্মক)। আবার ওকালতি করতে হয়। রোজ আসবে আসবে বলে। আজ ধরে বসেছে না এসে ছাড়বে না। এর নাম পঞ্চানন ঘোষ, বাড়ী রাণাঘাট।

পঞ্চানন—পড়াশোনা থাকলে কি হয়, কাজে না করতে পারলে।

শ্রীম—না। কাজে তাঁর ইচ্ছা হলে তিনিই করিয়ে নেবেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তরা যে তাঁর কাছে যেতো, তারা কি আর ইচ্ছা করে যেতো, না তিনি টেনে নিতেন? ঠাকুর বলেছিলেন, যারা

আন্তরিক ঈশ্বরকে চায় তারা এখানে আসবেই। দূর বনে ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনিই একবার এদিক, একবার ওদিক ঘুরে ওখানে আসবে—invite (নেমন্তন্ন) করতে হয় না, advertise (বিজ্ঞাপিত) করতে হয় না।

অনেক কাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল কিনা তাদের জন্য। তারা কিনা মৌমাছির জাত!

আবার তিন রকম বৈদ্য আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। ঠাকুর ছিলেন উত্তম বৈদ্য। উত্তম বৈদ্য জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়। তখন appetite (ক্ষুধা, রুচি) না থাকলেও appetite (রুচি) বাড়িয়ে দিতে পারে।

আজ ২০শে মে, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ৪৬।২৭ পল।

বড় জিতেন বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। কাপড় ছাড়িয়া পুনরায় আসিবেন। শ্রীমও উঠিয়া হাতমুখ ধুইতে তিনতলায় নামিলেন। আর জগবন্ধুর দেওয়া ধুতি পরিয়া পঞ্চানন কোটপ্যাণ্ট ছাড়িয়া একতলার কলে হাতমুখ ধুইতে গিয়াছেন। ইতিমধ্যে বড় জিতেন বাড়ী হইতে খাবার পাঠাইয়াছেন। পঞ্চানন ছাদে বসিয়া ঐ খাবার খাইলেন। তারপর দক্ষিণ দিকের বেঞ্চিতে শুইয়া 'মাসিক বসুমতী' পড়িতেছেন। এ-মাসে ইহাতে নূতন কথামৃত বাহির হইয়াছে—'শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সংবাদ'।

কিছুক্ষণ পর শ্রীম আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা হইতে একজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম উঠিয়া গিয়া ঐ ভক্তের সঙ্গে উত্তর দিকের ছাদে 'তপোবনে' চলিতে চলিতে কথা কহিতেছেন। একটু পর পঞ্চাননকে ডাকিয়া লইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৈতৃক সম্পত্তিতে সংসার চলে কিনা। ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িলেন স্বামী নির্বেদানন্দ ও প্রীতি মহারাজ। ইঁহারা স্টুডেন্টস্ হোমের সেবক। শুকলাল আসিলেন বেলেঘাটা হইতে। তারপর পুনরায় আসিলেন বড় জিতেন বাড়ী হইতে কাপড় ছাড়িয়া। এইবার নিত্যকার

ভক্তগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—ডাক্তার বক্সী, বলাই, মোটা সুধীর, ছোট জিতেন প্রভৃতি। এইবার আসিলেন একজন সঙ্গীসহ মাখন হোড়। আর আসিলেন দীনেশ—সঙ্গে দুইজন সঙ্গী। এর মধ্যে একজন ডাক্তার।

শ্রীম সকলকে লইয়া মধ্য ছাদে বসিয়াছেন। ইনি চেয়ারে বসা উত্তরাস্য, আর সব শ্রীমর সামনে তিন দিকে বেঞ্চিতে বসিয়াছেন। পুনরায় কথা চলিতেছে।

শ্রীম (স্বামী নির্বেদানন্দের প্রতি, উদ্দেশ্য পঞ্চানন)—আজকাল লেখাপড়া যা হচ্ছে সে হচ্ছে অর্থকরী বিদ্যা—ওকালতী, ডাক্তারী, এইসব। ঠাকুর ডাক্তারের কিছু খেতে পারতেন না। বলতেন, 'এরা বড় নিষ্ঠুর। এদের টাকা রক্ত পূঁজের টাকা।' উকীলরা মিথ্যা কথা কয়ে অর্থোপার্জন করে বলে তাদেরও কিছু স্পর্শ করতে পারতেন না। ইন্‌জিনিয়ারদেরও ঐ।

ঈশান মুখুয্যের ছেলে শ্রীশ আমাদের সঙ্গে পড়তো। শেষে ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছিল। প্রথমে আলিপুর বেরোতো। অমন শান্ত লোক আর আমি দেখি নাই। ঠাকুর ওদের বাড়ীতে গেলে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিছলাম। ঠাকুরও দেখে বলেছিলেন, 'অমন শান্ত লোক ওকালতী করে কি করে!' অবশ্য বেশী দিন তা করতে হয় নাই। কিছু দিনের মধ্যেই মুন্সেফ হয়ে গেল। ঠাকুরের সঙ্গে তার অনেক কথা হয়েছিল। কৃপা হয়েছিল তার উপর।

শুকলাল—একজন ঈশান স্কলার মঠে সাধু হয়েছেন। আমার সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছে।

একজন ভক্ত—নাম ধীরেন। সীতাপতি মহারাজও ঈশান স্কলার।

শ্রীম—অনেকদিন আগে শুনেছিলাম, নর্দামার জল গঙ্গায় পড়লে গঙ্গাজল হয়ে যায়। (একজন ভক্তের প্রতি) কি আছে উপনিষদে?

একজন ভক্ত—যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ (কঠ)।

শ্রীম—তেমনি এরা এদিক ছেড়ে ওদিকে গিয়ে পড়েছে। সব গঙ্গা, সব সাগর হয়ে গেছে। এতে আর আশ্চর্য কি! ঈশ্বরকে জানলে এই দুর্বল মানুষই সবল হয়—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' যারা জানবার চেষ্টা করছে—যেমন সাধুরা, তারাও প্রায় তাই হয়ে যায়।

ঠাকুর আসাতে কত সব great men (মহাত্মা) দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমে সাধুমাত্রকেই মহাত্মা বলে। সংসারী লোকেরা কিন্তু যাদের টাকাকড়ি, বিদ্যা-টিদ্যা আছে, তাদের বলে great men (বড় লোক)।

সংসারী লোকের আদর্শই এই টাকাকড়ি, লোকমান্য এই সব। ঠাকুর কিন্তু বলেছিলেন, 'ঝ্যাঁটা মারি লোকমান্যে।' কত জোর দিয়ে বলতেন।

টাকাকড়ির কথায়ও তাই—ছুঁতে পারতেন না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো। ঠাকুর বলেছিলেন, একজন মাড়োয়ারী (লক্ষ্মীনারায়ণ) ছেঁড়া ময়লা বিছানার চাদর দেখে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল—হাজার দশেক টাকা। বলেছিলেন, শুনেই একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। মনে হচ্ছিল যেন কুড়াল দিয়ে আমার মাথা কাটছে। জ্ঞান হলে বললুম, মা, তোমার কি ইচ্ছা শেষকালে আমায় এই সব দিয়ে আটকে রাখা? ভক্ত বললে, আচ্ছা, তা' হলে ওনার (শ্রীমার) কাছে থাকুক। মা বললেন, না তা হবে না। আমি রাখলে তাঁরই রাখা হল। তখন বলে, আচ্ছা হৃদয়ের কাছে থাকবে। ঠাকুর তা'তেও রাজী হলেন না। বললেন, তা' হলে হ্যাঙ্গাম। অন্যায় কাজে খরচ করতে গেলে বাধা দিতে হবে। আবার ন্যায় খরচ না করলে তা করতে বলতে হবে। তবুও পীড়াপীড়ি করলে, তখন ধমক দিয়ে বললেন—বাবা, তুমি যদি এই কর তবে এখানে আর আসতে দেওয়া হবে না। তখন থামে। এমনি কাণ্ড!

আর মেয়েমানুষ! তাদের সম্বন্ধেও ঐ। একেবারে নির্জলা একাদশী। একবার রথযাত্রার সময় বলরামবাবুর বাড়ী এসেছিলেন।

যাবার সময় অনেকগুলি ভক্ত মহিলা নৌকো করে পেছু পেছু দক্ষিণেশ্বর গেল। মা-ঠাকরুন তখন ওখানে। ভক্ত মেয়েরা সব ন'বতে মায়ের কাছে গিয়ে উঠল। তারপর ঠাকুরের ঘরে গিয়ে এক এক করে প্রণাম করছে। ঠাকুরের এসব মোটেই ভাল লাগছিল না। তাই একটি ভক্ত প্রণাম করতেই তাকে বললেন, এরা সব কিলবিল করে আসছে আর ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করছে, এসব আমার ভাল লাগছে না। এই ভক্ত মহিলাটি গিয়ে বলতেই ওরা সব দৌড়ে পালাল।

আবার বলেছিলেন, সন্ন্যাসীদের স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখতে নেই—হাজার ভক্ত হলেও।

শ্রীম কিছুকাল মৌন রহিলেন। তারপর পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (পঞ্চাননের প্রতি)—আমরা সেদিন বুদ্ধবিহারে গিছলাম। ইনিও (স্বামী নির্বেদানন্দ) গিছলেন। সেই দিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা—anniversaryর (বাৎসরিক উৎসবের) দিন। বেশ সাজিয়েছিল—কি সুন্দর ছবি সব! আপনারা বুঝি যান নাই? শুনেছি, সেখানে relics (দেহাবশেষ) রয়েছে। এইটে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া চেয়ে পাঠিয়েছিলেন বার্মার রাজার কাছে।

বোধিদ্রুমের নীচে দাঁড়িয়ে প্রেমে-গদ্‌গদ বুদ্ধদেবের এই একখানা ছবি আছে। আর একখানা—পালিয়ে যাচ্ছেন ঘোড়ায় চড়ে সংসার ছেড়ে—the great renunciation (মহাসন্ন্যাস)।

২

দীনেশ ও সঙ্গীরা সকলের শেষে আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—বুদ্ধদেবের কথা আমরা বলছিলাম। পূর্ণিমার দিন আমরা গিছলাম বুদ্ধবিহারে। কি সুন্দর সব ছবি আছে! ওরা বলে কিনা, বুদ্ধদেব নাস্তিক। তাই শুনে ঠাকুর বললেন, 'না, উনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। আবার ঈশ্বরদর্শন হয়েছিল!' এ কথার উপর তো

আমাদের বিচার চলে না। তাই বুঝি দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধদেবকে হিন্দুরা এক অবতার বলে পুজো করে। বিবেকানন্দ গিছলেন বুদ্ধগয়াতে। ফিরে এলে ঐ কথা বলেছিলেন ঠাকুর। বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবকে খুব মান্য করতেন—বিশেষ করে ঐ দু'টোর জন্য—অহিংসা আর সেবা। গান্ধী মহারাজও আজ, কি কালের কাগজে বলেছেন—বুদ্ধদেবের truth (সত্য) ও love (ভালবাসা)-এর কথা। Truth (সত্য) মানে, সেই Absolute (অখণ্ড সচ্চিদানন্দ)। তাঁর দর্শন হলে তবে love (প্রেম) হয়।

দাশ—একপাল ছাগল বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। বুদ্ধদেব রাজার কাছে গিয়ে বললেন—আমায় বলি দাও, এদের ছেড়ে দাও।

দীনেশের সঙ্গী ডাক্তার (শ্রীমর প্রতি)—আপনারা সকলেই ঠাকুরকে কতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছেন—মৃত্যুর পর কি হয়, এইসব কথা।

শ্রীম (গম্ভীরভাবে)—তিনি হলেন অনন্ত সাগর। আমরা যা বলছি এক কণা তার!

হাঁ, তিনি বলেছেন তো এ কথা বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে কুমোরের হাঁড়ীর সঙ্গে তুলনা করে। বলেছিলেন, যতক্ষণ হাঁড়া কাঁচা থাকে ততক্ষণ কুমোর তাকে চাকে দেয়। আগুনে পেকে গেলে তা দিয়ে আর কাজ হয় না। যতদিন না ঈশ্বরদর্শন হয় ততদিন জন্ম-মরণ চলবে। এই প্রবাহ বন্ধ হয় কেবল তাঁর কৃপায় তাঁর দর্শন হলে।

আরও বলেছেন, 'তোমার অত শত কথায় কাজ কি। আম খেতে এসেছ আম খাও।' কি করে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, কি করে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিলাভ হয় তা কর। তোমার অত-শতর দরকার কি।'

সঙ্গী ডাক্তার—আমাদের মনে এই সব কথা ওঠে কিনা।

শ্রীম—তাই বলতেন, শুনেছি এই এই হয়। 'শুনেছি' বলতেন। 'শুনেছি' মানে, of secondary importance (অল্প মূল্যবান) পাছে ঐতে ঝুঁকে পড়ে তার জন্যই বলতেন, 'শুনেছি।'

সঙ্গী ডাক্তার—আপনার বইটা (কথামৃত) যদি আবার systematically arranged (ধারাবাহিকরূপে পুনরায় সুলিখিত) হয়, আর যা repetitions (পুনরুক্তি) আছে সেগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়, তা'হলে বেশ হয়।

শ্রীম—Repetitions (পুনরুক্তি) ছাড়বার যো আছে? একটা কথাই হয়তো পাঁচ জায়গায় বলেছেন। ছেড়ে দিলে কথাটার link (সম্বন্ধ) ভেঙ্গে যায়।

আর, একই কথা পাঁচ জনকে বলেছেন পাঁচ জায়গায়। তা'তে কার উপর কিরূপ act (কাজ) করেছে তা বোঝা যায়। বঙ্কিমকে যা বলেছেন, অনেককেই তা বলেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছে, অন্যদের সঙ্গেও তা হয়েছে।

ফিল্ডে briliance (উজ্জ্বলতা) বাড়ায় কিনা ডায়মণ্ডের! সেটিং-এর জন্য ডায়মণ্ডের সৌন্দর্যের কমতি-বৃদ্ধি হয়। কাঠের উপর রাখ, এক রকম দেখাবে। ভেলভেটের উপর রাখ, তখন সৌন্দর্যের পূর্ণতা লাভ হবে। যেমন সূর্যের কিরণ জলে পড়লে এক রকম হয়, মাটিতে পড়লে আর এক রকম। কাঁচের উপর পড়লে উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি হয় সব চাইতে বেশী। Repetition (পুনরুক্তি) ছাড়বার যো নাই।

হৃদয় মুখুয্যে বলেছিলেন, মামা, তুমি গোটাকয়েক বাছা বাছা কথা রেখে দাও। সব বলে ফেললে, আর বার বার এক কথা বললে বেশী লোক আসবে না। শুনে ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তবে রে শালা, আমার কথা আমি পঞ্চাশ বার বলবো। তা'তে তোর কি?'

দেখ না, বিদ্যেসাগর মশায়ের সঙ্গে যা সব কথা হয়েছে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। বড় লোকের সঙ্গে কি কথা হয়েছে তা শুনবার জন্য লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

আমাদের বুদ্ধিতে তাঁকে কি বুঝবো! একসের-ঘটিতে কি দশ সের দুধ ধরে? তাঁর কার্য কেউ বুঝতে পারে না। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে একেবারে 'বেপথু'। মানে, কাঁপতে লাগলো। অত বড়

অধিকারী—তাঁরই এ অবস্থা, অপরের কথা কি। ভগবানের কার্য মানুষ বুঝতে পারে না। তিনি যাকে যতটা বোঝান সে ততটা বোঝে।

নবাগত ভক্তগণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর মাখনকে বলিলেন, গান না একটি গান। মাখন গাহিতেছেন—

গান। মজলো আমার মন ভ্রমরা, শ্যামাপদ নীল কমলে,
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হলো কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কাল ভ্রমর কাল কালোয় কাল মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধানমত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে!
কমলাকান্তেরি মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
(তার) সুখ দুখ সমান হলো আনন্দসাগর উথলে।

গান। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ হিল্লোলে
চিরশান্তি-পরিমল অবিরত যায় ভাসি॥
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি॥
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥

এইবার স্বামী নির্বেদানন্দ গাহিতেছেন শ্রীমর অনুরোধে।

গান। অরূপ সায়রে লীলালহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায়।
আদি অন্তহীন অখণ্ডে বিলীন, মায়ায় ধরিলে মানবকায়;
মনের ওপারে কোথা কোন দেশ, শশী তপনের নাহি পরবেশ,
তব হাসিরাশি কিরণ বরষি উজলে সেথাও চারু বিভায়॥
প্রেমের এ তনু অতনু গঞ্জন কি মধুর বিভা বিকাশে নয়ন,
যে হেরে সে জন তনুপ্রাণমন চরণে অর্পণ করিতে চায়॥
তোমারি আশায় কত যুগ গত, সংশয় যত আজি তিরোহিত,
যা আছে আমার লহ উপহার সঁপিনু জীবন তব সেবায়॥

সুরলহরী শ্রীমর মনকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গিয়াছে। শ্রীম কিছুকাল নীরবে দিব্যানন্দ উপভোগে মগ্ন। কিছুকাল পর ঐ উপলব্ধ ব্রহ্মানন্দ সাধুভক্তগণকে বিতরণ করিতেছেন অতি প্রেমে।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি)—অনেকে ভাবে, আমাদের সব হয়ে গেছে একটু পেয়েই। তাদের আধার ছোট। যাদের objective (উদ্দেশ্য) খুব বড়, তাদের সহজে ভরে না। ঈশ্বর কি এইটুকু, যে সব বুঝে ফেলবে। ঈশ্বরকে ডাকতে হয় নির্জনে গোপনে। এ কি সাইনবোর্ড মেরে হয়, না trumpet (ঢাকঢোল) বাজিয়ে হয়।

একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, উপায় কি ? ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, 'কাঁদতে পার নির্জনে গোপনে—তা' হলে হয়।'

একবার তাঁর দর্শন হলে জগৎ ভুলে যায়। তখন আনন্দে পূর্ণ হয় মনপ্রাণ—একেবারে পরিপূর্ণানন্দ।

তার জন্য সাধনেব দরকার, একেবারে সর্বস্ব ছেড়ে সাধন চাই। এটাও করছি, ওটাও করছি, করলে হয় না। তাঁকে চাই—এই বলে শরীর মন প্রাণ সব তাঁ'তে মগ্ন করতে হয়। যায় যাক্ শরীর—কিন্তু তাঁর দর্শন বিনা আর বেঁচে থাকবো না—এমনি ব্যাকুলতা হলে তিনি কৃপা করে দর্শন দেন। ঢিমে তেতালার কাজ নয়, একেবারে উন্মত্ত হতে হয়। আহার নিদ্রা ছেড়ে লাগতে হয়। বলতে হয়, কাঁদতে হয়—বাপ, দেখা দাও—নইলে এ শরীর রাখবো না। তখন তাঁর কৃপা হতে পারে, আর দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন। তখন আনন্দ, কেবল আনন্দ, সর্বাবস্থায় আনন্দ, সকল কাজে আনন্দ! ভিতরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। এটি হলেই মানুষ পরিপূর্ণ হয়।

কলিকাতা
২১শে মে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ,
বুধবার।

একাদশ অধ্যায়

তোমরা বুঝি জহুরী

১

মর্টন স্কুলের চারতলা। এখন সকাল আটটা। শ্রীম জগবন্ধুকে প্রিন্সিপাল এস. রায়ের বাড়ী যাইতে বলিলেন। আর বলিলেন, রায় মহাশয়কে এইরূপ বলবেন—তিনি (শ্রীম) আমায় পাঠিয়েছেন আপনার নিকট, এবং করজোড়ে এই প্রার্থনাটি জানিয়েছেন: এইচ. বোসের বাড়ীর ছেলেরা বন্দুক দিয়ে পাখী প্রায়ই মারে। পাখীরা এ বাড়ীর (মর্টন স্কুলের) ছাদে পড়ে ছট্‌ফট্ করে মরে যায়। কখনও ঔষধাদিও দিতে হয়। তা, আপনি যদি দয়া করে ওঁদের গিন্নীদের কাছে বলে আসেন, খুব ভাল হয়। এতে ভারি অনিষ্ট হচ্ছে। একে তো জীবহিংসা হচ্ছে, secondly (দ্বিতীয়ত) পাড়ার যতসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে এসব দেখে দেখে। এ দু'টো points (বিষয়ে) বলবেন।

আর ফেরবার সময় লালপেড়ে একজোড়া ধুতি আনলে হয়, আর একখানা চাদর বিছানাব।

অপরাহ্ণ ছয়টা। বেশ গরম পড়িয়াছে। শ্রীম ছাদে বসিয়াছেন, টিনের ঘরের পাশে, চেয়ারে উত্তরাস্য। সামনে বেঞ্চিতে বসা নফর বাঁড়ুয্যে মশায়ের নাতি। ইঁহারা ঠাকুরের দেশের লোক। তিনি অতি প্রেমভরে তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন—কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তারপর তাঁহারা মিষ্টিমুখ করিলেন। এইবার শ্রীম গান গাহিয়া তাঁহাদের আত্মিক ক্ষুধার বৃদ্ধি করিতেছেন।

গান। শ্রীগুরু কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে,
পার করেন দীনজনে অভয় চরণতরী দিয়ে। ইত্যাদি

গান। এস মা এস মা ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো।
হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো॥
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে,
(মম) হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ তাহাতে গো॥

গান। মন কি তত্ত্ব কর তারে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি জানতে পারে।
অগ্রে শশী বশীভূত কর শক্তিসারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বুঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥

গান। সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে। ইত্যাদি

এখন সাতটা। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। নবাগত ভক্তগণ শ্রীমর মুখে ভজন শুনিয়া ভক্তিরসে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট পূর্বাস্য—ধ্যানস্থ, ট্যাঙ্কের কাছে। পাশে উপবিষ্ট জগবন্ধু ও গদাধর, বেঞ্চিতে। শুকলাল, বিনয় ও 'ব্রুকবণ্ড' (যতীন) আসিয়া বেঞ্চিতে বসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীম উঠিয়া ছাদের উত্তর দিকে 'তপোবনে' পায়চারি করিতে লাগিলেন। গরম খুব বেশী। ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িলেন বড় জিতেন, মাখন ও তাঁহার সঙ্গী ছোট রমেশ, বলাই, ছোট জিতেন প্রভৃতি।

ভক্তরা সকলে মেঝেতে মাদুরে উপবিষ্ট। শ্রীম আসিয়া কিছুক্ষণ পর মাদুরে ভক্তসঙ্গে বসিলেন উত্তরাস্য। ঈশ্বরীয় কথা চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি আর করা যায়, মার মাই খাওয়া যাচ্ছে। আমরা মনে করি আমরাই সব করি। তা নয়, তিনি সব করেন। আমরা বসে মায়ের মাই খাচ্ছি সর্বদা।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। তা-বই উপায় নাই। ঈশ্বরদর্শন হলে তো সব হয়ে গেল। তা না হলে-ঐ—গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

দেখুন না, চন্দ্র সূর্য রোজ তাঁর কাজ করছে। আহা, সূর্যটি

সকালে দেখে অবাক হয়ে যাই। তিনি আমাদের জন্য রোজ ওটি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে জীবজগৎ। হে-হে, তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। দেহ ধারণ করা মানে কাজ করা। দেহ থাকলেই কাজও আছে।

বড় জিতেন—সাধুদের কাজই ঐ পরের জন্য কাজ করা।

শ্রীম—না, সূর্যের কথা বলছি।

বড় জিতেন—সূর্যও সাধু।

শ্রীম—হাঁ। সাধু কাজ করেন লোকের উপকারের জন্য। ঈশ্বর যদি সাধুদের দর্শন না দেন, তা লোকশিক্ষার জন্য। এক জন্মে দর্শন না হলে পরজন্মে হবে। না হয় তারও পরে হবে। 'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।' তিনি সাধুদের দিয়ে সাধন ভজন করিয়ে নেন। সাধুদের দেখে তবে লোক সাধন করবে।

ঠাকুর নিজের কথায় বলতেন, 'জড় সমাধিতে দেহ যেতে পারে। কিন্তু মা লোকশিক্ষার জন্য রেখেছেন।'

ঠাকুর আসাতে এ দেশে সাধু দেখা যাচ্ছে আজকাল। এ দেশে ছিল কোথায় সাধু? যত নেড়া-নেড়ির দল ছিল। তিনি আসাতে এখন এমন সব সাধু দেখা যাচ্ছে—যাঁরা highest ideal (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে) অর্থাৎ ঈশ্বরকে খুঁজছে।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি)—তিনি আমাদের জন্য কত করছেন, দেখুন না! মাঝে মাঝে সাধু পাঠিয়ে দিচ্ছেন দেখতে পাই। কেন? না, তা হলে আমাদের চৈতন্য হবে। সাধু দেখলে ধাত ঠিক থাকবে। বুঝতে পারা যায়, তাঁরা কি করছেন আর আমরা কি করছি। সাধুরা পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, ধনজন, মান, বিদ্যা, কুল, দেহসুখ—সব ছেড়েছেন ঈশ্বরের জন্য। আর আমরা এ সব নিয়ে কামড়ে পড়ে আছি। সাধুসঙ্গ না করলে, Mutual Admiration Society (স্তাবক সমিতি) তৈরী হয়। একজন বলছে, আপনি বড়; আর একজন জবাব দেয়—না না, আপনি বড়। এই সব হয়।

যারা highest idealএর (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের) সন্ধান পেয়েছে

তারা কি অন্য কিছু চায়? মৌমাছি মধুর কলসী discover (আবিষ্কার) করেছে। আর নড়ছে না কোথাও। ঐখানে পড়ে আছে।

বড় জিতেন—যারা ওখানে (মঠে) আসে তারা কি সকলেই highest ideal (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শকে) খুঁজছে?

শ্রীম—তাদের আশ্রম দেখতে হয়—কত বড় আশ্রম। চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গেরুয়া দেখে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন কেন? না, সন্ন্যাসের উদ্দীপন হয়েছে। সাধুরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যে দিকে তাকাও সবই শিক্ষা। উপরে, নীচে, আবার নিজের ভিতরে, সর্বত্রই শিক্ষা। শুক্র-শোণিতের মিশ্রণে কি কাণ্ডটি (দেহ) হয়েছে, একবার চেয়ে দেখুন না। এই শিক্ষা সাধুরাই নিতে পারেন, অন্যরা তত পারে না। অন্যদের receptivity (গ্রহণশক্তি) কোথায়? সাধুদের receptivity আর responsiveness (গ্রহণশক্তি আর ধারণাশক্তি) আছে। তাঁরা এখানে সেখানে ঘোরেন—সর্বত্র তাঁদের শিক্ষা। অন্যদের telegraphic installation (তারের সহায়তা গ্রহণ) করতে হয়। সাধুরা wirelessএ (বেতারে, নিজের মনেই) সংবাদ পান, অন্যদের installation (বাইরের সহায়তা) প্রভৃতি কাণ্ড করে, তবে তাদের সংবাদ আসবে। সাধুদের কিছুই করতে হয় না—এসব!

ঠাকুর বলেছিলেন, 'গাড়ী করে যাচ্ছি চিৎপুর দিয়ে, দুইজন মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। তা দেখলুম যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।' আহা, এ দৃষ্টি কার আছে? অন্যরা কি দেখবে এ দৃষ্টি দিয়ে?

ছোকরাদের দেখে কেন এত আনন্দ করতেন? না, তাদের আধার ভাল। তাদের ভিতর নারায়ণের বেশী প্রকাশ। তারা ভক্ত। কামিনী-কাঞ্চন তারা ঘাঁটে নাই।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—সাধু দর্শন করতে যেতে হয়-কথা কইতে নয়। তাঁদের দর্শনই জ্ঞান। মনে হয়, তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে ভগবানকে ধরেছেন, তাঁকে ডাকছেন দিনরাত। সাধুদের শত

দোষ থাকলেও ঠাকুর তাঁদের দোষ ধরতেন না। কেন? না তাঁরা ইচ্ছা করলেই former ground recover (নিজস্ব স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ) করতে পারেন। সংসারীদের তা হবার যো নাই। স্নেহ, মমতা দেহসুখে তারা বদ্ধ, তাদের মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে।

বড় জিতেন বলিলেন, Vantage groundএ (অনুকূল স্থানে) আছেন সাধুরা।

শ্রীম—হাঁ, তাঁরা vantage groundএ (অনুকূল স্থানে) আছেন। অন্যরা কি তা পারে? তারা কলঙ্কসাগরে ডুবে আছে। একটু শুনলো ঈশ্বরের কথা, তা'তে মনটা বেশ সরস হল। আবার ওর ভিতরে গিয়ে পড়লো, তখন যা তা। পঞ্চাশটা দড়িতে বাঁধা মন।

কখনও ঠাকুর বলতেন, 'মা একে টেনে নিয়েছেন।' অর্থাৎ এই যে questionable surroundings and environmentsএ (প্রতিকূল অবস্থা, আর অশোভন পারিপার্শ্বিকতায়) রয়েছে, তা থেকে তাকে টেনে নিয়েছেন—দূরে রেখেছেন। তাই কখনও-বলতেন, 'এর আর ভয় নাই। মা একে টেনে নিয়েছেন।'

দু'টি পথ—হয় সাধুসঙ্গ, নয়তো নিঃসঙ্গ—বুঝলে রমেশবাবু?

একজন জিজ্ঞাসা করলো ঠাকুরকে—উপায় কি? অমনি উত্তর দিলেন ঠাকুর, 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তরঙ্গের মধ্যে যেমন ভেলা, গুরুবাক্য তেমনি।'

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—তিনি ছোটর ছোট আবার বড়র বড়—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—গুরোর্গরীয়ান্। তিনি পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের শব্দ শুনতে পান। মানুষ কি পারে তা। কতটা জানে মানুষ? অমন অনেক জিনিস আছে তার কিছুই জানে না। কিন্তু ঈশ্বর সব জানেন। তাই তাঁর কাছে শক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়—'প্রভো, শক্তি দাও' বলে। Pray without ceasing—নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রার্থনা করতে হয়। নাই বা শব্দ হলো। মনে মনে প্রার্থনা করলে কি তিনি শুনতে পান না। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। তাই একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, 'আচ্ছা

মা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে। এখন আমি যদি মুখে না বলি, তা হলে কি আমার ক্ষিদে পায়নি মা?'

বড় জিতেন—ফড়র্ ফড়র্ করতে বারণ করেছেন তবুও করছি।

শ্রীম (রহস্যচ্ছলে মৃদু হাস্যে)—হে—। When the heart is full the mouth speaketh। (মুখ দিয়ে কথা বের হয় কখন? যখন হৃদয় পরিপূর্ণ)। এও আছে এক রকম। আবার এও আছে, কলসী যখন half (অর্ধ) পূর্ণ কি, partial (আংশিক) পূর্ণ থাকে তখন শব্দ হয়। যখন একেবারে পূর্ণ তখন শব্দ হয় না। লুচি যখন কাঁচা থাকে তখন গরম ঘিয়ে দিলে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ শব্দ হয়। পাকা হয়ে গেলে ঘিয়ে দাও আর শব্দ হবে না। সিদ্ধ হয়ে শব্দ আবার অসিদ্ধ হয়ে শব্দ। চুপ করে থাকাই ভাল।'

২

একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, 'শেষ কথা এই—মা, আর আমি তাঁর ছেলে।' এই-ই শেষ কথা। এটি একটি মহামন্ত্র। কেউ যদি এটি নিয়ে পড়ে থাকে সারা জীবন, তা হলে সিদ্ধ হয়ে যাবে।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর হঠাৎ ভাবোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন।

গান। অন্তরে জাগিছ গো মা, অন্তরযামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবসযামিনী॥
অধম সুতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি,
প্রেমে আহা একেবারে যেন পাগলিনী॥
কখনও আদর করি, কখনও সবলে ধরি,
পিয়াও অমৃত, শুনাও মধুর কাহিনী;
নিরবধি অবিচারে কত ভালবাস মোরে,
উদ্ধারিছ বারে বারে পতিতোদ্ধারিণী॥
বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মার
চলিব সুপথে সদা শুনি তাঁর

করি মাতৃস্তন্য পান, হব বীর বলবান,
আনন্দে গাহিব জয় ব্রহ্ম সনাতনী ॥

শ্রীম আবার নীরব কিছুকাল। পুনরায় কথাপ্রবাহ।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—মার মাই খাচ্ছি, এই শেষ কথা। আহার, বিহার, শয়ন, স্বপন সর্বদা—মার মাই খাচ্ছি। ব্রাহ্ম সমাজের ওরা বেদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাব নিয়ে অনেক গান রচনা করেছে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—একটা miracle (অলোকিক) কাণ্ড আছে পড়েন নাই? ছেলে কাঁদছে, মা এসে কষে এক চড় মারলে। ছেলে মরে পড়ে রইলো। রেঁধে বেড়ে আবার এলো। তখন একটু এমন (হাওয়া) করতেই বেঁচে উঠলো। তেমনি মৃত্যু। তিনিই টেনে নিয়ে যান, আবার জন্ম দেন।

কোথায় শ্বাস? 'নাভিতে'। এখন একটু দেরী আছে। এখন কোথায়? 'কণ্ঠে'। তবে আর বেশী দেরী নাই।

আমরা সব তাঁর হাতে পুতুল। শুক্র-শোণিত থেকে কি কাণ্ডটাই তিনি করেছেন। একেবারে আশ্চর্য।

মায়ের ন্যাতা-কাঁথার একটা হাঁড়ি আছে। সব এতে রেখেছেন গুটিয়ে। ন্যাতা-কাঁথা মানে হচ্ পচ্ (hotch potch)।

কে বলছে এ কথা? যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, যেমন ঠাকুর। তাঁদের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে এ কথা। এতে আর বিচার চলবে না। বিশ্বাস করতে হবে।

যাদের সংস্কার আছে তারাই ফস্ করে বিশ্বাস করে। অন্যরা সংশয়াপন্ন। 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'। সংশয়াত্মার নাশ হয়। যারা বিশ্বাস করে তাদেরই বলে ভক্ত।

কেমন বিশ্বাস? মা বলেছে, ও ঘরে জুজু আছে। তা ছেলে জেনে রেখেছে ও ঘরে জুজু। মা বলেছে, ও তোর দাদা। তাই সে জানে। তাকে দাদা বলে, ষোল আনা একেবারে। ও হয়তো ছুতোরের ছেলে আর এ বামুনের ছেলে। এক পাতে বসে ভাত খাচ্ছে।

গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কি বিশ্বাস! তিনি দেখেই হাঁটু গেড়ে ব'লছিলেন, 'তুমি কেগো'? অর্থাৎ তুমিই সেই ঈশ্বর। ঠাকুর যতই বলছেন, তোমার সংস্কার আছে। গিরিশবাবু ততই উত্তর করছেন—না মশায়, না মশায়। ঠাকুরও ছাড়বেন না। বলছেন—না, তুমি জান না। তোমার নিশ্চয় সংস্কার আছে।

গিরিশবাবুর এই ভাব ছিল কিনা—যদি ঈশ্বর এসে নিজে শিষ্য করেন তবেই শিষ্য হবো, মন্ত্র নেব। তিনি আগে অনেক তপস্যা করেছিলেন। আমরা তখনও তাঁকে দেখি নাই। হবিষ্য করতেন। বেলা তিনটার সময় খেতেন গঙ্গাস্নান করে। এক বেলাই খেতেন। খালি পা, আর মাথায় ঝাঁকড়াঝাঁকড়া চুল। সারা দিন শিবনাম জপ করতেন।

কত সব বই লিখেছেন—রামচরিত, বুদ্ধচরিত, শঙ্করচরিত। তারপর লেখেন চৈতন্যচরিত।

এইটিন-এইটিফোরের সেপ্টেম্বরে (September, 1884) 'চৈতন্যলীলা' দেখতে যান ঠাকুর আমার সঙ্গে। বক্সে আমাদের বসিয়েছিলেন। বড় একটা তালপাতার পাখাতে হাওয়া করছে একজন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, কত নেবে এখানে? আমরা বললাম কিছুই নেবেন না। আপনি আসতে এঁদের খুব আহ্লাদ হয়েছে। ঠাকুর আনন্দে বললেন—দেখছ, আমি মার নাম করি বলে এরা এসব করছে। নিজে কোনও credit (বাহবা) নেবেন না। সবই মা করছেন।

শ্রীম অন্তর্মুখ কিছুকাল থাকিয়া পুনরায় কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (স্বগত)—আহা, ঠাকুর যতই বলছেন 'তোমার সংস্কার আছে' তিনি ততই 'না না' করছেন। বলছেন, কবিরা যেমন লেখে তেমনি আমি লিখেছি। (ভক্তদের প্রতি) ঠাকুরও নাছোড়বান্দা, বলছেন, না গো, তা নয়। তিনি তো মানুষের সব জানেন—পূর্বজন্ম, পরজন্ম। তিনি দেখছেন, গিরিশবাবুর ভিতরটা। সেখানে শুভ সংস্কার রয়েছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—যারা একবার দেখে কি, শুনে বিশ্বাস করে তারা মহৎ লোক—সংস্কারবান। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন অন্তরঙ্গ ভক্ত টমাসকে—'Blessed are they that have not seen, and yet have believed'—না দেখে কেবল শুনেই যে বিশ্বাস করে সে উচ্চকোটির ভক্ত, ধন্য সে। আগের জন্মের অনেক করা থাকলে এরূপ হয়।

'তুমি মা, আমি ছেলে'—এটিও একটি মহাবাক্য ঠাকুরের। যেন তুমি একটি, আমি একটি। 'যেন' মানে এই—বস্তুতঃ নয়। বাস্তবিক তিনিই সব। একটু ভক্তি দেখাবার জন্য দু'টি। তাই বলা হয় 'যেন'—মানে, as it were, বস্তুতঃ নয়। তিনিই কর্তা, করণ, কারয়িতা ও কার্য, সব তিনি।

দেখুন না, এই যে হাওয়াটি। এটি তুলে নিলে কোথায় যাবে আমাদের কথা কওয়া। এইখানে (ছাদে) আমরা বসে আছি। এটা ভেঙ্গে পড়লে কোথায় থাকবে আমাদের কথা ! 'বাপ রে, মা রে' করে এক্ষুণি দৌড়ে পালাতে হবে।

এই যে নানা রূপ নানা নাম—এ সবই তিনি নিজে হয়েছেন। (ছাদে আঘাত করিয়া) এই রূপেও তিনিই হয়েছেন। চুনসুরকির শক্তি তিনিই। Puffed up (অহঙ্কারে স্ফীত) করে দিয়েছেন সব। তখন আমরা বলছি, 'আমরা করছি'।

শ্রীম (যুবক ভক্তের প্রতি)—মানিক কি সকলে চিনতে পারে ? যে সর্বদা ঐ নিয়ে নাড়াচাড়া করে কেবল সেই মানিক চিনতে পারে। একদিন ঠাকুর আমাদের একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। একজন একটা মানিক নিয়ে বাজারে গেল ওটা বেচতে। প্রথমই গেল বেগুন-ওয়ালার দোকানে। সে দেখে বললে, আমি এটার দাম ন' সের বেগুন পর্যন্ত দিতে পারি—এর বেশী নয়। তারপর গেল কাপড়-ওয়ালার কাছে। এর condition (অবস্থা) নিশ্চয় better (ওর চাইতে ভাল)। সে দাম দিলে ন' শ' টাকা। এরপর জহুরীর দোকানে গেলে সে একেবারেই একলাখ টাকা দিয়ে ওটা

কিনে নিল। তাই সকলে ঠিক দাম দিতে জানে না। মানিক চিনে জহুরী।

ঠাকুরকে কে চিনতে পারে? যাকে তিনি কৃপা করে চেনা দেন কেবল সেই তাঁকে চিনতে পারে। অপরের চিনবার শক্তি নাই। তাই অর্জুন বলেছিলেন, 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।' কেবল তিনিই নিজেকে নিজে চেনেন।

যারা একবার দেখেই ঠাকুরকে বিশ্বাস করেছে তারা কে? কোনও ঐশ্বর্য নেই তবু ভক্তগণ যাচ্ছে। আহা, কি অবস্থা! বিড়্ বিড়্ করে বকছেন! অন্য লোক মনে করছে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়—মার সঙ্গে কথা হচ্ছে। এঁকে কে বিশ্বাস করবে! এর উপরও আছে—মধ্যম নারায়ণের ব্যবস্থা। আবার ন্যাংটা। এ অবস্থা দেখে অপর লোক পাগল বলবে না তো কি?

কিন্তু সেই অবস্থায়ও যারা যেতো তাদের দেখে অবাক্ হবেন না তো কি? তাদের দেখে বলতেন, তোমরা কে গো? তোমরা বুঝি জহুরীর জাত? সাধুকে তো লোক এক-আধবার দেখে। তোমরা কেন এত ঘন ঘন আসছ, আর অত কষ্ট করে পাঁচ মাইল হেঁটে? তোমরা আমার আপনার জন হবে হয়তো!

দেখুন না, কি অবস্থা। ছয় টাকা মাইনে, মন্দিরের পূজারী। বাড়ীতে লোক খেতে পাচ্ছে না। আবার ম্যালেরিয়ায় সব মর মর। কে কে আবার মরে গিয়েছে। তবুও একদিনের জন্যও মার কাছে টাকাকড়ি চাইলেন না, ওদের দুরবস্থার পরিবর্তন চাইলেন না—না ওদের আরোগ্য চাইলেন। চাইলেন, 'মা তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।'

কোথায় পাবেন এ আদর্শ—অভাবনীয় অতুলনীয়! রামলালরা তখন নাবালক। তাই মন্দিরের কর্তৃপক্ষ ঐ ছয় টাকা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি নিজে কখনও পাঠাতে বলেন নাই। তারাই পাঠাতো। তাঁকে টাকা সই করে নিতে বললে বলেছিলেন, কি জানি বাপু, আমি টাকা নিতে পারবো না।

এমন সময় যারা যেতো তাঁর কাছে তাদের দেখে অবাক্ হবেন না তো কি!

শ্রীম (সকলের প্রতি)—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় উগ্রসেনকে রাজা করেছেন কংসকে মেরে। তারপব উদ্ধবকে পাঠিয়ে দিলেন ব্রজে। বললেন, তাড়াতাড়ি যাও উদ্ধব। ওঁদেব (গোপীদেব) সংবাদ নিয়ে এসো। এতদিন কাজকর্মে সব ভুলে গিছলাম। আমার যখন কোনও ঐশ্বর্য ছিল না, আমি যখন বনবাসী রাখাল বালক, তখন তাবা আমায় ভালবেসেছে প্রাণ দিয়ে। সেই গোপীদেব সংবাদ নিয়ে এসো। তারা আমার জন্য পতি-পুত্র-স্বজন, সকলকে পরিত্যাগ করেছিল। যাও, যাও উঁদ্ধব, শীঘ্র যাও। শীঘ্র তাদের সংবাদ নিয়ে এসো। আমাব প্রাণ ছট্‌ফট্ করছে ওদেব জন্য। আমি কখনও তাদের ভালবাসার ঋণ শোধ করতে পাববো না। কেবল তারা যদি কৃপা করে আমায় ঋণমুক্ত কবে তবে আমি মুক্ত হতে পারি তাদের প্রেমবন্ধন থেকে।

কে পাবে বুঝতে এই দৈব লীলা! যাদেব তিনি কৃপা করে বোঝান কেবল তাবাই বুঝতে পারে। তাবাই 'salt of the earth'—জগতের প্রাণ, তারাই জগতের সৌবভ, তারাই জগতের গৌরব, তারাই জগতের আশ্রয়। বিশ্বাসই সব।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
২১শে মে ১৯২৪, ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১
বুধবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া

দ্বাদশ অধ্যায়

জীবন্ত প্রমাণ মা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল আটটা। শ্রীম বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। বিনয় ও জগবন্ধু দোকান হইতে শ্রীমর জন্য একজোড়া ধুতি ও একখানা বিছানার চাদর লইয়া ফিরিয়াছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—ধুতি খুলে দেখে এনেছেন?

জগবন্ধু—আজ্ঞে না। কেউই এরূপ দেখে আনে না। দোকানদার তা করতে দেয় না।

শ্রীম (কল্পিত ক্রোধে)—সে কি কথা? দোকানদার যা দেবে তাই আনতে হবে! সে তো তার মাল গছাতে চাইবে। ক্রেতা দেখে আনবে। ষোল আনা দিয়ে ষোল আনার মাল আনতে হবে। ঠাকুর বলতেন ফাউ আনতে হয়। কতকগুলি জিনিসের ফাউ আনা যায়—যেমন আলু, বেগুন ইত্যাদি। কেন বললেন ঠাকুর ফাউ আনতে? এর কি মানে নাই? বলতেন, এখানকার সব তোদের শিক্ষার জন্য মা করান ও বলান। কি মানে? দোকানদারের interest (স্বার্থ) এক সুতো কম দেওয়া। ক্রেতার interest (স্বার্থ) এক সুতো বেশী আনা। ফাউটা আনলে তবে হয়তো ষোল আনা মাল আসবে। তাই ফাউ চাইতে বলতেন। দেখি কেমন কাপড়, খুলে দেখান তো।

জগবন্ধু ধুতিজোড়া খুলিয়া দেখাইতেছেন—শ্রীম যেন কাপড়ের খুঁৎ খুঁজিতেছেন। মোহিনী মিলের কাপড়। দোষ পাওয়া শক্ত। অনেক খুঁজিয়া একটি দোষ আবিষ্কার করিলেন। এক

কোণে দুইটি সূতা নাল-ডেওয়া অর্থাৎ ইঞ্চি পাঁচেক জায়গায় নাই; দেখিতে পাইলেন।

শ্রীম (কল্পিত ক্রোধজনিত দৃঢ়স্বরে)—এই তো খারাপ বেরিয়েছে। চোখ দিয়েছেন কেন ঈশ্বর, বুদ্ধি দিয়েছেন কেন? তাদের ব্যবহার করতে হবে না? সমাধিস্থ হলে এসবের দরকার নাই। তাব নীচে থাকলে এসবের best application (উত্তম প্রয়োগ) করতে হবে। এদ্বারা যা লাভ হবে তা নিজেব সেবায় না লাগান, ভগবানের সেবায় লাগান। এরই নাম কর্মযোগ। এই সব ঠাকুরের শিক্ষা। যে, মনে কর—এই সামান্য বৈষয়িক বিষয়ে ঠকে যাবে, সে মহামায়ার পরীক্ষায় যে ঠকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? ভগবানলাভ ছেলেখেলা? ঠাকুব বলতেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? বলতেন, ভক্তদের পিঠেও দু'টো চোখ থাকবে। এসবেব কি মানে নাই? মহামায়া সর্বদা ভুলিয়ে দেন। সর্বদা মন প্রাণ দিয়ে নিয়ত চেষ্টা করলে শরণাগত হয়ে তবে তাঁর কৃপায় কার্যসিদ্ধি হয়। 'অতন্দ্রিত' মন চাই—সর্বদা জাগ্রত, চার দিকে দৃষ্টি চাই, যেম সঙ্গীনধারী সেপাই। আর অন্তরে সর্বদা প্রার্থনা—মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না। এতখানি আয়োজন থাকলে তবে মহামায়া পথ ছেড়ে দেন, পর্দা টেনে নেন। তখন মায়ের ভুবনমোহন রূপ দর্শন হয়। উঃ, কত ভেবেছেন ঠাকুর ভক্তদের জন্য। পলতেটি, খড়কে-কাঠিটি পর্যন্ত আয়োজন করে রেখে গেছেন যাতে ভক্তগণ এই সংসার-দুঃখসমুদ্রে থেকেও মনে পরমানন্দ উপভোগ করতে পারে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতরকম problems (সমস্যা) আছে তার সম্পূর্ণ সমাধান করে গেছেন like a worldly father (জাগতিক পিতার ন্যায়)।

ভক্তগণ প্রথমে শ্রীমর ব্যবহারে বিরক্ত হন। পরে শ্রীমর মুখে ঠাকুরের মহাবাক্যের এই বিস্ময়কর ব্যাখ্যা শুনিয়া স্তম্ভিত ও অনুতপ্ত হন। তাঁহারা গীতার মন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি করিতেছেন।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

মহাপুরুষগণের সকল কার্য সুগভীর অর্থপূর্ণ। তাই সামান্য হইলেও অনুধ্যেয়, সাদরে গ্রহণীয়, প্রাণপাত করিয়া পালনীয়।

ভক্তগণ দোকান হইতে পুনরায় কয়েকজোড়া কাপড় লইয়া আসিলেন। শ্রীম দেখিয়া উদাসীনভাবে বলিলেন; রেখে দিন যে কোন জোড়া।

আজ ২২শে মে, ১৯২৪ খ্রীঃ, ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১। কৃষ্ণা চতুর্থী, ৩৩।২ পল।

রাত্রি নয়টা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন মাদুরে, উত্তরাস্য। সম্মুখে বসা বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ছোট রমেশ, মনোরঞ্জন, বলাই, মোটা সুধীর, মণি ও গদাধর। ডাক্তার ও জগবন্ধু একসঙ্গে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমর কথামৃত তাহাদের উপরও বর্ষিত হইতে লাগিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—একদিন ঠাকুর বলছেন, 'বেলতলায় একদিন মা আমায় দেখালেন, আমার চক্ষুর সামনে সমগ্র বিশ্বটা ঘুরছে (তর্জনী দিয়ে ঘোরার অভিনয় করিয়া) এমন এমন করে।' বলতেন, 'সব কথা বলতে দেন না। মা আমার মুখ চেপে ধরে রাখেন।'

দেখুন না, আমাদের এই শরীরটা, কেমন যন্ত্র তাঁর হাতে। ভূমিষ্ঠ হলো—তখন কিছু নাই। ক্রমে মুখেতে মাই ধরিয়ে দিতেই (চুষিবার অভিনয় করিয়া) এমন এমন করে মায়ের মাই খেতে লাগল। তারপর বড় হতে লাগলো। Sensation localised (ইন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ) হতে লাগলো। এতে কেমন করে 'আমি আমি'টা থাকে!

তা'তে আবার কতকগুলি সংস্কার দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। সংস্কার মানে tendencies (মনের প্রবণতাসমূহ)। (ছোট রমেশের প্রতি) দেখ নি, বিড়ালছানা যার বলে এমন এমন করে (খামচাচ্ছে)? কোথা থেকে এল এই খামচানো?

ভগবানদর্শন হলে সংস্কার নষ্ট হয়। সংস্কার নষ্ট মানে,

sense world-এর (বাহ্য জগতের) সঙ্গে আর কোনও connection (সম্বন্ধ) থাকে না। এই কারণেই বলতেন ঠাকুর, একুশ দিনে মৃত্যু হয়।*

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আচ্ছা, এই জন্মেব আগে আমবা কি ছিলাম তা জানবার চেষ্টা কেউ কি কবে? তা'হলে কেন মিছে চেষ্টা মৃত্যুর পরে কি হবে, তা জানতে? জন্মের আগেব খবব নাই, আবার মৃত্যুব পবেরও খবর নাই। আমাদের যখন এই beautiful position (এমন চমৎকার অবস্থা) তখন মিছে কেন ভেবে মবা কাল কি হবে বলে? সবই তাঁব হাতে। তাঁর যা খুশি তাই করুন। ও চিন্তা করার দবকাব কি? শবণাগত হয়ে পড়ে থাক।

ডাক্তার বক্‌সী—মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায় কি কবে?

শ্রীম—শবীব থাকবে না এটা ভাল কবে বোঝাব নামই মৃত্যুঞ্জয়। সবই তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে—সর্বদা এই চিন্তাব নামই মৃত্যুঞ্জয়। কারণ মৃত্যুকে সে অবস্থায় কেউ আব ভয় কবে না। ভাবে, এ-ও ঈশ্ববের ইচ্ছায় হচ্ছে। ঈশ্বব সর্বমঙ্গলময়। মৃত্যুও মঙ্গলের জন্য। ছেলেব জন্ম হলে যেমন সংসারী লোক ভীত হয় না, আনন্দ কবে, তেমনি ভক্তগণ শরীবের মৃত্যুতেও ভীত হয না, আনন্দ করে। কেন? না, শরীর ধাবণের লাঞ্ছনার হাত থেকে বিমুক্ত হল বলে। শরীর থাকলেই কোন না কোন দুঃখ কষ্ট হবেই। অবশ্য ভক্তদের শুদ্ধ মনের আনন্দের কমতি হয় না কখনও। তাই যখন শরীর চলে যায় সেই সময় ভক্তগণ আনন্দ করে পরমানন্দের কাছে যাচ্ছে বলে।

শশী মহারাজ মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, 'পোহাল দুঃখ রজনী'। রোগে শরীরটার ভোগ হচ্ছিল। জাগ্রদবস্থায় মায়ের দর্শন পান। মা ছিলেন তখন জয়রামবাটি। এরপরই ঐ কথা বললেন।

* শঙ্কর বেদান্তদর্শন ভাষ্য ১।১।৪ ও চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ; এবং বৃহদারণ্যক—'অহিনির্লয়নী বল্মীকে'।

গিরিশবাবু তখন ঐ কথা দিয়ে গান বেঁধে তাঁকে শুনিয়েছিলেন। এরপরই দেহ যায়।*

মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। তা'হলে মৃত্যুভয় যায়।

'অতিবাদী' না হওয়া—মানে, ভগবানের বাক্য অতিক্রম করে কোন কথা না কওয়া, কোন কাজ না করা। বেদে আছে এই কথা।

আর মনে বিচার করতে হয়—আমি আত্মা, দেহ নই। দেহ একটি, আত্মা একটি। যখন অসুখ করে তখন দেহের অসুখ করে। এই দেহেতে আত্মবুদ্ধি, 'আমি'-বুদ্ধি থাকায় বলে, আমার অসুখ করেছে। এই দেহেব ভিতর আত্মা নিবাস করেন। তিনি নির্লিপ্ত। তাঁর জন্ম-মরণ নাই; রোগশোক নাই। দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আত্মা নিত্য, দেহ অনিত্য। সর্বদা এইরূপ বিচার করতে করতে এই বোধ হয় তাঁব কৃপায়—যেমন ঝুনো নারকেল, তার মালা আলাদা আর ভিতবেব শাঁস আলাদা।

কিন্তু তাঁর মহামায়া একথা স্মরণ রাখতে দেয় না। তাই মা মনে করে আমার মৃত্যু হবে না আমি চিরকাল থাকবো। সন্তানদের সেবা করবো। ও জানে, আমার ছেলেপুলেও মরবে না। তারা চিরজীবী। তাই ছেলেদের বারণ করে না এদিক ওদিক যেতে। যদি বুঝতে পারতো, 'আমার মৃত্যু হবে' তবে মনে করতো, ছেলেমেয়েরও মৃত্যু হবে। তা'হলে এদিক ওদিক ছেড়ে দিতো না, আগলিয়ে ধরে বসে

পোহাল দুখ রজনী।
গেছে 'আম-আমি' ঘোর কুস্বপন
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি শমন-বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী॥
কহিছে জননী "কেঁদোনা, রামকৃষ্ণ পদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা।"
হের মম পাশে, করুণায় দুটি আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ গুণমণি॥

থাকতো। এই স্নেহ দিয়ে মহামায়া সংসার বেঁধে রেখেছেন। এটি সৃষ্টিরক্ষার অপূর্ব কৌশল।

আজকাল যে infant mortality (শিশুমৃত্যু) এত বেড়েছে তার কারণও ঐ।. মা মনে করে আমার ছেলেমেয়ে মরবে না। তাই তেমন care (যত্ন) নেয় না। এমনি খেলা মহামায়ার! তিনি সব ভুলিয়ে দেন। তাই লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর প্রার্থনা করতেন সর্বদা—'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।'

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—একবার চেয়ে দেখুন না, মানুষের ভিতর কি কাণ্ডখানা করেছেন! এই শরীরের ভিতর মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার করেছেন। আর কথা কওয়া। এই যে 'কথা' কি করে হচ্ছে এটা analyse (বিশ্লেষণ) করে দেখুন না!

বড় জিতেন—কণ্ঠ, জিহ্বা, ঠোঁট, দাঁত সব মিলে এটা হচ্ছে।

শ্রীম—দেখুন না, একজন বললে, তোমার গুরু পরমহংসদেব ও-পাড়ায় এসেছেন। আর অমনি মম ব্যাকুল হলো আর উঠে রওনা দিলে। এ কি কাণ্ডটা হলো, কেমন করে হলো? 'মা', 'কালী', 'দুর্গা'—এক একটা কথা মাত্র কিন্তু সঙ্গে কি গভীর ভাব, কি high idea!

তাই বলে, মা শব্দরূপিনী—বর্ণরূপিনী। ঊনপঞ্চাশ বর্ণ অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। বর্ণের সমষ্টি শব্দ। শব্দ আবার ভাবরূপী।

আর একরকম শব্দ আছে এর ঊর্ধ্বে। তাকে বলে ব্রহ্মশব্দ, অনাহত শব্দ। যোগীরা শুনতে পান। ঠাকুর শুনতেন রাত দু'টোর সময় পোস্তায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে। এ শব্দ নিয়তই হচ্ছে—the uncaused word (অনাদি শব্দ)।

একটা শব্দ 'মা'। ভেবে দেখুন না, এর সঙ্গে কত ভাবনা বিজড়িত। কি করে হলো এসব ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। আমরা তো ভাবি 'মা' যে আমার ঘরের মা। কোত্থেকে এলো এই ভাব, কে করলে এসব? যেটা ধরবেন, সেইটাই আশ্চর্য-সাগরে নিয়ে ফেলে দেবে।

'মৃত্যু'—এর সঙ্গে কত ভাব রয়েছে। যোগীরা সর্বদা এই ভাবনা-গুলিকে জীবন্ত দেখতে পান। তাই মৃত্যুব জন্য সর্বদা ready (প্রস্তুত) থাকেন। তাঁরা জানেন দেহটা মরবে, আত্মা অর্থাৎ 'আমি' নিত্য।

বড় জিতেন—কাপড় বদলানোর মত।

শ্রীম—হাঁ। ঠাকুর বলেছিলেন, এই যে আমার অসুখটি হয়েছে এতে অন্তরঙ্গ বাছাই হয়ে যাবে। যারা বাইরের লোক, তারা সব চলে যাবে।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—অনন্ত কাণ্ড। ঈশ্বরেব স্বরূপও অনাদি অনন্ত, সৃষ্টিও অনাদি অনন্ত। প্রবাহাকারে সর্বদা চলে। ব্যক্তির নিকট সান্ত হয়ে যায় সৃষ্টি, ঈশ্ববদর্শনেব সঙ্গে সঙ্গে। ঈশ্বরও অনন্ত, সৃষ্টিও অনন্ত। এই পৃথিবীটা আর কতটুকু ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে—একটা বালিকণার মতও নয়।

অর্জুনের মত অত উত্তম অধিকাবী অনন্তের একটু রূপ দেখেই একেবাবে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, heart fail করে (প্রাণ যায় যায়) আর কি। চীৎকার করে বলতে লাগলেন—ঠাকুব, তোমার এ বিশ্বরূপ সম্বরণ কর। সৌম্যরূপ, কৃষ্ণরূপ ধারণ কর।

এসব আবার জানতে যায় মানুষ, ছ্যা। তাই ঠাকুর প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন—মা, আমি অন্য কিছুই জানতে চাই না। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।

এই যত সব religions (ধর্ম) দেখছেন, আর art, science, literature, language আর poetry, painting, music (শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাষা আর কবিতা, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতাদি) দেখছেন—এসবের গোড়ায় তিনি, ঈশ্বর। তিনিই unity in diversity (বৈচিত্র্যের মধ্যে একমাত্র সত্য)। তাঁর কৃপায় এটা বোধ হয়ে গেলে মানুষ বেঁচে গেল। তখন আর ছায়ার পেছনে ছুটাছুটি করবে না। বসে বসে তাঁর চিন্তা করবে, ঐ একের চিন্তা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর চিন্তা। আর সামনে যেটা পড়বে, যেটা না করলে নয়, সে কাজ করবে। তাও তাঁর সেবাবুদ্ধিতে।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—কি ভাবিতেছেন। এবার 'লাইট অব এশিয়া' থেকে আবৃত্তি করিতেছেন। বুদ্ধ কপিলাবস্তু নগরে ভিক্ষা কবিতেছেন। পিতা বাধা দিলে এই উত্তর করিলেন:

"Not of a mortal line," the Master said,
"I spake, but of descent invisible,
The Buddhás who have been and who shall be
Of these am I, and what they did I do."

[বুদ্ধদেব বলিলেন, "আমি পার্থিব সম্পর্কেব কথা বলছি না। অলৌকিক সম্পর্কের কথাই বলেছি। অতীত, বর্তমান ও অনাগত বুদ্ধগণের মধ্যে আমি একজন। আমি তাঁদেরই অনুসরণ ও অনুকরণ করছি। তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন ভিক্ষান্নে।"]

শেষ চরণটি শ্রীম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার উদ্ধার কবিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—এই দেখুন এইটি হলো কি করে? ভুলে গেলাম আবার স্মরণ হল। কে করলে এটি? তিনিই অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে থেকে সব করাচ্ছেন। বেদে আছে একথা—'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে'। গীতায় তারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। কি শ্লোকটি গীতায়?

ডাক্তার বক্সী—ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

শ্রীম—পুতুলনাচের পুতুল সব আমরা তাঁর হাতে। যেমন খুশি নাচাচ্ছেন। উঃ, কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এতে আবার 'আমি আমি' করে কি করে লোক?

চণ্ডীতে আছে মা-ই অন্তরে থেকে ভুল ভ্রান্তি জন্মিয়ে দেন—"যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

শ্রীম (মোহনের প্রতি চাহিয়া)—অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে কি আছে, বৃহদারণ্যকে?

মোহন—যাজ্ঞবল্ক্য জনকসভায় উদ্দালক আরুণিকে বলেছিলেন, জগতের সকল জীব, সকল বস্তুর অন্তরে ভগবান বাস করেন

অন্তর্যামীরূপে। কিন্তু তারা তাঁকে জানে না। সেই অন্তরাত্মাই তুমি, উহাই অমৃত। আর সব মর্ত্য। "এষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽতো-হন্যদার্তম্।"

শ্রীম—ঠাকুর তাই সঙ্কেত বলে দিয়েছেন। যখন জীবের এই অবস্থা সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন, তখন থাক্ শালার 'দাস আমি হয়ে।'

দাঁড়াচ্ছে কি? আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র। তাঁর ইচ্ছাতে সব হচ্ছে। তা হলে কেন মিছে চিন্তা ভাবনা—'এরপর কি হবে?' এসব হা-হুতাশ নিষ্ফল। তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। তিনি সর্বমঙ্গলময়। 'তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।'

২২-৫-২৪

২

মর্টন ইনস্টিটিউশানের দ্বিতল। শ্রীম সিঁড়ির সামনে বারান্দায় বসিয়াছেন—দক্ষিণাস্য। এখন সকাল নয়টা প্রায়। বিনয় ও জগবন্ধুকে শ্রীম বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল এস. রায়ের বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তিনি যেন এইচ. বোসের ছেলেদের পাখী মারা বন্ধ করান। আর এক দিন জগবন্ধু গিয়া রায় মহাশয়কে পান নাই। তাই আজ পুনরায় পাঠাইয়াছিলেন। আজ রায় মহাশয়কে শ্রীমর অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছেন।

বিনয় ও জগবন্ধু ফিরিয়াছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, বলে এসেছেন তো? কি বললেন তিনি? জগবন্ধু উত্তর করিলেন, তিনি আজই সুবিধা হলে এসে বলে যাবেন। শ্রীম বলিলেন, এই কয়দিন বড়ই উদ্বেগ হচ্ছে। ধর্মশাস্ত্রে আছে, শক্তি থাকতে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে পাপ স্পর্শ করে। আমরা বললে হয়তো বাড়ীর লোক মনোযোগ দেবে না। উপযুক্ত লোককে দিয়ে কাজ করাতে হয়। তাই রায় মশায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এই দুই পরিবারই ব্রাহ্ম সমাজের লোক, আর পূর্ববঙ্গে এক দেশে বাড়ী। তা ছাড়া রায় মশায় প্রিন্সিপাল। তাঁর নিজেরও একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে।

শ্রীম—আচ্ছা, ছোট জিতেনবাবুরা কোথায়?

একজন ভক্ত—ওঁরা চলে গেছেন।

শ্রীম—কেন, অন্য দিন তো আটটা পর্যন্ত থাকেন। আজ আমি সওয়া সাতটায় নেমেছি উপর থেকে। আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলেন?

বিনয়, জগবন্ধু, মনোরঞ্জন, ছোট জিতেন—ইঁহারা সকলেই এখানে রাত্রে থাকেন। দিনে যার যার বাড়ীতে চলিয়া যান। কেবল জগবন্ধুর বাসস্থান এখানে।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসা দক্ষিণাস্য, বসিবার ঘরের সামনে। ঘরের ভিতর মেঝেতে মাদুর পাতা। সেখানে কয়েকজন ভক্ত বসিয়া শ্রীমর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আজ শনিবার, তাই আফিসের ছুটির পর ইঁহারা আসিয়াছেন। শহরের বাহিরে থাকেন, রেলে নিত্য যাতায়াত করেন। আর শনিবারে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসেন। ছোট জিতেন আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া রাণাঘাটের বাড়ী গেলেন।

শ্রীমর সঙ্গে জগবন্ধু বসা। তাঁহার সহিত শ্রীম কোনও বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। এটর্ণি বীরেন বসু আসিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম তাঁহাকে পাশে বেঞ্চিতে বসাইলেন। পূর্বদিকের বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন লক্ষ্মণ ও গদাধর। বীরেন শ্রীমকে ডাক্তার স্যার কৈলাস বসুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার প্রসঙ্গ শুনাইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর কেশব সেনকে বলেছিলেন, তোমরা যা 'লাইট', (আলো) পাচ্ছ, সে যেন বদ্ধ ঘরের chink (ফাঁক) দিয়ে আসা লাইট। যারা সব ছেড়ে দিয়ে মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা আর এক রকম দেখছে। আলোর সায়রে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা—সাধুরা। অবাধ আনন্দে তাঁরা ভরপুর।

ওখানে (সংসারে) থাকলে মনকে জোর করে টেনে নীচে নামিয়ে আনে। মন সংসারে বাঁধা পড়ে যায়। দেওয়ালের ভিতর থাকে মন—আটকে যায়, যেন কয়েদখানার মানুষ।

বড় জিতেন ও বড় অমূল্যর প্রবেশ। বড় জিতেন শ্রীমর পাশে বসিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—বাজনার বোল মুখস্থ করতে পারে অনেকেই, হাতে আনা বড়ই কঠিন। শুধু গল্প করলে কি হয়? পালন করা চাই।

সর্বত্যাগীদের জীবন সামনে ধরতে হয়। তবে যদি কতকটা ওপরে ওঠা যায়। কাকে-ঠোকরান আম দেবসেবায় লাগে না, ঠাকুর বলতেন। Highest ideal-এর (সর্বোচ্চ আদর্শের) উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়।

(স্মিত হাস্যে) এখানে একজন প্রায়ই আসেন। বিয়ে করেছেন। পরিবার খাবার দিতে এলে বলেন, 'না, যাও। স্ত্রীলোক দেখতে নেই।' এরূপ বৈরাগ্য ভাল নয়। সংসারীদের বৈরাগ্য প্রায়ই এইরূপ। একটু কিছু করছে হয়তো, অমনি পাড়ার লোকদের কাছে গিন্নী গল্প শুরু করে দিল—'আমাদের কর্তার এখন বড়ই পরিবর্তন। সর্বদাই একলা বসে থাকেন—পূজা পাঠ করেন। ছেলেমেয়েদের উপর নজর নেই। বাড়ীর কাজকর্মও আর তেমন করেন না।' লোক শুনে ভাবে, বুঝি পরমহংস হয়ে গেল।

কিন্তু, এ গল্পের বৈরাগ্যের কাজ নয়। ঠাকুর বলতেন, প্রথমে সব ছেড়ে নির্জনে গিয়ে তপস্যা করতে হয় সাধুসঙ্গে। তারপর ভক্তি লাভ হলে তখন গিয়ে সংসারে থাকা। কত কাঠখড় পুড়িয়ে এই অনাসক্তি হয় ভক্তিলাভের পর। আর ক'জনের হয়?

ভক্তগণ সকলে নির্বাক্। আঁতে ঘা পড়িয়াছে বুঝি।

শ্রীম—সর্বদা সর্বত্যাগীর সঙ্গ চাই, নিত্য সঙ্গ আর সেবা। তাঁদের সেবা করলে তাঁরা তুষ্ট হন। তাঁদের তুষ্টিতে ভগবান তুষ্ট হন। তখন সহজ হয় সব। 'জ্ঞানীতু আত্মৈব মে মতং'।

কেশব সেনকেই ঠাকুর বললেন, 'তুমি chink (ফাঁক) দিয়ে আলো পাচ্ছ।' অপরের কথা কি? কেশব সেনকে বলতেন দৈবী মানুষ, 'তাঁর ফাৎনা নড়ছে', তাঁর 'লেজ খসেছে।' তাঁর শরীর

গেলে কাঁদলেন—চাদর মুড়ি দিয়ে তিন দিন পড়ে রইলেন। ওর কিছু হলে আমি কার সঙ্গে কথা কইব কলকাতা গেলে!

এসব কথা সর্বদা চিন্তা করা দরকার যারা ঘরে রয়েছে। তবে ধাত ঠিক থাকে। নইলে পিতলকে সোনা বলতে হয়—একটু ঘসে-মেজে সাফ হয়েছে দেখে।

বড় জিতেন একটি আংটি আনিয়াছেন। তাহাতে বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, রামেশ্বর, পুরী—ভারতের এইসব ধাম দর্শন হয়, আর দেবমূর্তি। শ্রীম ও ভক্তগণ উহা দেখিয়াছেন।

শ্রীম—এইসব তীর্থ ও দেবমূর্তি দর্শন আরও ভাল হয় যদি দই, সন্দেশ, রাবড়ি, ফল, বাতাসা নিবেদন করা হয়। আমরা যা নিয়ে আছি তা দিলে মনে হয়, না—কিছু দিলাম। এতে আত্মীয়তা বাড়ে। এইসব নিয়ে আছি কিনা আমরা। যা নিয়ে আছি আমরা, তার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ, ঐসব জিনিস ভগবানে নিবেদন করা, সাধুসেবায় লাগান। এই সবেই বদ্ধ মানুষ। হিম্মৎ করে তাঁর কৃপায় এইগুলি দেবসেবা সাধুসেবায় লাগালে মুক্ত হয়।

কি দুরবস্থায় আমরা পড়েছি! তবুও মানুষ বলে, আমরা কর্তা। মানুষ কি কর্তাগিরি করবে? দেখ না, এই হাওয়া। এটি তিনি করে দিয়েছেন। তাই আমরা আছি। এক্ষুণি যদি বন্ধ করে দেন কোথায় থাকবে তোমার কর্তাগিরি, তার নাই ঠিক। এই অবস্থা নিয়ে আবার কর্তাগিরি? হাওয়াটি না থাকলে সব (চোখমুখ বুঁজে মৃত্যুর অভিনয় করিয়া) এমন হয়ে পড়বো। কি করে তাহলে আর কর্তা বলা চলে?

কি হীনবুদ্ধি মানুষ! কে একজন বলেছিল, আমি আরও ভাল একটা জগৎ তৈরী করতে পারতাম—I could have made a better universe. এই earthটা (পৃথিবীটা) একটা অতি সামান্য নক্ষত্র—অতি ক্ষুদ্র। তারই কতটা লোক জানতে পেরেছে আজ পর্যন্ত? কিছুই না! আর বলছে কিনা, আমি নূতন উন্নততর বিশ্ব রচনা করতে পারতাম! মানুষের অজ্ঞানের অন্ত নাই।

তারপর নিজের শরীরটার ভিতর কি কাণ্ড চলছে তাই কি বুঝতে পারছে মানুষ? একটা নয়, পর পব তিনটা শরীর। এর এক-একটা একটা ক্ষুদ্র জগৎ—a world in miniature. এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় মানুষ একটা বালুকণাকে সহস্র ভাগ করলে যা হয় তার সমানও নয়। আর বলছে কি না, আমি হেন করতে পারতাম, তেন করতে পারতাম। কর না, মৃত্যুটা জয় কব—দেখি। জরা মৃত্যু শোক দুঃখ—এইগুলি বাইরের শত্রু, আর কাম ক্রোধ লোভাদি অন্তরের শত্রু—কর না এদের জয়। দেখাও তোমার বীরত্ব। শুধু মুখে বড় বড় কথা বললে কি হয়, হাতে আনতে হয়। একেই বলে ঘোর অজ্ঞান।

'আমি, আমার' করা অজ্ঞান, 'তুমি, তোমার' করা জ্ঞান।

শ্রীম (মোহনের প্রতি)—'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। অর্থাৎ যে সব ত্যাগ করেছে সে সেই পরমানন্দস্বরূপকে উপভোগ করতে পারে। অর্থাৎ, তারই ঈশ্বরদর্শন হয়।

এদিককার টান যত কমবে, ওদিককার টান তত বাড়বে—ঢেঁকির মত। এক দিক যত উঠবে অন্য দিক তত নামবে। এদিক থেকে মন সম্পূর্ণ উঠে না গেলে পরমানন্দ লাভ হয় না।

বড় জিতেন—ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তো জীব সংসারে বদ্ধ হয়ে আছে মায়ামোহে।

শ্রীম—হাঁ। তিনিই এতে বদ্ধ করে রেখেছেন। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই মুক্ত হওয়া যায়। তবে প্রার্থনা করতে হয় নির্জনে, গোপনে। ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে হয়—হে প্রভো, আমায় এ থেকে মুক্ত করে দাও। বুঝিয়ে দাও—তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। যিনি বদ্ধ করেছেন, তিনিই মুক্তির এই সহজ ও যুগোপযোগী উপায়ও বলে দিয়ে গেছেন। তাঁর কথা শুনতে হয়—অন্ততঃ চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর নিজে বলেছেন একথা। আবার এও বলেছেন, আমি অবতার। মানে, ঈশ্বর মানুষরূপে অবতীর্ণ।

বড় জিতেন—ভগবান পাণ্ডবদের সঙ্গে, তবুও তাঁদের কত দুঃখ

কষ্ট। আবার কত কাজ করতে হলো—অশ্বমেধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, আবার রাজসূয়।

শ্রীম—পাণ্ডবদের এই দুঃখকষ্ট তাঁদের মনকে majestic heightএ (উচ্চ শৃঙ্গে, ঈশ্বরে) তুলে রেখেছিল। আর এতে জগতের শিক্ষাও হচ্ছে। কি শিক্ষা? না, ভগবানকে ডাকলে দুঃখ হবে না এমন কিছু নিয়ম নাই। শরীর থাকলে সকলেরই দুঃখকষ্ট হবে। তবে মনটা ঈশ্বরে রাখতে চেষ্টা কর—আমি ঈশ্বরের সন্তান, 'অমৃতস্য-পুত্রাঃ'—এই ভেবে। তাহলে এর আঁচ মনে লাগবে না। তখন বনবাসের কষ্টেও মনে পরমানন্দ উপভোগ হয়।

আর কাজ—এ না করে পারে লোক? শরীর ধারণ করলে কাজও করতে হয়। শরীরের নামই কর্ম। তারপর পাণ্ডবগণ ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। প্রজাপালন, ধর্মরক্ষা, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এসব এঁদের কাজ। এসব না করলে যে সমাজ রসাতলে যাবে। এই সব বড় বড় কাজ, যজ্ঞাদি করিয়ে এঁদের কর্ম ক্ষয় করিয়ে নিলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে এতে জগতেরও কল্যাণ হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙ্গেন, মাছের তেলে মাছ ভাজেন।

রাজসূয় যজ্ঞই পাণ্ডবদের শেষ কর্ম। তার পরই মহাপ্রস্থানের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় কেবল রাজ্যশাসন করছিলেন পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে। এসব নিষ্কাম কর্ম। শ্রীকৃষ্ণের শরীর-ত্যাগের সংবাদ আসামাত্র মহাপ্রস্থান করলেন। যাদের চিন্তাশক্তি আছে তারা ভাবলে অবাক হয়ে যায়—পাণ্ডবদের মনোবৃত্তিটি কিরূপ ছিল! যেন ধর্মশালায় বাস করা—প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ।

রাজসূয় মানে, সব রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করাবার উৎসব। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে ইংরেজদের যে দরবার হয় তা-ও রাজসূয়। ভারতের সকল রাজন্যবর্গ এসে ইংরেজ রাজাকে willing homage (স্বেচ্ছাকৃত সম্মান) দিয়েছিল।

বড় জিতেন—ঠাকুর ঈশ্বর হয়েও কত দুঃখকষ্টে ভুগলেন।

শ্রীম—হাঁ। সবই হয়েছিল—রোগ, শোক, দারিদ্র্য। আবার

বলেছিলেন, পঞ্চবটীতে কামও হয়েছিল, একদিন মাত্র। তবে তো ভক্তরা সাহস পাবে। বুঝতে পারবে, শরীর ধারণ করলে এসব সকলেরই হয়—অবতারেরও হয়। ভক্তদেব এসব গল্প করে শোনাতেন এই লোকশিক্ষার জন্য। মানুষের যা যা হয় সবই তাঁরও হয়েছিল। সকল অবতারেরই তা হয়েছিল। তবে মানুষের মন সর্বদা এসবে ডুবে আছে। অবতারের মনে এসব যে উদয় হয় তা symbolic expression (নামমাত্র প্রকাশ)। তাঁদের মন সেন্ট পার্সেন্ট ব্রহ্মচিন্তাতে নিমগ্ন। আব মানুষেব মন সেন্ট পার্সেন্ট বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন। লৌকিক ভাষায় বলতে হলে এরূপ বলা যায়—যেন 'পয়েন্ট ওয়ান'-এ এসব হয়। আর নাইনটিনাইন পয়েন্ট নাইন মন ব্রহ্মলীন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাব মত যোগে থাকা, এটি আদর্শ। একটু জপ, একটু ধ্যান করলুম, এতে হয় না। তৈলধারার মত লগ্ন হয়ে থাকা তাঁব সঙ্গে। দেয়ালের গায়ে এক ফোঁটা জল আর এক ফোঁটা তেল রেখে দিলে দু' ফোঁটাই নীচে গড়িয়ে যাবে। জলের ধারাটির ববং অবচ্ছেদ আছে। কিন্তু তৈলধারাতে তা নাই। এইরূপ লগ্ন হওয়া চাই ঈশ্বরে।

নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার অবস্থা ঠাকুরের জীবন। সারাটা জীবনই ঐ ভাবে ছিলেন। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা watch (পর্যবেক্ষণ) করেছি তাঁকে। কখনও এক সেকেণ্ডের জন্যও অযুক্ত দেখতে পাইনি। নিদ্রায়ও 'মা মা' করছেন। অবতারে কেবল এ অবস্থা সম্ভব। কেবল শাস্ত্র পড়লে এসব বোঝা যায় না। তাই মাঝে মাঝে মানুষশরীর ধারণ করে আসেন ভগবান, এইসব অবস্থা যে সত্য, শাস্ত্রে যাদের কথার উল্লেখ আছে, তা দেখাতে। শাস্ত্র যে প্রমাণ তার প্রমাণ ঠাকুরের জীবন।

ঠাকুর যে অবতার তার living testimony (জীবন্ত প্রমাণ) একটি হলো মায়ের জীবন। মা কি চক্ষে দেখতেন ঠাকুরকে? হৃদয় মুখুজ্যে একদিন হাসিতামাসা করে বললেন মাকে—মামী, একটিবার মামাকে বাবা বল। তাহলে তোমায় পাঁচ টাকার সন্দেশ খাওয়াব

মা তক্ষুণি উত্তর করলেন, তোমায় সন্দেশ খাওয়াতে হবে না বাবা। আমি অমনি বলছি, ঠাকুর আমার বাবা, মা, ইষ্ট, গুরু, পতি, সখা—সব তিনি।

আহা, কি কথা! সব ভাবেতেই ঠাকুরকে পেয়েছিলেন কিনা। ঈশ্বর ছাড়া অপরের সঙ্গে এই সব সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটি একটি বড় প্রমাণ ঠাকুরের অবতারত্বের।

আর একটি প্রমাণ—বিশেষ প্রমাণ, স্বামীজীর জীবন। যে লোক প্রথম প্রথম ঠাকুরের ঈশ্বরীয় অদ্ভুত দর্শনাদিকে hallucinations (মতিভ্রম) বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর অবতার বলে বিশ্বাস করেন নাই—সেই ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে বলছেন দিগ্বিজয় করবার পর, যদি আমি সত্য কথা বলে থাকি, তবে ঐ সবই ঠাকুরের। অন্য সব আমার নিজের। আরতি করছেন, 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' বলে। আর বলেছেন, 'কৃন্তন-কলি-ডোর'। স্তবে বলছেন 'মত্যামৃতং তবপদং মরণোর্মীনাশং।' স্বামীজীর আমেরিকার বিস্ময়কর কার্য ও জীবন জাজ্বল্যমান প্রমাণ ঠাকুরেব অবতারত্বের।

তারপর তাঁর অপর ভক্তদের জীবন ও তাঁর অবতারত্বের জীবন্ত জ্বলন্ত প্রমাণ।

কলিকাতা
২৪শে মে ১৯২৪ খ্রীঃ, শনিবাব

ত্রয়োদশ অধ্যায়
খাঁড়ার ঘা—নরুনের আঁচড়

অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টা। দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া শ্রীম কিছুক্ষণ স্কুলের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া হাতমুখ ধুইতে গেলেন। সাতটায় আসিয়া দ্বিতলের বসিবার ঘরে মেঝেতে মাতুরে বসিয়াছেন। ভক্তগণ

কেহ কেহ চলিয়া গিয়াছেন। আবার কেহ আসিতেছেন। সন্ধ্যার আলো আসিতেই শ্রীম ভক্তসঙ্গে কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীমর সামনে ও পার্শ্বে ভক্তগণ উপবিষ্ট—শুকলাল, ভাটপাড়ার ললিত ও সঙ্গী, ডাক্তার, বড় জিতেন, বড় অমূল্য, ছোট রমেশ, বলাই, মুকুন্দের ভাগিনেয়, গদাধর, জগবন্ধু প্রভৃতি। রাত্রি সাড়ে আটটায় আসিলেন স্টুডেন্টস্ হোমের স্বামী নির্বেদানন্দ ও সন্তোষানন্দ। তাঁহাদের সঙ্গে একজন শিক্ষক। কুশল প্রশ্নাদির পর শ্রীম স্বামী নির্বেদানন্দের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম—আহা, মিহিজামে তোমার সেই গানটি শুনে বড় আনন্দ হয়েছিল। সেই দালানটিতে ঠাকুরকে সাজান হল। 'অরূপ সায়রে লীলা লহরী'—আহা, কি গান! Finiteকে (জীব জগতকে) বাদ দিলে চলবে কি করে? ওজনে কম হয়ে যাবে যে! তাই ওটি বাদ দেবার যো নাই।

এ গানটি ইন্দ্রদয়ালের রচনা। এরূপ একটা গানেই মানুষকে ভক্ত জগতে অমর করে রাখে। অনেক দিন দেখা নাই ইন্দ্রদয়ালের সঙ্গে—বার চৌদ্দ বছর হবে। তাঁর গলাটিও বেশ মিষ্টি। আগে রামপ্রসাদের গান গাইতেন। তাঁর পর ক্রমে ক্রমে এই সব হয়েছে।

ঠাকুর বলতেন, বিচার করে কি হবে? আমি যে দেখতে পাচ্ছি, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন—কর্তা, কারয়িতা, কারণ—সব তিনি। মানুষ বিচার করে, ঈশ্বর আছেন কি না, তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন করছেন কিনা, তাঁর ইচ্ছাতে জীবজগৎ চলছে কি না, এই সব। ঠাকুর সর্বদা দেখছেন ঈশ্বরকে সামনে উপস্থিত। একবার-আধবার নয়, সর্বদা। যেমন এক পরিবারের লোকে সকলকে সকলে সর্বদা দেখছে, কথা কইছে, সকল লোকব্যবহার করছে, তেমনি যে ঠাকুর সর্বদা মায়ের সঙ্গে রয়েছেন—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে। ঈশ্বরকে সর্বদা দেখছেন, আর দেখছেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব চলছে, গাছের পাতাটিও তাঁরই ইচ্ছাতে নড়ছে, শ্বাস প্রশ্বাসও ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই চলছে। তাহলে আর

কি নিয়ে বিচার করবেন ? 'স ঐক্ষত বহুস্যাম প্রজায়েয়', 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'—এইরূপ বেদবাক্য শ্রুতি ঠাকুরের চর্মচক্ষুর কাছে প্রকাশিত। এ অবস্থায় বিচার বন্ধ।

ঠাকুর দুইজনকে (রাম ও নরেন্দ্রকে) লাগিয়ে দিলেন এই সব বিচার কবতে। এদিকে আমাদের কাছে মুখ ফিরিয়ে চুপি চুপি বলছেন, আমার ভাল লাগে না এ সব বিচাব টিচার।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুবের চিন্তা কবলে সর্ব সংশয় দূব হয়ে যায় অনেকটা। তাঁর কৃপায় তাঁব দর্শন হলে তখন সম্পূর্ণ প্রশান্ত। সংশয় থাকলেই মন চঞ্চল। তাহলেই শান্তিব অভাব হলো। সংশয় দূর হয় তাঁকে দেখলে। তখন মনে শান্তি, প্রশান্তি। এটি লাভ করাই মানুষজীবনেব উদ্দেশ্য। গীতায় এই কথাই বলেছেন, 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং।'

ব্রাহ্ম সমাজে খুব বিচাব চলতো তখন, ঈশ্বর সাকাব কি নিরাকাব, এই সব বিষয়ে। একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এলে তাঁকে বললেন—আচ্ছা, তোমরা এই নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? কি কাজ অত কথায় ? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ডাক। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি নিজেই দেখিয়ে দেবেন তিনি সাকার কি নিরাকাব। মুখে বললে কি হবে, হাতে আনতে হয়। আবার হাতে আনাব সহজ পথটি দেখিয়ে দিলেন, নির্জনে গোপনে কাঁদ।

বিবেকানন্দ প্রথম প্রথম বলতেন কিনা, দর্শনাদি hallucination (মতিভ্রম)। তখন বয়স কম, ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন। এসব কথা ওখানে শুনেছেন। ওখানকার কেহ কেহ আবার বলতেন, অত বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর কবলে বেহেড হয়ে যাবে। ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, বিষয়চিন্তা করে যদি 'বেহেড' না হয়, তাহলে জগতের যে চৈতন্য, যাঁর চৈতন্যে সকলে চেতন, তাঁর চিন্তা করে কি 'বেহেড' হয় ? (সহাস্যে) শিবনাথ শাস্ত্রী বলতেন, পরমহংস মশায়ের একটা রোগ ছিল, তা'তেই মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতেন (সকলের হাস্য)। তা, কেমন করে বুঝবে তারা এই পরমহংস অবস্থা ?

নরেন্দ্রের মুখে ঐ কথা শুনে ঠাকুর ভাবিত হয়ে পড়লেন। তাই জগদম্বাকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, তাহলে এ সবই মনের গতিক ? মা বললেন—না, এ সবই সত্য। তখন নরেন্দ্রকে বললেন ঠাকুর—না, তোর কথা ল'তে পারলাম না। মা বলেছেন এ সব সত্য, ভ্রম নয়। আমি তোমার মুখ দিয়ে বলছি ! যা তুমি বলছো সব যে বাস্তবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তাহলে আর কি করে মনের গতিক হয় ! আজ হয়তো মা দেখালেন বৈষ্ণবচরণ আসবে, তা তিনি এসে পড়লেন। আজ বললেন, কেশব সেন আসবে, অমনি তিনি এসে উপস্থিত হলেন। মা বললেন, মনের ভ্রম হলে, মাথার গোল হলে, এসব মেলে কি করে—দর্শন ও কথার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার ? একদিন তো নয়, সারা জীবনই হয়েছে এইরূপ।

মা বলেছেন অমুক আসবে। এর মানে, অমুক মায়ের লোক—সাধারণ ব্যক্তি নয়। শুধু কি তাই—তাদের দেখে উঠে পড়তেন আহ্লাদে—আপনার লোক দেখে যেমন মানুষ উঠে পড়ে। এটি হতো অন্তরঙ্গরা যখন কেউ আসতেন। কখনও অন্তরঙ্গদের দেখে সমাধি হয়ে যেতো।

ঠাকুর নিজে গল্প করে বলেছিলেন—নারাণ শাস্ত্রী যখন এলো তখন আমি একটা বাঁশ কাঁধে করে এমন এমন (আগেপিছু) করছি। নারাণ শাস্ত্রী দেখে বললে, 'উন্মত্ত' হ্যায়। তা বলবে, আর আশ্চর্য কি ? চিনবে কেমন করে তাঁকে, তিনি না চেনালে ?

ঠাকুর বলেছিলেন, যখন আরতির বাজনা বাজতো আমি তখন কুঠীর ছাদে উঠে কাঁদতুম আর বলতুম—মা, আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে থেকে। তোমার শুদ্ধ ভক্তদের এনে দাও। তুমি তো বলেছিলে তারা সব আসবে ! আর চীৎকার করে বলতাম—আয়রে আয়, তোরা কে কোথায় আছিস্। তোদের জন্য বসে আছি। আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে—আয়, তোরা আয়।

দেখুন, ভগবান যিনি, তিনিও ভক্ত চান। আবার ভক্তও ভগবান চায়। বলেছিলেন, তখন এক একবার মনে করতাম, ভক্তের জন্য

আমার এই ব্যাকুলতা হয়তো আমার পাগলামী।…তারপর সুদীর্ঘ বিশ বাইশ বছর পর যখন অন্তরঙ্গগণ আসতে লাগলো তখন বুঝলাম মায়ের কথা সব সত্য।

মায়ের যখন প্রথম দর্শন পান তখনই ঠাকুর মাকে বলেছিলেন এই কথা—মা, আমার শরীর থাকবে না—কামিনীকাঞ্চনে জ্বলে যাচ্ছে। মা শুনে প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন—বাবা, একটু ধৈর্য ধর। এর পর সব শুদ্ধ ভক্ত আসবে। কুড়ি বাইশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কি ধৈর্য! মানুষ একটুতেই উতলা হয়ে পড়ে! ভক্তদের এটা খুব শিক্ষার বিষয়। 'শুদ্ধভক্ত' মানে, unadulterated (নিষ্কাম, নির্মল)। ঠাকুর গান গেয়ে বলতেন, 'শুদ্ধাভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে। ব্রজের গোপ-গোপী ভিন্ন অন্য কেহ নাহি জানে।' শুদ্ধাভক্তি মানে, বৃন্দাবনের গোপ-গোপীদের শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, অন্য কোনও কামনা নাই এতে।

শিশির ঘোষ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র 'এডিটার' ছিলেন। তিনি বেশ একটি গল্প করতেন—রসিক পুরুষ ছিলেন কিনা! একজন ভক্ত তপস্যা করছে। তার ব্যাকুল প্রার্থনায় ভগবান দর্শন দিলেন, আর বললেন, তুমি কি চাও বাবা? ভক্ত উত্তর করলো, ভারত উদ্ধার। তথাস্তু, বলে ঈশ্বর চলে যাচ্ছেন। যাবার সময় বললেন, তবে চারশ' বছর পার হবে। ভক্ত তখন বিস্ময়ে বললে, চারশ' বছর পর—তখন আমি থাকবো না! (সকলের হাস্য)। এই selfটা (স্বার্থপর 'আমিটা') ঢুকিয়ে সব মাটি করলে।

শ্রীম কিছুকাল নীরব—কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ হইতে লাগিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঐ একটি আছে—ট্রামগাড়ীর ট্রলি। ঐ গোলাকার চাকাটি যোগ করিয়ে দেয়—গাড়ীর সঙ্গে ইলেকট্রিক তারের। যেই ঐটি আলগা হয়ে গেল অমনি গাড়ী থেমে গেল। ঐটি আমরা discover (আবিষ্কার) করেছি—যোগের বেশ দৃষ্টান্ত।

বড় জিতেন—আচ্ছা, যোগ হয়ে গেলেও আবার তপস্যা কেন?

শ্রীম—লোকশিক্ষার জন্য।

শ্রীম—হেম কর বেশ বলেছিলেন ঠাকুরকে—মানুষজীবনের উদ্দেশ্য কি? লোকমান্য—না, ছোট ভট্‌চায্যি মশায়? রসিকতা করে বলতেন এসব কথা। ঠাকুরের সর্বদা সমাধি হচ্ছে দেখে, সর্বদা যোগে আছেন দেখে, রহস্য করে বলতেন এই কথা। হেম কর পল্টু করের পিতা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কত রকম করে বাজিয়ে দেখে তবে মানুষ ঠাকুরকে নিয়েছে। কি অবস্থা ভাবুন। দেখি—চব্বিশ ঘণ্টা মায়ের সঙ্গে যুক্ত। এই একটি ঘটনা বলে দেয়, তিনি ঈশ্বর। মানুষে কি সম্ভবে এই অহর্নিশ যোগ!

ঠাকুর বলতেন, এও কর্ম—নিশ্বাস ফেলা, জপ ধ্যান—এ সবই কর্ম। আবার ও-ও—রাজ্যশাসনাদি। কর্মযোগ ঐ থেকে এলো কি না। পাণ্ডবদের কর্মযোগ করতে হয়েছিল। কর্ম না করে মানুষ থাকতে পাবে? কর্ম সকলকেই করতে হবে। তবে বলেছিলেন, কলিযুগের পক্ষে এ নয়। অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, তাই এখন ভক্তিযোগ। শক্তি কোথায় কর্ম করবার? শুধু কি শরীরের শক্তি—মনের শক্তিও চাই। মনের শক্তিই প্রধান। এখনকার মন চঞ্চল—বিষয়াসক্ত। দু' মিনিট স্থির হয়ে বসতে পারে না।

ঠাকুর কখনও কখনও বলতেন, এখানে যারা আসবে তাদের একেবারে চৈতন্য হয়ে যাবে। 'এখানে' মানে—'যারা আমার চিন্তা করবে'। হাজরা, লাটু এরা মালা জপ করতো কি না। তাই এই কথা বলতেন, একেবারে চৈতন্য হয়ে যাবে। আবার মালা জপ!

সৎগুরু না হলে এ ভেদ কে বলে দেয়? ঠাকুর বলতেন, যাদের গুরুলাভ হয়েছে তাদের কি চিন্তা? তারা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে রয়েছে। ইঙ্গিত করতেন নিজেকে। স্পষ্ট করে বলেছেন, আমার চিন্তা কর। তোমাদের ভয় নাই। আমি তোমাদের ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব। মাঝে মাঝে আরও স্পষ্ট করে, আরও জোর দিয়ে বলতেন—মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে, সে আমার, ঐশ্বর্য

লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি, এ সব আমার ঐশ্বর্য। তাই তাঁকে যারা চিন্তা করবে তাদের কর্ম কমে যাবে।

বড় জিতেন—সংস্কার যে রয়েছে, তার তো কার্য হতেই হবে।

শ্রীম—ঐ সংস্কার জ্বলে যায় তাঁকে চিন্তা করলে। সঞ্চিত আর ক্রিয়মান কর্মের সংস্কার একেবারেই জ্বলে যায়। যেমন ধান ভেজে পুঁতলে আর গাছ হয় না। কেন? বীজের উৎপাদনী শক্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে ভাজায়। বেদে আছে এই কথা—'ভ্রষ্ট বীজবৎ' কর্মসংস্কার নষ্ট হয়ে যায়।

প্রারব্ধের একটু আধটু ভোগ হয়। প্রারব্ধ মানে, যে কর্মসংস্কার ফল দিতে আরম্ভ করেছে, অর্থাৎ যে কর্মসংস্কারের জন্য এই শরীর হয়েছে। তাঁর শরণাগত হলে এই প্রারব্ধ কর্মের ভোগ তিনি হাতে ধরে করিয়ে নেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই ভোগও না করাতে পারেন। কর্মফল ভোগ করতে হলেও তিনি কমিয়ে দেন। কিম্বা মন তাঁ'তে টেনে নেন, কর্মভোগ হয়ে যাচ্ছে আপনি। এতে ভোক্তার বোধ নাই। যেমন মন পড়ায় নিবিষ্ট হলে তখন মশাতে রক্ত খেয়ে লাল হয়ে গেলেও বোধ নাই। অথবা তাঁর শরণাগত ভক্তের যেখানে খাঁড়ার ঘা খাওয়ার কথা ছিল, সেখানে মাত্র একটা নরুনের আঁচড় লাগলো।

কর্ম কি যেতে চায়?—মনে থাকে। যেমন ঠাকুর বলতেন, একটা ভাঁড়ে ঘি ছিল। ঘি ফুরিয়ে গেছে। হঠাৎ ঘিয়ের দরকার। একজন বললে, নিয়ে এস ভাঁড়টা। আর একজন বললে, ওতে ঘি নেই, এনে কি হবে? অন্যজন তখন বললে, নিয়ে এসো না দেখি। ভাঁড়টা আনবার পর তাকে রোদে দেওয়া হলো। তখন দেখা গেল, তা'তে আধপো'-টাক ঘি বেরিয়েছে। তেমনি কর্ম লুকিয়ে থাকে মনে। যাবৎ শরীর তাবৎ কর্ম।

(একজন সাধুর প্রতি)—বনে চলে গেলেও সেখানে একটা নূতন রাজ্য গড়ে উঠবে (সকলের হাস্য)। কর্মত্যাগ মানে নিশ্বাস বন্ধ

হয়ে যাওয়া—সমাধিস্থ হওয়া। সে অবস্থায়, 'কেবলং শারীরং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং।'

স্বামীজী ওদেশে (ওয়েস্টে) লেকচার দিয়েছিলেন, কর্মযোগের। তাকেই বলা হয় practical Vedanta (জীবনে বেদান্ত)। ওদেশের লোক খুব রাজসিক, তাই এখানেও আছে অনেক ঐরূপ। সকলের জন্য এক পথ নয়। আবার ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগের লেকচারও দিয়েছেন। যার যেমন সংস্কার সে তাই নেবে।

'কর্ম'—এটা একটা generic term (সাধারণ কথা)। In the bigger genus (ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে) কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ—সবই কর্ম।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী নির্বেদানন্দের প্রতি)—স্বামীজী স্তবগুলিতে ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, 'খণ্ডন-ভববন্ধন-জগবন্দন বন্দি তোমায়।' আবার বলেছেন, 'যুগ ঈশ্বর জগদীশ্বর'। আজ সারা ভারতে এই স্তব পাঠ হচ্ছে। ভারতের বাইরেও হচ্ছে।

ক্রাইস্ট বলেছিলেন, মানুষের উপর ভরসা করো না, কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপর ভরসা কর। মানুষ দুর্বল—'Do not lean on a broken reed for such is man.'

অবতারকে বোঝা বড়ই কঠিন কাজ—একেবারে দুর্বোধ্য; তিনি বোঝালে তবে বুঝতে পারে।

পণ্ডিতদের কর্ম নয় বোঝা। তাঁরা বই পড়ে বলতে পারেন, এই এই থাকলে অবতার। কিন্তু অবতার সামনে এসে দাঁড়ালেও তাঁরা বুঝতে পারবেন না যে তিনি অবতার। সার্বভৌম অতবড় পণ্ডিত, বুঝতে পারলেন না চৈতন্যদেবকে। পরে তিনি কৃপা করে ধরা দিলে তখন স্তব করলেন অবতার বলে। তার পূর্বে সার্বভৌম বলেছিলেন, তুমি সন্ন্যাসী—বেদান্ত পড়। বেদান্ত পড়া সন্ন্যাসীর ধর্ম। সার্বভৌমের নিকট বেদান্ত পাঠ স্বীকার করলেন। ঐ বেদান্ত পড়াবার

সময়ই সার্বভৌম কৃপা লাভ করলেন। বুঝলেন, এ ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নন—ভগবান অবতীর্ণ এই শরীরে।

ঠাকুর নিজেকে কত ভাবে ধরা দিয়েছেন, তবুও ধরতে পারে না। তাই এক একবার বলতেন, কা'কেই বা বলি, কেই বা শোনে। কখনও বলতেন, অচিন গাছ আছে এক রকম। তাকে চিনতে পারে না মানুষ। কখনও বলতেন, 'সে যে দীন হীন কাঙ্গালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘবে। ও তোরা তাকে চিনলি না বে।' কে চিনতে পারে তাঁকে—যাঁব মুখে নিশিদিন বেদ।

আমরা যা বলি তা এক ঘটি—ঠাকুব অনন্ত সাগব। তাঁর কথা বলে শেষ হয় না। অনন্ত পুরুষ, বেদপুরুষ। তবে তাঁব কথামৃতের, এই সাগরের এক কণা খেলেও অমর।

ঠাকুর মহেন্দ্র সরকারকে বলেছিলেন, তোমাদের সায়েন্সে কি আছে? এই এই হলে এই এই হয়, না? এব পর এই, ওর পর এই, না? (যুবকের প্রতি) অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন—এদের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস হলে জলের জন্ম হয়। 'লজিকে' এই cause and effect-এব, কার্য-কারণ ভাবের, কথা আছে। সায়েন্সে discovery (আবিষ্কার) নির্ভর করে 'লজিকে'র double method of agreement and difference-এর (অন্বয় ব্যতিরেক ন্যায়ের) উপর।

(সকলের প্রতি)—ঠাকুরের দু' একটা কথা ফাঁক দিয়ে বের হয়ে ওদেশে গেছে। তা পেয়েই ওদের কত আনন্দ। এখন ওরা ভাবে, Unification-এর (প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনের) আশা আছে।

'মত পথ'—এটি ঠাকুরের মহাবাক্য। এর মানে, সব পথ দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি। এ মহাবাক্যটি তিনি বলেছেন সব পথ ধরে সাধন করে একই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে। এটি তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তা হলে মূলে আর কোনও বিরোধ রইল না। সবই ব্রাদার্স—সবই

ভাই ভাই, এক পিতার সন্তান। ঠাকুরের এই মত দিয়ে ভবিষ্যতে জগতে unification (মিলন) হবে।

২

এদিকে তো এই বললেন, কিন্তু সাধকের পক্ষে কি কড়া নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন! যে ভগবানকে চায় এমন ভক্তকে কি বলছেন, শুনুন। বলছেন, স্ত্রীলোক থেকে সর্বদা সাবধান। স্ত্রী ভক্তকে আবার বলছেন, পুরুষ থেকে সাবধান। কেন বলছেন একথা? না, যদি লোক এই বিচার করে বসে—যখন সব একই ঈশ্বরের সন্তান, যখন সকলেই ভাই ভাই, কি ভাই বোন—তখন আর কি—চালাও অবাধ মেলামেশা। ভাই বোনে হালুচালু কর। তাতে ফল বড় খারাপ হবে। তাই বললেন, সাধকের অবস্থায় খুব সাবধান।

এ কি আর রেগে বলেছেন, তা নয়—ভালবেসে বলেছেন। যার যা নিয়ম তা তো পালন করতে হবে। কাঁচা অবস্থায় মন কামিনী-কাঞ্চনে যায়। তাই সাবধান হতে বলেছেন। কাঁচা অবস্থায় পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, আর স্ত্রীর পক্ষে পুরুষ পতনের কারণ। সিদ্ধাবস্থায় দেখে, ব্রহ্মশক্তি জগন্মাতাই যত সব স্ত্রীপুরুষ রূপ ধারণ করেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন—সাধকের অবস্থায় পুরুষের পক্ষে স্ত্রী যেন কালসাপ, বাঘিনী, রাক্ষসী ও দাবানল। রাগদ্বেষ-প্রযুক্ত হয়ে বলেন নি এসব কথা। বস্তুর ধর্মমাত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এসব কথায়। যে বস্তুর যে ধর্ম, যাতে যা হয়, যে অবস্থায় যা হয়—তাই ভালর জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য নির্ভীক হয়ে বলেছেন। হক্ কথা অনেক সময় palatable (মুখরোচক) হয় না, তবুও লোককল্যাণের জন্য মহাপুরুষগণ বলে থাকেন।

একজন ভক্তের পরিবারের অসুখ। অল্প বয়স। ছোকরা ভক্তরা তাকে দেখতে যেতো। তারা সেবা করতো। কখনও বিছানায় বসতো। শুনে ঠাকুর খুব চিন্তিত হলেন। তারপর ভক্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ গা, এরূপ নাকি হচ্ছে? ভক্ত স্বীকার করলেন। তখন বজ্রকঠোর স্বরে বললেন, বল

আর হবে না। বার বাড়ী ভিতর বাড়ী এ ব্যবস্থা কেন হয়েছে? তুমি ভাবছো সকলই বুঝি আমার মত। কাম জয় করা আমার সাধ্য! মা (রশি টানার অভিনয় করিয়া) এমন করে টেনে রেখে দিয়েছেন।

কখনও বলতেন, এমন সব জায়গা আছে যেখানে চার বছরেও স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না—তার মানে, স্ত্রীলোক দেখাও খারাপ যারা সন্ন্যাস নিয়েছে তাদের পক্ষে। বিশেষ করে অল্প বয়সের সাধুদের পক্ষে। তাদের পক্ষে একেবারে নিষেধ।

একজন ভক্ত—'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'-এ আছে এসব কথা—'Avoid rich man, young man and woman'—ধনী, স্ত্রী ও যুবকের সঙ্গ করবে না। গ্রন্থখানা বড়ই উত্তম, আর উপদেশ অতি মূল্যবান।

শ্রীম—হাঁ। তবে ঠাকুরও বলেছেন এসব কথা। কিন্তু ইংলিশম্যানরা এ কথা নেবে না। ইংরেজীতে বললে তখন নেবে। আমরা যে সব ইংলিশম্যান! এইসব বইয়ের নাম করলে তবে আমরা নিই। এই সব বই commentary (ভাষ্য) অবতারের কথার, ঠাকুরের এক একটি মহাবাক্যের। ঠাকুর বুদ্ধি দিয়ে ঠাওরিয়ে বলেন নাই, যেমন পণ্ডিতরা বলে থাকে—এই করা উচিত, এই করা অনুচিত। জগতের যিনি কর্ত্রী সেই জগন্মাতা ব্রহ্মশক্তি ঠাকুরকে নিজে দেখিয়ে দিয়েছেন, নিজে ঠাকুরের কণ্ঠে বসে কথা কয়েছেন। তাই ঠাকুরের এই সব কথা মহাবাক্য, বেদবাক্য, অভ্রান্ত সত্য।

পুরুষ স্ত্রীকে চায়, স্ত্রী পুরুষকে চায়—এই হলো প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়ম। সমগ্র জগতে এই রীতি। পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, সকলের ভিতর এই ভাব। এরই নাম সংসার। এই প্রাকৃতিক নিয়ম, এই স্ত্রী-পুরুষের দুর্দমনীয় আকর্ষণ ছাড়িয়ে নিয়ে সমস্ত মনটা ঈশ্বরে নিবিষ্ট করতে পারলে তাঁর কৃপায় তখন তাঁর দর্শনলাভে মানুষ ধন্য হয়। এটিই মানুষের চরম অবস্থা—এই শাশ্বত আনন্দময় ভাব।

যাদের মন নীচে রয়েছে সংসারভোগে, তারা সম্পূর্ণ মনটা দিয়ে বিষয় ভোগ করছে। যাদের এ ভোগ শেষ হয়ে গেছে, তারা বুঝেছে এতে নিত্যানন্দ লাভ হয় না। যারা সেই পরমানন্দ নিত্যানন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল, তাদের সাধুসঙ্গ লাভ হয় আপনিই। তখন সর্বদা খুঁজে বেড়ায় কোথায় ঈশ্বরীয় লোক, কোথায় তাঁর কথা, চিন্তা, তপস্যা, সেবা হচ্ছে নিষ্কামভাবে। তাদের লোকসঙ্গ ভাল লাগে না। তাদের তখন অবস্থা হয় লৌকিক চক্ষে জীবন্মৃতের মত। ঠাকুর বলতেন তাই—মানুষ, যারা জ্যান্তে মড়া। সেই অবস্থায় সংসার পাতকুয়োর মত মনে হয়, আর আত্মীয়স্বজন যেন কালসাপ। এই অবস্থা লক্ষ্য করেই বলেছিলেন, কাশীর দিকে যত এগুবে, কলকাতা থেকে তত দূরে যাবে।

ঠাকুর এই সব universal truth-এর (সার্বজনীন সত্যের) কথা যে বলেছেন এতে কারো উপর কোন আক্ষেপ নেই—মাত্র এটা একটা statement of fact (সত্যের বর্ণনা)। বস্তুব দোষ-গুণ বিচার করে ভক্তদের পথের সন্ধান বলে দিয়েছেন—কি কি বিঘ্ন আছে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

ঐ যে বললেন ইনি, avoid rich man (ধনবানের সঙ্গ পরিত্যাগ কর)—কেন? না, ধনীর সঙ্গ করলে টাকাকড়িতে মন যায়। সে যা চায় সেই জিনিসে ভালবাসা হবে। যে মন ভগবানে দেবে সে মন বাঁধা পড়ে যায় হীন বস্তুতে। তাই ধনীর সঙ্গ ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। চৈতন্যদেব সেই জন্য প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে চান নাই। পরে দেখা হয়েছিল। তখন 'স্বাধীন শক্তিশালী রাজা আমি'—এ অভিমান ছিল না। অভিমান ছিল দীন হীন কৃষ্ণদাসের। রথাগ্রে ঝাড়ুহস্তে পুরীর রাস্তা পরিষ্কার করছিলেন আর চন্দন জল ছিটিয়ে রথের পথ শুদ্ধ করছিলেন, আর মুখে ছিল গোপীগীতা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

তখন চৈতন্যদেব সমাধিস্থ অবস্থায় গিয়ে আলিঙ্গন করেন। টাকাকড়িতে মন গেলে কের্‌মে (ক্রমে) এর সহচরটি—কামিনী এসে হাজির হবে।

আর young man (যুবক) অনিত্য আলাপ করে কি না, তাই তাদের সঙ্গও ত্যাজ্য। ঠাকুর এক একবার গল্প করে খুব হাসাতেন ভক্তদের।• একদিন বললেন, ওরা (যুবকরা) কিরূপ গল্প করে শুনবে?—হাঁ ভাই, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তখন খুব জল হল। সব জলে জলময়। আর তখন আমি কি দেখলুম জানিস—ঐ পাশের নর্দমায় ইলিশ মাছগুলো কিলবিল করছে (সকলের হাস্য)।

ঠাকুব অপরের কথা, ভাবভঙ্গী, আচরণ সব নিখুঁতভাবে copy (অনুকরণ) করতেন। তখন মনে হতো যেন তিনিও তাই হয়ে গেছেন। সর্বদা ঈশ্বরীয় কথা শুনলে ভক্তদের ভাল লাগবে কেন, তাই নানা রকমের রসান দিতেন। এই করে মনটা উপরে তুলে দিতেন। তখন আর যায় কোথা! বাধ্য হয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করতে হয়। Wit and humour (রঙ্গ-রগড়)ও দরকার প্রথম অবস্থায়। এ যেন চাট্‌নী। খাবারের মাঝে মাঝে একটু একটু মুখে দিলে খাবারে রুচি হয়। এ সব ছিল তাঁর divine tact (দৈবী কৌশল)।

বিনয়ের প্রবেশ।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—কেশব সেন টাউন হলে লেকচার দিচ্ছেন। বহু লোক—ঘর পরিপূর্ণ। আমরাও শুনতে গেছি। তখন স্কুলে পড়াশোনা করছি। সভা যখন ভাঙ্গলো তখন লোকগুলি অনেকগুলি গ্রূপে বিভক্ত—কথাবার্তা কইছে। আমরা তখন জিজ্ঞেস করলাম একটা গ্রূপে—মশায়, উনি কি বললেন আজ বক্তৃতায়? ওরা উৎসাহের সহিত উত্তর করলো, বেশ বলেছেন, কিন্তু কি বলেছেন তা মনে নাই (সকলের উচ্চহাস্য)।

আমরা তখন কেশব সেনকে ভালবাসতাম। তাঁকে দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হতো। উনি যেখানে যেতেন আমরাও দেখতে যেতাম।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—কিন্তু অবতার যখন কথা ক'ন তখন প্রতিটি কথা গিয়ে হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে থাকে। বালক ক্রাইস্টের কথা শুনে বড় বড় পণ্ডিতগণ স্তম্ভিত হয়ে গিছলো। তখন বলতো, 'Never man spake like this man' (এমন কথা কারো কাছে কখনও শুনিনি।) অন্য লোক কথা কইলে তখন লোক হাততালি দিয়ে বলে, What a splendid orator' (কি অদ্ভুত বক্তা) ! কিন্তু ডিমস্থেনিসের কথা শুনে লোক সব দাঁড়িয়ে পড়লো আর বলতে লাগলো, Let us march against Phillips.* (চল সব, গিয়ে ফিলিপের গতিরোধ করি।)

ঠাকুরের কথা সব আসছে মহাকারণ থেকে, তাই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ভেদ করে মানুষের মনকে একেবারে মহাকারণে নিয়ে যায়। জগৎ ভুল করিয়ে দেয় ঐ কথা। পরমানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় অজ্ঞাতে ঐ কথা শুনে। তাই শোকতাপ ভুলে যায় লোক। ভগবানের কথার এইরূপ মনপ্রাণ-ভোলান মাদকতা, এই জগৎ-ভোলান আকর্ষণ !

* এখানে সিসারো আর ডিমস্থেনিসের কথা বলিতেছেন :

(১) মার্কাস টুলিয়াস সিসারোর আবির্ভাব-কাল খ্রীঃ পূঃ ১০৬-৪৩। তিনি রোমের একজন বিশিষ্ট বক্তা ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন। সিজারের মৃত্যুর পর তিনি সিনেটে 'লিডার' হয়েছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষ দ্বারা নিহত হন।

(২) ডিমস্থেনিস্ ছিলেন গ্রীসের দেশপ্রেমিক বক্তা। তাঁহার আবির্ভাব-কাল খ্রীঃ পূঃ ৩৮৩-৩২২। প্রথমে তিনি তোত্‌লা ছিলেন। তাহার পর বহু চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা মনপ্রাণ হরণকারী, স্বদেশপ্রেম-উদ্দীপনকারী বক্তা হন। মুখে পাথরের টুকরা রাখিয়া, আর মাথার উপর একটা উন্মুক্ত কৃপাণ ঝুলাইয়া নিষ্প্রয়োজনীয় অঙ্গসঞ্চালনকে দমন করিয়া সমুদ্রতীরে নির্জন স্থানে তিনি বক্তৃতা অভ্যাস করিতেন। তাঁহার সম্মুখে থাকিত একটা বড় আয়না। সিসারো বলিতেন, ইনি সপ্রেম বাক্‌বিন্যাসে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এক অলৌকিক প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতাগণ উদ্‌বুদ্ধ হইয়া মেসিডোনিয়ার ফিলিপস্ এথেন্স নগরী আক্রমণ করিলে অস্ত্র ধারণ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাত্রি সাড়ে দশটা। ভক্তগণ বিদায় লইলেন যেন অনিচ্ছায় নির্বাক হইয়া। জগবন্ধু, বিনয় প্রভৃতি এইখানেই থাকেন।

মর্টন স্কুল, ৫০ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা
২৪শে মে, ১৯২৪, ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১
শনিবার, কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ২৪।১ পল

চতুর্দশ অধ্যায়

সিংহের গর্তে মিলে গজমুক্তা

১

আজ জগন্নাথের স্নানযাত্রা। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের এই দিনে ৺দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির ভক্তি ও বদান্যতায়। এই শুভ দিনেই বালক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শকরূপে প্রথম এই মন্দিরে প্রবেশ করেন। তারপর সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই স্থানেই অবতার-লীলাভিনয় করেন।

প্রভাত হইতে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতিতে নিমগ্ন। আনন্দময় ভাব—সহাস্য বদনে মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া ভক্তদের সহিত আজের দিনসূচীর আলোচনা করিতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, আজ ভক্তরা নানা তীর্থে যাচ্ছেন। কেউ যাচ্ছেন গঙ্গাস্নানে, কেউ বেলুড় মঠে, কেউ কালীঘাটে, কেউ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। আজের দিনে ৺দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাওয়া খুব ভাগ্যের কথা! প্রথম এই দিনে ওখানে তিনি পদার্পণ করেন কিনা! তারপর ক্রমান্বয়ে ত্রিশ বছর ওখানেই থেকে অবতারলীলার প্রকাশ করেন। বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ভগবান স্বয়ং লীলা প্রকাশের জন্য অবতীর্ণ হবেন, তাই পূর্ব থেকে রাণী রাসমণির ভিতর প্রেরণা দিয়ে এই মহাপীঠ নির্মাণ করিয়েছেন। যান, আপনারা আজের দিনে খুব আনন্দ করুন।

হাঁ, আজের দিনে ৺পুরীতেও খুব ধুম—জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। আমাদের বন্ধুগণ কেউ কেউ গিয়েছেন তো ওখানে। দেখুন, ভগবানই এইসব ব্যবস্থা করে রেখেছেন পূর্ব থেকে—সংসারজ্বালায় জ্বলে পুড়ে ঐ সব স্থানে গিয়ে জুড়াবে বলে।

আজ ১৭ই জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ৩রা আষাঢ় ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার, পূর্ণিমা ১৪।৩৪ পল।

মুকুন্দের প্রবেশ—সঙ্গে শচী ও সত্যবান। তাহারা একটা প্রকাণ্ড তরমুজ শ্রীমকে দিল। ঢাকা হইতে আনিয়াছে। ওখানে মুকুন্দের জন্মভূমি। ইনি রামপুরহাট হাই স্কুলের রেক্টর আর উহারা ছাত্র। ছেলেদের সঙ্গে শ্রীম আনন্দে কথা কহিতেছেন—তোমরা খুব বাহাদুর বটে, পদ্মা পার হয়ে এসেছো। শুনাও না পদ্মার গল্প। ঠাকুর পদ্মা দেখতে চেয়েছিলেন।

বিনয় শ্রীমর বালিশের ওয়াড়টা সেলাই করিতেছেন। তারপর ঐ ওয়াড়, বিছানার চাদর, ধুতি, মশারী সব লইয়া পরিষ্কার করিবার জন্য কাশীপুর ডাক্তার বক্সীর বাড়ী চলিয়া গেলেন।

জগবন্ধুকে শ্রীম কোন কাজে বেলেঘাটা পাঠাইয়া দিলেন। মণি, ছোট জিতেন প্রভৃতি বসিয়া রহিলেন।

এখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আসর জমিয়াছে চারতলার ছাদে। আজ স্নানযাত্রা বলিয়া বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বিক্রমপুরের ভক্ত, ভৌমিক, বিনয়, ডাক্তার, গদাধর, উকীল ললিত, বলাই, শচীনন্দন প্রভৃতি। জগবন্ধু গাড়ী করিয়া পূর্বেই বেলেঘাটা থেকে ফিরিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শুকলাল ও মনোরঞ্জন।

আজ একটি নূতন ছোকরা ভক্ত আসিয়াছে। বয়স সতের, স্টুডেণ্টস্ হোমে সম্প্রতি যোগদান করিয়াছে। আই. এস-সি পড়ে। খুলনা জেলায় বাড়ী। ছেলেটি বড়ই ভক্তিমান ও মধুর-স্বভাব। নাম বিমল। আজ শ্রীমকে তাহার প্রথম দর্শন।

শ্রীম (বিমলের প্রতি)—হাঁ বিমলবাবু, একটা গান শুনিয়ে দাও না ভক্তদের।

বিমল—একটি কবিতা বলি?

শ্রীম (আগ্রহে)—তাই শুনাও।

বিমল আবৃত্তি করিল—

আমার এত কাছে কাছে হৃদয়েরি মাঝে
রয়েছ তুমি তো হরি,
মনে ভাবি আমি, কতদূরে তুমি
রয়েছ আমারে পাশরি।
যেমন কি ফুল ফুটেছে কোন্ বনমাঝে
না জানিয়া অলি ধায়,
তেমনি না জেনে না শুনে ব্যাকুল তোমার পানে
প্রাণ কোথা যেতে চায়।
যেমন নিজ নাভি গন্ধে মত্ত হয়ে মৃগ
করে গন্ধ অন্বেষণ,
তেমনি বুকে ধরে ব্যাকুল তোমার তরে
ঘুরে বেড়াই ভবধাম।
যেমন ছায়াবাজি করে কত খেলা
আড়ালে লুকায়ে থেকে,
তেমনি আমাদের লয়ে লীলায় মত্ত হয়ে
নিজেরে রেখেছ ঢেকে।
যেমন আলোর সাগরে অন্ধ স্নান করে
আলোক বুঝিতে নারে,
তেমনি তোমাতে থাকিয়া তোমাতে ডুবিয়া
বুঝিতে নারিনু তোমারে।
যদি দুটি আঁখি দিলে কেন নাহি দেখা দিলে—
দেখা দেও, দেখা দেও,
যদি দুটি বাহু দিলে কেন নাহি ধরা দিলে—
ধরা দেও, ধরা দেও।

শ্রীম—বা, বা, কি সুন্দর! চমৎকার! (বিমলের প্রতি) আমরাও

তোমাকে একটি গান শুনিয়ে দিচ্ছি শব্দব্রহ্মের। বাঁশের বাঁশির শব্দ শুনে গোপীগণ ঐ দিকে ছুটে চললেন।

গান। বাজিল শ্যামের মোহন বেণু,
বেণু রব শুনে জুড়াল তনু।
যে বনে বাজিছে সেই বনে যাই,
এ ছার জীবনে কাজ নাহি আর'।
শুনে বাঁশির তান চমকে উঠে প্রাণ,
'রাধা রাধা' বলে বাঁশি তুকূল মজায়।

শ্রীম চণ্ডীদাসের আর একটি পদগান গাহিলেন বাঁশির সম্বন্ধে।

বিমলের মনের ভাবটি দেখিয়া শ্রীম বড় প্রসন্ন। তাই তার মনে গোপীপ্রেমের মধুর ভাবটি তুইটি গান গাহিয়া অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

শ্রীগুরুর নিকট লব্ধ শ্রীমর নীতিই এই। নূতন ভক্ত আসিলে, গান, কবিতা, গল্প, স্তব-স্তুতি শুনিয়া তাহার অন্তরের ভাবটি বুঝিয়া লন। তারপর ঐটি ধরিয়া তাহার শিক্ষা চলে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি। গোপীদের কত কাজ, কিন্তু মনটি পড়ে আছে ঐ বাঁশির তানে। যেমনি গোপী, তেমনি কৃষ্ণ। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—মনটি পড়ে আছে ঈশ্বরে, স্বরূপে। সারাদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। আবার রাত্রিতে Council of War-এ কার্যপন্থা ঠিক করছেন, কিন্তু মনটি পড়ে আছে স্বরূপে। তবেই তো 'গীতা' বলা সম্ভব হয়েছিল। অন্তরঙ্গরা কেউ কেউ চিনতো। অন্যরা চিনতো না। উত্তরার গর্ভনাশ করবার জন্য, অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র মারলো। উত্তরা ব্যাকুল হয়ে স্তব করতে লাগলো—'রক্ষ, রক্ষ মহাযোগিন্'। উত্তরা, অভিমন্যু—বয়স কম হলেও তাঁকে জানতো। তাই বললো, 'মহাযোগিন্'।

যে ছাদে উঠেছে সেই কাজ করতে পারে আবার সঙ্গে সঙ্গে মনও স্ব-স্বরূপে রাখতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তা পেরেছিলেন।

কাজ ফুরোয় না—একটার পর আর একটা আসে। মনে হয়,

এইবার অবসর নিয়ে বসে বসে কেবল ঈশ্বরকে ডাকবো। আবার যেই একটা কাজ হয়ে গেল, অমনি নূতন আর একটা এসে পড়লো। কাজের শেষ নাই। এ কেমন? না, যেমন ধোপা মনে করে এ কাপড়খানা হয়ে গেলেই বসে জল খাব। এখানা হয়ে গেল, আর একখানা নিল, তারপর আর একখানা। হয়তো এর মধ্যেই সাপে কামড়িয়ে দিল। আর জল খাওয়া হলো না। তেমনি, কাজ শেষ হয় না।

এই দেখ না, অমুকবাবু তিন লাখ টাকা পাবে বলে অমনি দে ছুট্। পেনশান আছে মোটা, আবার ছেলেরা লায়েক, তবুও অর্থের লোভ ছাড়তে পারলো না। এখন তিন লাখ পাবে তারপর যাবে দশলাখের জন্য। এদিকে মুখে বলছে, 'না, না'; কিন্তু হাতের কাছে টাকা পড়লে লোভ সামলাতে পারে নাই। তখন বলছে, তোমরা যখন অত করে বলছো, যাব। পার্টি ভাল তো?

মহামায়া কি জাগতে দেন? তাই শরণাগত শরণাগত—সর্বদা এই প্রার্থনা করতে হয়। যে মহামায়াকে জেনেছে তাকে তিনি ভয় দেখান না। যেমন একটি ছেলে, বাঘের মুখোস পরে অন্য ছেলেদের সামনে এসে হাজির হলো। ভয়ে সকলে চীৎকার করে পালিয়ে গেল। কেবল একজন গেল না। সে চিনতে পেরেছে। বললে, 'ওরে হরে, তুই মুখোশ পরেছিস্!' তার আর ভয় নাই। তেমনি যে মহামায়াকে জেনেছে তাকে আর তিনি ভয় দেখান না।

২

শান্তির প্রবেশ। শান্তি ক্যাম্বেল স্কুলে ডাক্তারি পড়ে—মর্টনের পুরাতন ছাত্র। শ্রীমর কাছে মাঝে মাঝে আসে। আজ সে মঠে গিয়াছিল। মঠের ফেরৎ আসিয়া অপরাহ্নে শ্রীমকে সকল বিবরণ বলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর আবার আসিয়াছে। শ্রীম সাধুসঙ্গে তাহার উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন।

শ্রীম (শান্তিকে লক্ষ্য করিয়া সকলের প্রতি)—আহা, আজ এর খুব দিন গেছে। কোথায় গিছলো জানেন? মঠে। এই

দেখুন না, আমাদেরই ফ্রেণ্ডরা গেলেও আমাদেরই যাওয়া হয়—মঠের সঙ্গে touch (সম্বন্ধ) থাকে। বুড়ো হয়েছি, তাই সর্বদা যেতে পারি না। এরা এসে সব বলে। এতে আমাদেরও যাওয়ার কাজ হয়ে যায়। এসে বলে, অমুক মহারাজ শাস্ত্র পাঠ করছিলেন, অমুক ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসে ধ্যান করছিলেন, অমুক পূজো করছিলেন। আমরা এখানে বসেই সেই সব দৃশ্য দেখতে পাই। এ সব শুনতে ভাল লাগবে না তো কি ভাল লাগবে? অন্য লোকের কাছে গেলে এসব শুনতে পাবে? যাও না, দেখবে সব অনিত্যের কথা কইছে। আর এঁরা, মঠের সাধুরা সব সময়েই highest ideal-এর (উচ্চতম আদর্শের) কথা কইছেন। ইনি আবার আজ দেখে এসেছেন, দু'জন সাধু বসে শাস্ত্র বিচার করছেন। একজন সাধু বলছেন, ঈশ্বরই সব করেন। মানুষ যন্ত্র মাত্র। সাধন-ভজনও তিনিই করান। তাঁর শরণাগত হয়ে বসে থাক। আর একজন প্রতিবাদ করে বলছেন—বল কি, সাধন-ভজন না করলে তাঁর কৃপাই হবে না। সাধন-ভজন, পুরুষকার চাই। দেখুন, দু'জনেই highest ideal-এর (উচ্চতম আদর্শের) সঙ্গে touch (সম্বন্ধে) রেখে কথা কইছেন। কোথায় পাবে এ চিজ্?

এসব কথা যত ভাল লাগবে ওদিক, অর্থাৎ বিষয় থেকে মন তত উঠে আসবে। যেমন ঢেঁকি—এক দিক যত উঠবে অপর দিক তত নামবে। Parenthetically (ফাঁকে ফাঁকে) একটু ডাকলুম তা'তে হবে না। Parenthetically মানে, within bracket (দু'টি বন্ধনীর মধ্যে), অর্থাৎ সারা দিন অন্য কাজ, অন্য কথা কয়ে কাটান, আর এরই মধ্যে ফাঁক করে একটু চোখ বোঁজা। এতে হবে না। উঠে পড়ে লাগতে হয়।

শ্রীম (একজন যুবকের প্রতি)—একজনের এগারটি সন্তান। আবার বিয়ের ইচ্ছা হয়েছে। তারপরই one fine morning (এক শুভ প্রভাতে) ফিরে এলো বিয়ে করে। জিজ্ঞাসা করায় বললে, কি করি ভাই, মা এমন করে ধরলেন যে, না করে আর

পাবলুম্ না (সকলের হাস্য)। তেমনি অনেকেরই নিজেব ইচ্ছা আছে বিয়ে করতে কিন্তু নাম কবে অপবেব (শ্রীমর দৃষ্টি শচী ও শান্তিব উপর)।

শ্রীমর ইচ্ছা নয় এবা এত শীঘ্র বিবাহ কবে। শচীকে সর্বদা বলেন, বিবাহ না কবলে মুক্ত জীবন। তাহাকে অধ্যযনে নিযুক্ত কবিতে চেষ্টা কবিতেছেন। নিজেও পড়ান। ছোট বমেশকেও মাঝে মাঝে এই সব কথা বলেন।

রঙ্গবসেব ভিতব দিয়া যুবকদেব শিক্ষা চলিতেছে।

শ্রীম (স্মিতহাস্যে, শান্তিকে লক্ষ্য কবিয়া ভক্তদের প্রতি)—আহা, ইনি আজ কি কাজই কবেছেন! বলতে নেই ওসব কথা সামনে, পাছে অহংকাব হয়। আজ মঠে গিযে ইনি তবুকাব। কুটেছেন। আবাব একজন সাধু তাকে বললেন, পাতাগুলি গরুকে দিতে হয়। তা আলাদা ভাগ কবে দিও। তিনিও তাই করলেন, যাতে সব গরুই খেতে পায়। আবও মজা আছে। (মিহি মধুব কণ্ঠে ধীব গাম্ভীর্যে) ইনি সাধুকে ঠাকুবেব কথা পডে শুনিয়েছেন (দ্রুত কণ্ঠে—নয়নহাস্যে) পডতো গা। এঁদেব শুনিযে দাও তো ওটা।।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা।

শান্তি কথামৃত প্রথম ভাগ চতুর্থ খণ্ড পড়িতেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্তসঙ্গে শ্রীবামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

একটি ছেলে, নাম বিষ্ণু—গলায় ক্ষুব দিয়া শরীব ত্যাগ কবিয়াছে। সেখানে পড়া চলিতেছে। ভক্তবা বিচার কবিতেছেন ইহা আত্মহত্যা কি না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর নিজমুখে বলছেন, জ্ঞানলাভের পর কেউ কেউ শরীর ত্যাগ কবে। বিষ্ণুব শেষ জন্ম, ঠাকুর বলছেন। তাহলে আর আত্মহত্যা কি করে হবে? আত্মহত্যা করা মহাপাপ, ঠাকুর বলছেন।

একজন ভক্ত—উপনিষদে আছে, জ্ঞানের পর চার প্রকারে শরীর ত্যাগ করে। এতে আত্মহত্যা হয় না। অনশন, জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, আর মহাপ্রস্থান—এই চার প্রকার ভৃগুপতনের কথাও শোনা যায়—পাহাড় বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে দেহত্যাগ করে।

একজন ভক্ত—আচ্ছা, জ্ঞানী তো দুই প্রকার, অপরোক্ষ জ্ঞানী আর পরোক্ষ জ্ঞানী। ঈশ্বর যাঁর সম্মুখে এসে দর্শন দেন তিনি অপরোক্ষ জ্ঞানী, আর পরোক্ষ যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অনুভব হয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে। ঠাকুর বলেছেন বোধে বোধ হওয়া। এখানে কোন্ জ্ঞানী ?

শ্রীম—উভয় প্রকাব জ্ঞানীই। অপরোক্ষ জ্ঞানী বিধি-নিষেধের পার। তার সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। ঠাকুর স্পষ্ট করে বলেছেন, তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। কাজেই উপনিষদের ঐ বচন পরোক্ষ জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষ করে প্রযোজ্য।

ঠাকুর বলছেন, ভক্তিযোগ যুগধর্ম। কেন? অহংকার যায় না কি না। আবার, কলিকাল—অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, বেশী কঠিন তপস্যা চলে না। তাই ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগে অহংকারকে ঈশ্বরের দাস, পুত্র ইত্যাদি রং-এ রঙ্গিয়ে নেয়। এটা সহজ।

ঈশ্বরদর্শন একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হয়, ঠাকুর বলেছেন। বেদেও আছে 'যমেব এষ বৃণুতে তেন লভ্য।' জ্ঞানযোগ দিয়েও দর্শন হয়, কিন্তু বড় কঠিন। বিশেষ করে সংসারী লোকের পক্ষে নয়। ভক্তিযোগে দর্শন সহজ। পাকাভক্তি, প্রেমাভক্তি হলে দর্শন হয়।

শ্রীমর নৈশ আহার লইয়া ভৃত্য আসিয়াছে। অন্তেবাসী হ্যারিকেন লইয়া ঘরে গেলেন। আহার রাখিয়া দশ মিনিট পরে আসিয়া শুনিলেন, শ্রীম কথা বলিতেছেন।

শ্রীম—অনুরাগে তাঁকে লাভ হয়। তাই ব্রাহ্ম সমাজের গানে আছে, 'প্রভু বিনে অনুরাগ করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা'। অনুরাগে কেনা হয়ে যান ভগবান। ভালবাসায় তাঁকে লাভ খুব

শীগ্‌গীর হয়। ঠাকুর বলতেন, কেমন জান? যেমন গরুকে খড় দেওয়া হয়েছে। শুকনো খড়—তাই আস্তে আস্তে চিবুচ্ছে। কিন্তু যেই খইল মেখে দেওয়া হল অমনি গব্‌ গব্‌ করে খেতে লাগলো (সকলের হাস্য)। তেমনি ভালবাসা তাঁর অতি প্রিয়। তা'তে শীঘ্র ধরা দেন। অনুরাগ নাই—তা'তে হাজার বই-ই পড়, আর শ্লোকই ঝাড়, কিংবা নেংটা হয়ে রোদে বসেই থাক, কিছুতেই কিছু হবে না। অনুরাগ ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি।

বিজয়বাবুকে কত ভালবাসতেন। তাই তাঁর অনুকূল পথটি বলে দিলেন—প্রেমাভক্তি। তাঁ'তে অনুরাগ হয় না কেন, তার কারণও বললেন—কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি। তিনি শেষের দিকে পুরীতে ছিলেন—পুরীতেই দেহ যায়।

৩

মর্টন স্কুলের দ্বিতলে বারান্দায় শ্রীম বসিয়া আছেন বেঞ্চিতে, দক্ষিণাস্য। শ্রীমর ডানে ও বামে বসা ভক্তগণ—শচী, শান্তি, গদাধর, ছোট জিতেন, জগবন্ধু, বিনয় প্রভৃতি। এখন সকাল সাড়ে আটটা, গ্রীষ্মকাল।

এখন গ্রীষ্মের ছুটি। তাই সম্মুখের ঘরটিকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র দ্বিতলটি একটি আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। অন্তেবাসী স্কুলেই থাকেন। ভক্তগণ—শচী, গদাধব প্রভৃতি তাহার সহিত ভোজন করেন।

কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সকল ধর্মমন্দিরে কি ভাবে ভগবদুপাসনা হয়, শ্রীমর ইচ্ছা এক সঙ্গে সব দেখেন। তাহা তো সম্ভব নয়, তাই ভক্তদের পাঠাইয়া সকল সংবাদ লইয়া থাকেন।

আজ বুধবার আদি ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা। মোটা সুধীরের উপর ওখানে যাইবার ভার। আজ আবার শান্তিকে পাঠাইতেছেন। অন্তেবাসীকেও বলিলেন, আপনি যাচ্ছেন তো আদি সমাজে? অন্তেবাসী বলিলেন, আজ্ঞে না, আমায় যেতে হবে অন্যত্র, নবদ্বীপবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ইনি ৺পুরী থেকে ফিরে এসেছেন কয়েক মাস পরে। আমি তাঁরই সঙ্গে পুরী গিছলাম।

পাটনা হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। ইনি সুন্দরবনে কাজ করেন। কয়েক দিন হয় কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে রহিয়াছেন।

শ্রীম (সুন্দরবনের ভক্তের প্রতি)—আপনি kindly (দয়া করিয়া) একটি কাজ করবেন। দ্বারকাদাস বাবাজী আপানাদেরই কাছে একটি বাগানে অসুস্থ হয়ে রয়েছেন। ইনি বৈষ্ণব সাধু। আপনি তাঁকে দর্শন করে তিনি কেমন আছেন একটা কার্ডে লিখে ডাকে ফেলে দিবেন। আমরা আপনাকে একখানা কার্ড দিচ্ছি।

অন্তেবাসী চার তলার ঘরের চাবি চাহিলেন কার্ড আনিতে। কিন্তু মুচকি হাসিয়া শ্রীম বলিলেন, না। (শান্তিকে দেখাইয়া) ইনি আনবেন। দেখবো ইনি কেমন intelligent (বুদ্ধিমান)।

ছোট জিতেন প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন—আফিসে যাইবেন।

শ্রীম কার্ডের উপর নিজের ঠিকানা লিখিয়া দিলেন অন্তেবাসীর ডায়েরী লেখার কপিইং পেন্সিলে। আর ভিতরে কার্ডের শিরোদেশে লিখিলেন, শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভয়সা।

শ্রীমও ঠাকুরের মত ভক্তদের দিয়া ছোটখাট সেবার কার্য করাইয়া নেন। ভক্তগণ এই সব স্মরণ করিয়া পরে শান্তি পাইবেন।

শ্রীম (সুন্দরবনের ভক্তের প্রতি)—এই নিন্ কার্ড। আমার হাতের লেখাটা ওঁকে দেখাবেন। তারপর ওঁর সংবাদ লিখে ডাকে ছেড়ে দিবেন।

এই সাধুটি পূর্বে শ্রীমর মর্টন স্কুলে কর্ম করিতেন, তারপর সাধু হন। শ্রীম তাঁহার চিকিৎসার ভার ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বক্সীর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা শ্রীম ভক্তদের দ্বারা করান। ঐ পাড়ার মর্টন স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা সর্বদা সংবাদ লইয়া থাকেন।

এইমাত্র একজন সংবাদ লইয়া আসিল, শচী আই-এ পাশ করিয়াছে।

শ্রীম (আনন্দে শচীর প্রতি)—পড় পড়, বি.এ.-টা পড়—পড়া ছাড়তে নেই। যতদিন পড়া যায় ততদিনই ব্রহ্মচর্য। মঠে দেখ, কত

সব বি.এ.,এম.এ.,বি.এল্—এখন বি.এ. পাশ না হলে মঠে নেবে না। তোমার তো আর কোনও খরচা নাই, পোষ্যও কেউ নাই। একটা লোকের পড়ার খরচা হয় না সম্পত্তির আয়ে? ভাল করে ম্যানেজ করলে হয়ে যাবে। মুকুন্দবাবুকে চিঠি দাও। আমাদের কথাও বলবে—আমরা তোমায় পড়তে বলেছি। তু'মাস পর পর সাত দিনের ছুটি নিয়ে দেখে আসবে গিয়ে। কত জমি?—দেড়শো বিঘে? আচ্ছা, কত টাকা করে বিঘে? একশো টাকা করে হলেও পনের হাজার টাকা। Title deeds (দলিলাদি) আছে তো? কত টাকা rent (খাজনা) দাও?

পড়া ছেড়ো না—কষ্টেসিষ্টে পড়। (সহাস্যে) হেমেন্দ্র মহারাজকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে বলেছিলেন সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) বুঝি! তারপর ম্যাট্রিক, আই.এ, বি. এ. ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত পড়ে তবে মঠে যায়। তুমি তু'টো পাশ দিয়েছ, ভাল করে ম্যানেজ করতে পার না?

শ্রীমর ইচ্ছা শচী সংসারে প্রবেশ না করে। জমি বিক্রয় করিয়া, টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তার সুদে জীবিকা নির্বাহ করে, আর সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধনভজন, পাঠ করে। শান্তি প্রভৃতি যুবকদের বলেন, সংসার জ্বলন্ত অনল।

শ্রীম (সুন্দরবনের লোকের প্রতি)—আপনি যান না! (শচীর প্রতি) ইনি ভক্ত লোক, তোমার জমি দেখবেন।

সুন্দরবনের লোক—না, না। আমার আর কাজ করার ইচ্ছা নাই। বিয়ে করি নাই। মা বাপ নাই। বড় ভাই আছেন সংসারে। এখন ইচ্ছা, সৎসঙ্গে থাকি। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে রাত্রে থাকি। (শ্রীমর প্রতি)—আমার ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

শ্রীম—বলুন না, কি কথা।

সুন্দরবনের লোক—ঠাকুরের সময় তাঁর ভক্ত—যেমন, কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী, আর শিষ্য—যেমন, স্বামিজী—এঁদের ভেতর

যেমন শক্তির প্রকাশ দেখা যেতো এখন তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে তেমন শক্তির প্রকাশ দেখা যায় না কেন?

শ্রীম—তা আপনি কেমন করে জানলেন? ওঁরা কি ঢাক পিটাবেন এসে? হাঁ, একবার ঠাকুর বলেছিলেন•ঐ কথা। রাত্রি তখন ন'টা। আমি তখন তাঁর ঘরে বসা, দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বললেন—আচ্ছা, কেশবের ওখানে এত লোক যায়, আর এখানে এত কম কেন? একজন ভক্ত (শ্রীম) উত্তর করলেন, তেমন লোকই যায়! ঠাকুর শুনে হাসলেন। ঐ ভক্তটি ঠাকুরকে কতদূর বুঝেছেন, তা দেখবার জন্যই ঐরূপ বলেছিলেন। কেশব সেন বলেছিলেন, আপনার ষোল আনা হয়েছে। ঠাকুর শুনে বললেন—না, তোমার কথা ল'তে পারলাম না। শুকদেব, নারদ—এঁরা এসে বললে না হয় একটু বিশ্বাস হতো। তুমি টাকাকড়ি, এইসব নিয়ে রয়েছ। তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। যে যা নিয়ে থাকে, তার নিকট তেমন লোক যায়।

শক্তি তো নেপোলিয়ানেরও ছিল। সেই শক্তি আর এই শক্তি সমান? আন্তরিক ঈশ্বরকে যারা চায় তারাই ওখানে (ঠাকুরের কাছে) যায়। অন্য লোক যাবে কেন?

সুন্দরবনের লোক—আমাদের মধ্যেও কেন শক্তি হয় না? কিছুই হচ্ছে না!

শ্রীম—হাঁ, সাধুসঙ্গ করলে তবে হবে।

সুন্দরবনের লোক—বেলুড় মঠের সাধুদের উপর আগে বিশ্বাস ছিল। এখন দেখছি, তাঁরা তেমন নন্। আমার একজন ফ্রেণ্ড সন্ন্যাস নিয়ে অহংকারী হয়ে গেছে।

শ্রীম—এ expect (আশা) করা উচিত নয় যে সকলেই সিদ্ধ। সব পথে আছে। সকলেই চেষ্টা করছে। আপনি যেমন কয়জনকে দেখেছেন, এই রকম অন্যরা আছেন যাঁরা সর্বদা সাধন-ভজন করছেন। আর যাঁরা এখনও করছেন না, তাঁরাও ক্রমশঃ করবেন। একটু আগে আপনিই বললেন, ন' টাকা মণ চালে

কাঁকুড়গাছি ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। আচ্ছা ন' টাকা মণের চালে ছ' টাকা মণের চাল মিলিয়ে ছ' টাকাও ন' টাকা হয়ে যায় কিনা বলুন? তেমনি যাদের বলছেন, আপনার পছন্দ হয় না, ক্রমে তারাও highest ideal-এর (সর্বোচ্চ আদর্শের) কাছে থেকে ক্রমে উপরে উঠবে। আশ্রম কত বড়! ঠাকুর বলতেন, সিংহের গর্তে যাও, গজমুক্তা, হস্তিদন্ত, এসব পাবে। আর শেয়ালের গর্তে অন্য ক্ষুদ্র জন্তুর ল্যাজ দেখতে পাবে। তেমনি, এঁদের আশ্রম কত বড়— সর্বদা highest ideal-এর touch-এ (সংস্পর্শে) আছেন সব।

আর গুণগ্রাহী হওয়া ভাল। গুণগ্রাহী হলে শীঘ্র ওপরে ওঠা যায়। লোক ভুলে যায় যে, দোষে-গুণে মানুষ। আর একদিন আসবেন, বলে দেব কিসে সাধুসঙ্গ মিষ্টি লাগে। আপনার গুরুলাভ হয়েছে?

সুন্দরবনের লোক—আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীম—তাহলে আর কি! উনি যা বলেন তাই করতে হবে। গুরুলাভ যার হয়েছে তার নিজের কিছু করার অধিকার নাই। গুরুকে বলে তাঁর আদেশ, approval নিয়ে সব করতে হবে। যাদের গুরুলাভ হয় নাই তাদের আলাদা কথা। গুরু সাক্ষাৎ ভগবান। এ বললে চলবে না, এ গুরু আমার পছন্দ হয় না, অন্য গুরু নেব। একবার যখন গুরু গ্রহণ করা হয়েছে তখন তাঁর কথায় চলতে হবে।

এখন বেলা দশটা। সভা ভঙ্গ হইল।

মর্টন স্কুল, ৫০ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা
১৮ই জুন, ১৯২৪, ৪ঠা আষাঢ় ১৩৩১
বুধবার, প্রতিপদ ৮।৩৬ পল, কৃষ্ণপক্ষ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভজনানন্দে শ্রীম

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, গদাধর, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। জগবন্ধু স্ট্র্যাণ্ড রোড হইতে গাড়ী করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে নবদ্বীপচন্দ্র রায়চৌধুরী। ইনি পুরী হইতে ফিরিয়াছেন, দেশে যাইবেন ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। কিছুদিন পূর্বে জগবন্ধু পুরীতে গিয়া তাঁহার কাছে ছিলেন। নবদ্বীপ ভক্তলোক, শ্রীচৈতন্যের উপাসক।

আজ ১৯শে জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ৫ই আষাঢ় ১৩৩১, বৃহস্পতিবার। গ্রীষ্মের পর আজ বৃষ্টি হওয়ায় প্রকৃতি শান্ত, ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দ। শ্রীম নিজকক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে লাগিলেন। গানের পর গান চলিয়াছে—যেন গানের বান আসিয়াছে। প্রথম গাহিতেছেন মায়ের নাম।

গান। কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।

গান। মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।

গান। সুরাপান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

গান। গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।

গান। সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।

গান। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

গান। শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে।

গান। আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।

গান। আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্যি করে।

গান। মনেরই বাসনা শ্যামা শবাসনা।

গান। কে গো আমার মা কি এলি।

তারপর বৃন্দাবন-লীলার গান গাহিতেছেন।

গান। বাজিল শ্যামের বাঁশরি যমুনায়।

গান। বাঁশি বাজিল ঐ বিপিনে।

গান। নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।

গান। আমি মুক্তি দিতে কাতর নই
শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই (গো)।

গান। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।

গান। কিশোরীর প্রেমনিধি আয় প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।

গান। যশোদা নাচাতো মা বলে নীলমণি।

গান। হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর কমলাপতি।

গান। শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই।

গান। যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এলো।

এবার চৈতন্যলীলা গাহিতেছেন।

গান। গৌর নিতাই তোমরা দু' ভাই পরম দয়াল হে প্রভু।

গান। সুরধনীর তীরে হরি বলে কে যায় রে।

গান। কি দেখিলাম যে কেশব ভারতীর কুটীরে।

গান। তারে কৈ পেলাম সই হলাম যার জন্যে পাগল।

গান। গৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়।

গান। কাঁহা মেরা বৃন্দাবন কাঁহা যশোদা মাই।

গান। জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় ভবতারণ।

গান। গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

ঝরণার মত শ্রীমর গান হইতেছিল অফুরন্ত। কি যেন দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহারই অর্চনা করিতেছেন স্তবকুসুমে। হৃদয় বুঝি ডুবিল পরমানন্দ সাগরে। তাহারই উচ্ছ্বাসে হৃদয়কোণ বাহিয়া বিগলিত হইতেছে সঙ্গীতসুধা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভজনানন্দে শ্রীম

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, গদাধর, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। জগবন্ধু স্ট্র্যাণ্ড রোড হইতে গাড়ী করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে নবদ্বীপচন্দ্র রায়চৌধুরী। ইনি পুরী হইতে ফিরিয়াছেন, দেশে যাইবেন ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। কিছুদিন পূর্বে জগবন্ধু পুরীতে গিয়া তাঁহার কাছে ছিলেন। নবদ্বীপ ভক্তলোক, শ্রীচৈতন্যের উপাসক।

আজ ১৯শে জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ৫ই আষাঢ় ১৩৩১, বৃহস্পতিবার। গ্রীষ্মের পর আজ বৃষ্টি হওয়ায় প্রকৃতি শান্ত, ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দ। শ্রীম নিজকক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে লাগিলেন। গানের পর গান চলিয়াছে—যেন গানের বান আসিয়াছে। প্রথম গাহিতেছেন মায়ের নাম।

গান। কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।

গান। মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।

গান। সুরাপান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।

গান। গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।

গান। সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।

গান। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।

গান। শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে।

গান। আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।

গান। আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্যি করে।

গান। মনেরই বাসনা শ্যামা শবাসনা।

গান। কে গো আমার মা কি এলি।

তারপর বৃন্দাবন-লীলার গান গাহিতেছেন।

গান। বাজিল শ্যামের বাঁশরি যমুনায়।

গান। বাঁশি বাজিল ঐ বিপিনে।

গান। নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।

গান। আমি মুক্তি দিতে কাতর নই
শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই (গো)।

গান। কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।

গান। কিশোরীর প্রেমনিধি আয় প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।

গান। যশোদা নাচাতো মা বলে নীলমণি।

গান। হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর কমলাপতি।

গান। শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই

গান। যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এলো।

এবার চৈতন্যলীলা গাহিতেছেন।

গান। গৌর নিতাই তোমরা দু' ভাই পরম দয়াল হে প্রভু।

গান। সুরধনীর তীরে হরি বলে কে যায় রে।

গান। কি দেখিলাম যে কেশব ভারতীর কুটীরে।

গান। তারে কৈ পেলাম সই হলাম যার জন্যে পাগল।

গান। গৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়।

গান। কাঁহা মেরা বৃন্দাবন কাঁহা যশোদা মাই।

গান। জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় ভবতারণ।

গান। গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

ঝরণার মত শ্রীমর গান হইতেছিল অফুরন্ত। কি যেন দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহারই অর্চনা করিতেছেন স্তবকুসুমে। হৃদয় বুঝি ডুবিল পরমানন্দ সাগরে। তাহারই উচ্ছ্বাসে হৃদয়কোণ বাহিয়া বিগলিত হইতেছে সঙ্গীতসুধা।

দুই ঘণ্টা অতীত হইল। এখন রাত্রি নয়টা। শ্রীম স্বীয় কক্ষে আনন্দে মগ্ন। কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিলেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য দরজার পাশে। চক্ষু আনন্দে ঢল ঢল, মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব মধুর কান্তি—প্রশান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ।

অন্তেবাসী—ইনিই নবদ্বীপবাবু।

শ্রীম—যিনি পুরী থেকে মহাপ্রসাদ পাঠিয়েছিলেন? হাঁ, আপনার প্রেরিত প্রসাদ পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। ছয় মাসের উপর পুরী বাস করে ফিরেছেন, ধন্য আপনি! আবার ঠাকুরের উৎসব করলেন। উত্তম ভোগরাগাদি সব হয়েছিল—খোকা মহারাজ পূজা করলেন, তারপর সাধু, ভক্তসেবা। এ সবই সৌভাগ্যের কথা। যতক্ষণ ভগবানের চিন্তায়, সাধুভক্তের সেবায় সময় অতীত হয় সেটাই real life (সত্যিকার জীবন)!

আবার ঠাকুর বলেছিলেন, আমিই জগন্নাথ! তাই ভক্তদের পাঠিয়ে দিতেন দর্শন করে আসতে। আমাদের কয়েকবার হয়েছে দর্শন তাঁর জীবিতাবস্থায়। নিজে যেতেন না। বলতেন, ওখানে গেলে শরীর থাকবে না।

তিনি আরও বলেছিলেন—ক্রাইস্ট, গৌরাঙ্গ আর আমি, এক। আরও বলেছিলেন, যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। চৈতন্যদেব শেষের বার বছর সর্বদা মহাভাবে ছিলেন। সেই সব কথা স্মরণ হলে মহাভাবে শরীর চলে যাবে তাই যেতেন না নিজে।

বিবেকানন্দ একদিন আমাদের ঐ বাড়ীতে (ঠাকুরবাড়ীতে) এল। তখনও ঐ বাড়ী পার্টিশান হয় নাই। বয়স তার উনিশ হবে। আমায় বলছে, আপনাকে একটা কথা বলবো—বলুন, বলবেন না কাউকে। আমি বললাম—বল না, কি? তখন বললে, পরমহংস মশায় আমায় বললেন, নবদ্বীপে যে গৌরাঙ্গ হয়েছিলেন, আমিই সেই গৌরাঙ্গ। শুনিস নাই, লোকে গৌর গৌর করে? আচ্ছা, এ লোকটা কি পাগল হয়েছে নাকি? (সকলের উচ্চহাস্য) যে লোক এখন পাগল বললে—সেই কিন্তু প্রচার করলে জগতের সামনে উচ্চকণ্ঠে:

খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।

নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়॥...

আবার বললেন, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।

ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ

... ...

গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ।

সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥

এখনও বৃষ্টি হইতেছে। অত্যন্ত গরমের পর আজ প্রথম বর্ষা।

বড় জিতেন—বাঁচা গেল আজ জল হওয়ায়। পাড়াগাঁয়ে কি জলকষ্ট!

শ্রীম—কেন থাকা সেখানে যেখানে নদী নাই! শাস্ত্রে আছে, বড় নদীর কাছে বাস করবে। শাস্ত্রবাক্য না মানলে তো কষ্ট হবেই।

শ্রীম (নবদ্বীপের প্রতি)—এই দেখুন না, তিনিই সব করে দিচ্ছেন। এত গরম, তা কেমন জলটি দিলেন। জল পেয়ে বৃক্ষলতা পশুপক্ষী, মানুষ, সব আহ্লাদ করছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—আমরা তাঁর হাতে সব যন্ত্রমাত্র। তিনিই যন্ত্রী। যন্ত্রীর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে—'সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী (মা) আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।'

কোথাকার একটা মিথ্যা জিনিস 'আমি' এসে ঢুকে এই গোল বাধাচ্ছে। তাই 'আমি আমি' করে মরে লোক। 'আমি' মানে, sense world-এর existence (বাহ্য জগতের অস্তিত্ব) আছে, এ বোধ। বস্তুতঃ তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

বড় জিতেন—এখন যায় কি করে এই আপদ 'আমি'?

শ্রীম—জীবের 'আমি' যায় না, ঠাকুর বলতেন। তাই 'দাস আমি', 'ভক্ত আমি' হয়ে থাকা। বড় বাড়ীর ঝিয়ের মত থাকতে বলেছেন। চেষ্টা করা সাধ্যমত, আর তাঁর কাছে কাঁদা। না কাঁদলে হয় না।

আমি এই দেহ—এই বুদ্ধিটি দিয়েই তো সংসার করেছেন। আবার তাঁরই ইচ্ছায় কারো কারো এই 'আমিটা' নষ্ট হয়ে যায় তাঁর

কাজের জন্য, নজীরের জন্য। এঁরা সব ঈশ্বরকোটি অবতারাদি। এঁরা যেন মূলোগাছ, শিকড় শুদ্ধ উঠে যায়। জীবের আমি যেন অশ্বত্থ গাছ—আজ কাট, কালই আবার ফেঁক্ড়ি বেরোবে।

কথাটা হচ্ছে কর্তাভজা হতে হবে। তাঁর দোরে পড়ে থাকা শরণাগত হয়ে। কেবল বিচার করে হয় না—তপস্যা চাই। আর চাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস। গুরু বলেছেন, তাঁর কাছে কেঁদে বল যেমন শিশু মাকে বলে। তাই করতে চেষ্টা করা। বিচার ভেসে যায় মহামায়ার কাছে। বিশ্বাস, গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—দেখুন, এই শরীর কত গভীর দেহবুদ্ধি দিয়ে তৈরী। এই দেহবুদ্ধি রক্ত মাংস মজ্জা, মন বুদ্ধি চিত্তে জড়িয়ে আছে। (জানালার ভাঙ্গা সারসি দিয়া বৃষ্টির জল ঘরে আসিতেছে দেখিয়া) জল আসছে ঘরে তো এখানে দেহ রক্ষা হবে না; ওঠ, অন্যত্র যাও। একবেলা না খেলে কেঁদে বলে—শরীর থাকবে না। আর জল হাওয়া বন্ধ হয়ে যাক, দেখি কেমন করে শরীর থাকে। 'আমি' কোথায় পালিয়ে যায় তখন তার নাই ঠিক। এত দেখে-শুনেও লোকগুলি খালি 'আমি আমি' করছে। কোথায় 'আমি'? সবই তো তিনি। এটা ঠাকুরের normal (সাধারণ) অবস্থা। বলেছিলেন—অনেক খুঁজেছিলাম, 'আমি'টাকে পেলাম না। সবই দেখছি তিনি—মা, সব জুড়ে বসে আছেন।

'আমি আমি' করে করে একটা adaptation (স্বভাব) হয়ে যায়—stagnation (বন্ধন, মোহ) হয়ে যায়। শ্যামপুকুরের বাড়ী ছেড়ে আসার সময় কাঁদতে হলো আমায়।

একজন ভক্ত—সে অন্য কারণ। ঐ বাড়ীতে থেকে ঠাকুরের দর্শন হয়। আবার ঠাকুর গেছেন ওখানে। তারপর কত সাধু ভক্ত সমাগম হয়েছে ও-বাড়ীতে, তাই।

শ্রীম—হাঁ, তা বটে, কিন্তু বেশী দিন থাকলে মমতা হয়ে যায়। বিষয়ের ধর্মই এই। এ কারো দোষ নয়। মহামায়াই এই

বিষয়রূপ জগৎরূপ ধারণ করে আছেন তাঁর অবিদ্যাশক্তিতে। তাই এই ভ্রম, মমত্ববুদ্ধি। তাঁ'তে মমত্ব না গিয়ে তাঁর সৃষ্ট বস্তুতে মমত্ব আসে। এই অজ্ঞান তাঁরই দেওয়া। এইটি যে বুঝতে পারে সেই প্রাণ ভরে তাঁর কাছে কাঁদে, এই মহত্ব উঠিয়ে নিয়ে তাঁ'তে মমত্ব সংস্থাপন করার জন্য। কি অদ্ভুত কলটি এই শরীর!

শ্রীম মত্ত হইয়া আবার গান গাহিতে লাগিলেন।

গান। শ্যামা মা কি কল করেছে।

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি।

গান। আমায় দে মা পাগল করে।

শ্রীম ভাবে গদগদ্। নবদ্বীপের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। নবদ্বীপ গৌরভক্ত। নিজের গৃহে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্যসেবা আছে। তাই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছেন:

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে আমার প্রাণ রে॥
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় রে।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় রে,
নিতাই ঘরে ঘরে প্রেম যাচে দন্তে তৃণ ধরি॥

গৌর-বই নিতাই কিছুই জানতেন না—গৌরগত প্রাণ। চৈতন্যদেবের কথায় তু'টি বিয়ে করেছিলেন। বছর বছর পুরীতে গিয়ে চৈতন্যদেবকে দর্শন করতেন। নবদ্বীপের ভক্তরা চার মাস পুরীতে কাটাতেন আর যেতে আসতে তু'মাস। এই ছয় মাসই তাঁরা এক রকম সন্ন্যাসী ছিলেন। কত ভালবাসেন তাঁরা চৈতন্যদেবকে, এ থেকেই বুঝা যায়। এই যাত্রার লিড়ার ছিলেন শিবানন্দ সেন।

একবার সকলে গিয়ে মহাপ্রভুকে প্রণাম করলো। নিতাই যান নাই, নরেন্দ্র সরোবরের তীরে বসে কাঁদছেন। নিতাইকে দেখতে না পেয়ে চৈতন্যদেব একেবারে উন্মাদের মত চীৎকার করে বলতে লাগলেন, কৈ আমার নিতাই—আমার নিতাই? ভক্তরা

বললেন, নরেন্দ্রসরোবরের তীরে বসে কাঁদছেন। অমনি তীরবেগে ছুটে গিয়ে তাঁকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করলেন। আর বললেন, আমার নিতাই-এর চরণামৃত তোমরা সকলে খাও।

কেন এই মান দিলেন নিতাইকে? তাঁর দ্বারা যে মহৎ কাজ করাবেন! গৃহী ভক্তদের শিক্ষার জন্য—কি করে ঘরে থেকে দেবজীবন যাপন করবে—নিতাইকে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়ে বিয়ে করালেন। কত বড় ত্যাগ! যিনি বার বছর বয়সে প্রব্রজ্যা করলেন, তাঁকে দিয়ে বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করালেন। নিতাই গৌরেরই ভিন্ন মূর্তি। এক শক্তি দুই ভাগ হয়ে, জগৎকে ঈশ্বরপ্রেম শিক্ষা দিয়েছিলেন। 'Upon this rock I will build my church!' (এই বিশ্বাসের পাহাড়ের উপর আমি ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করবো)।

শ্রীম আবার গাহিতেছেন।

গান। কবে হবে দরশন হে প্রেমময় হরি।

গান। হরি তোমা বিনে কেমনে এ ভবে জীবন ধরি।

শ্রীম ভাবে মত্ত, নয়নে প্রেমাশ্রু।

শ্রীম (নবদ্বীপের প্রতি)—

হরি জগতজীবন জগবন্ধু,
শুনেছি পুরাণে কয় পুনর্জন্ম নাহি হয়,
হেরিলে তব মুখ ইন্দু।

এই গান গাইতে হয় জগন্নাথ দর্শনের সময়। এই এক দিক। আবার আর এক দিক আছে। তখন কিছুই নাই—লম্ফ ঝম্ফ, কান্না কাটা। সব স্থির। সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে নুনের পুতুল। সব একাকার। তখন—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

আবার,

একরূপ অরূপ-নাম-বরণ অতীত-আগামী কালহীন,
দেশহীন সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।

একেরই নানা ভাব, আবার অভাব। এ অভাব negative (নাস্তিবাচক) নয়, positive (অস্তিবাচক)—সচ্চিদানন্দ-সাগর। এই সব নানা ভাবে ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করতেন। কখনো ঝোল, কখনো ঝাল—যখন যেমন ইচ্ছা। মায়ের কোলের শিশু যে! কখনো ছেলের আবদার, কখনো মায়ের আবদার। এই দিব্য খেলা খেলতে এসেছিলেন ঠাকুর। সংসারের কামিনীকাঞ্চনের উত্তাপে জ্বলে যাচ্ছিল ঠাকুরের শরীর। তাই কাঁদতেন, আর বলতেন—মা, শরীর আর থাকবে না। জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর শরীরকে রাখতেই হবে। তাই মা বোঝালেন, শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত সব আসবে এর পর। একটু অপেক্ষা কর। বাইশ বছর তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাঁরা অনেকেই তখন জন্মানই নি। তারপর তাঁরা যখন এলেন তখন ঠাকুর শান্ত হলেন।

অবতার হন জগতের কল্যাণের জন্য—ভক্তদের জন্য। তাঁর নিজের জন্য কি দরকার শরীর ধারণ করা? তাঁর নিজরূপ গুরুরূপ। সেটি সকল দ্বন্দ্বের বাইরে।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্॥

এইটিই মানুষ হয়ে আসেন। এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, তোদের বেশী কিছু করতে হবে না। কেবল আমাকে চিন্তা করলেই হবে। বলেছিলেন—মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য শান্তিসুখ প্রেম সমাধি। বলুন তো কে পারে এ কথা বলতে ঈশ্বর ছাড়া?

এখন রাত্রি সাড়ে দশটা। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। নবদ্বীপ এই জলে আর বাসায় গেলেন না। জগবন্ধুর সঙ্গে দোতলার ঘরে রাত্রিবাস করিলেন। ডাক্তার এবং বিনয়ও রহিয়া গেলেন। শ্রীম নবদ্বীপকে জলযোগের জন্য দুইটি লেংড়া আম দিলেন।

এইমাত্র সংবাদ আসিল মর্টন স্কুলের কৃতী ছাত্র প্রণবপ্রকাশ

সেন রাত্রি সাড়ে আটটায় শরীর ত্যাগ করিয়াছে। বয়স মাত্র ষোল বছর। কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্বামিজীর 'বীরবাণী'র আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হয়। বেলুড় মঠের অনেক সাধু তাহাকে ভালবাসেন। শ্রীমও তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। একটি ছাত্র আসিয়া জগবন্ধুকে এই সংবাদ দেয়। শ্রীম শুনিয়া একেবারে নির্বাক হইয়া স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন সকালে শ্রীমর অনুমতি লইয়া অন্তেবাসী নবদ্বীপকে ৺দক্ষিণেশ্বর ও ৺বেলুড় মঠ দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে রামলাল দাদা ও লক্ষ্মী দিদির সঙ্গে নবদ্বীপের পরিচয় হইল। মঠেও মহাপুরুষ মহারাজ ও অপর প্রাচীন সাধুদিগের সঙ্গে পরিচয় হইল। তাঁহারা ইতিপূর্বেই তাঁহার নাম জানিতেন দৈবক্রমে।

ঘটনা এইরূপ। বাবুরাম মহারাজের বিগত জন্মোৎসবের পূর্বের জন্মোৎসবের দিন অজানাভাবে অন্তেবাসী পুরী হইতে বড় দুই হাঁড়ি কণিকাপ্রসাদ, এক হাঁড়ি ডাল ও এক হাঁড়ি তরকারী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুরীতে তাঁহার সঙ্কল্প হইয়াছিল, ঠাকুরকে মহাপ্রসাদের ভোগ নিবেদন করিবেন। খোকা মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেও অন্তেবাসী যান নাই এই জন্য। সেই মহাপ্রসাদ বার শত সাধু ভক্ত পঙ্গতে বসিয়া পাইলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ এই দৈব সংযোগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন আর আনন্দে সারাদিন মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য ও ঠাকুরের কৃপার কথা বলিতে লাগিলেন। অন্তেবাসীকে আজ আর প্রণাম করিতে দিলেন না। বলিলেন, তোমাকেই আমি প্রণাম করছি—তুমি মহাপ্রসাদ বয়ে এনেছ.মহাপ্রসাদরূপ হয়ে গেছ। ঠাকুর বলতেন, যে রাস্তায় মহাপ্রসাদ যায়, যে মহাপ্রসাদ বয়ে আনে, সেই রাস্তা ও সেই ব্যক্তি পবিত্র হয়ে যায়। তুমি আজ জগন্নাথ হয়ে গেছ। (তাঁহার গৃহে সমাগত বহু সাধুদের প্রতি) দেখ, ঠাকুরের কি অপার মহিমা! বাবুরাম মহারাজ আবাল্য জগন্নাথভক্ত। তাই নিজে এই মহাপ্রসাদ আনিয়েছেন।

আজ সারা দিন যে আসে তাহাকেই ঠাকুরের এই মহিমা কীর্তন করিতেছেন অক্লান্তভাবে। উনি যেন আজ মহাপ্রসাদ ও জগন্নাথের কথা কহিতে কহিতে জগন্নাথস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন।

নবদ্বীপ এই মহাপ্রসাদ আনাতে সাহায্য করেন। আর পুরীতে নবদ্বীপ খোকা মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করেন—সাধু ভক্তের সেবা করেন। মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছায় অন্তেবাসী ও নবদ্বীপ আজ মঠে প্রসাদ পাইয়া সারা দিন ওখানে অতিবাহিত করিলেন। রাত্রিতে তাঁহারা বেলেঘাটা ফিরিলেন। আজ রাত্রিতেও প্রচণ্ড বৃষ্টি।

কলিকাতা
১৯শে জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ, বৃহস্পতিবার

ষোড়শ অধ্যায়

অবতারে ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের বারান্দা। শ্রীম বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। এখন সকাল আটটা। পাশে বিনয় ও ছোট জিতেন বসা। অন্তেবাসী আসিয়া প্রণাম করিলেন।

আজ ২১শে জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ৭ই আষাঢ় ১৩৩১ সাল, শনিবার। কৃষ্ণা পঞ্চমী, ৫০।২৫ পল।

শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, গতকাল সারাদিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন কি? অন্তেবাসী বলিলেন, আজ্ঞে না, আধা দিন। আর বাকী আধা দিন বেলুড় মঠে। রাত্রে নৌকা করে বড়বাজার আসি। সেখান থেকে গাড়ীতে বেলেঘাটায় যাই। রাত্রিতে ওখানেই ছিলাম। শ্রীম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, নবদ্বীপবাবু কি businessman

(ব্যবসায়ী)? অন্তেবাসী বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ, আবার জমিদার। তারপর শ্রীম গতকালের সারাদিনের রিপোর্ট শুনিলেন। রামলাল দাদা, লক্ষ্মী দিদি, মহাপুরুষ মহারাজ—এঁদের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হইয়াছে সব শুনিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ যখন শুনিলেন যে ইনিই নবদ্বীপবাবু, তাঁহারই সহায়তায় অত মহাপ্রসাদ পুরী হইতে আনা হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমও বহু ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অপরাহ্ন চারটা। দ্বিতলের বৈঠকখানায় ভক্তসভা বসিয়াছে। শনিবাবেব ভক্ত বড় ললিত ও ভোলানাথ আসিয়াছেন। আর বিক্রমপুরেব ভক্ত, শান্তি, ছোট রমেশ, শচী, বিনয়, ডাক্তার, ছোট নলিনী, জগবন্ধু প্রভৃতিও রহিয়াছেন। শ্রীম মাদুরে বসা। অন্তেবাসী বলিলেন, আজ মঠে 'যাজ্ঞবল্ক্য' অভিনয় হইবে। ঈশ্বরীয় কথা চলিতেছিল। অমনি উহা বন্ধ করিয়া শ্রীম ঐ অভিনয়ের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, চৈতন্যদেব নিজে ঐরূপ অভিনয়ে পার্ট নিয়েছিলেন। এসব দর্শন করতে হয়—ভাগ্যে থাকলে অমন সুযোগ হয়। ভক্তদের যাওয়া উচিত। হাজার বই পড়লেও মনে অমন রেখা অঙ্কিত হবে না—একবার দেখলে যেমন হয়।

শ্রীমর কথা শুনিয়া ডাক্তার উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার মোটর আজ গ্যারেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, শচী ও ছোট নলিনীকে লইয়া মোটরে বাগবাজার গেলেন। তারপর নৌকায় বেলুড় মঠে।

সন্ধ্যার পূর্বে গেস্ট হাউসের দ্বিতলে অভিনয় হইতেছে। জনকসভা বসিয়াছে। অনঙ্গ যাজ্ঞবল্ক্য সাজিয়াছেন আর শশধর শ্রুতি দেবী। তারপব ঋষিগণ। যাজ্ঞবল্ক্যকে ঋষিগণ নানা প্রশ্নে জর্জরিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি অম্লান বদনে সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ হইয়া সহস্র গোধন লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। বড়ই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! কাশীতেও এই অভিনয় হইয়া গিয়াছে। কি সুন্দর অভিনয়! সর্বত্যাগী নটনটী সাজিয়া বৈদিক যুগ যেন ফিরাইয়া

আনিয়াছেন। সম্মুখে গঙ্গা আর স্বামিজীর মন্দির। বড় গম্ভীর পরিবেশ। দর্শক মঠের সকল সাধু-ব্রহ্মচারী। কি দিব্য দৃশ্য!

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য। তাঁহার বামদিকে বেঞ্চির উপর সতরঞ্চি পাতা। তাহাতে বসিয়াছেন স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ আর স্বামী সম্ভাবানন্দ। তাঁহাদিগের সঙ্গে দুইজন ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহারা বসিলেন শ্রীমর সামনে বেঞ্চিতে ভক্তদের সঙ্গে। বড় জিতেন, অমৃত, রমেশ, বিনয়, শচী, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমব ডান হাতে ও সামনে বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। কথাপ্রসঙ্গে গতরাত্রের বেলুড় মঠের 'যাজ্ঞবল্ক্য' অভিনয়ের কথা উঠিয়াছে। শ্রীম বলিলেন, এসব হওয়া খুব ভাল। বৈদিক যুগের একটা ছাপ পড়ে মনে। চৈতন্যদেবও কবেছিলেন। নিজে জগন্মাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঠাকুবও বাল্যলীলায় এইরূপ অভিনয়ে যোগ দিতেন। একবার শিব সেজেছিলেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুব বড়বাজারে অন্নকূট দর্শন করতে গিছলেন। রাখাল তখন শ্রীবৃন্দাবনে। ঠাকুর বলেছিলেন, রাখাল এখন বৃন্দাবনে অন্নকূট দেখছে। ও না হয় বড় ব্যাপার দেখছে, আমরা ছোটখাটো আয়োজন দেখছি। নানা রকমের অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টির স্তূপ দেখে ঠাকুর আহ্লাদ কবছিলেন—যেন পাঁচ বছরের বালক! মেলা বসেছে পাশে। একজনকে বললেন—ওবে, এইবার এক পয়সার কল্‌কে কিনে নে! অনেক রকমের কল্‌কে এনেছে লোক বেচতে।

ঠাকুরের কাছে যাবার পূর্বে আমরা সাত আট বছর ব্রাহ্ম সমাজে আসা-যাওয়া করতাম। ওখানে formal serviceএ (আনুষ্ঠানিক উপাসনার সময়) ওঁরা ঈশ্বরের বিষয় বলতেন। শুনে মনে হতো ঈশ্বর যেন অতি দূরে। কিন্তু ঠাকুরের কাছে যেই গেলাম, দেখছি—উনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইছেন বিড়বিড় করে। (সাধুদের দেখাইয়া) তখনও এঁদের জন্ম হয় নাই। তখন এঁরা ছিলেন heir prospective (ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী) in the womb of

futurity (ভবিষ্যতের গর্ভে)। তাঁর ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী এঁরা এখন। আহা, কত বড় ideal (আদর্শ) দিয়ে গেলেন ঠাকুর! বলেছিলেন, মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বরদর্শন। তা না হলে কিছুই হলো না। আবার শুধু দর্শন নয়। তিনি নিজে জগদম্বার সঙ্গে কথা কইতেন এক ঘর লোকের সামনে। আমরা যেমন পরস্পর কই, তেমনি তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইতেন। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত, তিনিই রূপ ধরে মায়ের রূপে তাঁর সঙ্গে সর্বদা কথা কইতেন।

হাঁ, সন্ন্যাসীদের কথায় বলেছিলেন, সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। অন্য ভক্তদেরও অন্ততঃ পঞ্চাশ হাত তফাতে থাকতে হয়।

একবার রথযাত্রায় বলরামবাবুদের বাড়ীতে এলেন। ফিরবার সময় মেয়ে ভক্তরা অনেকে নৌকো করে দক্ষিণেশ্বরে গেল। মা তখন ন'বত (নহবৎ) থাকেন। মেয়েরা এক এক করে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করতে লাগলো ঢিবঢিব করে। শেষে একজনকে ঠাকুর বললেন—দেখ না, বার বার মেয়েরা কিলবিল করে আসছে, এসব আমার ভাল লাগে না। ওরা শুনেই দৌড়। ওরা তো খুব ভক্ত মেয়ে ছিল! তবুও বললেন, আমার ভাল লাগছে না। তাই বলতেন, ভক্তিতে গড়াগড়ি গেলেও মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে নাই, মেশামেশি করতে নাই।

মাড়োয়ারীর দশ হাজার টাকা রাখলেন না। টাকার কথা শুনে একেবারে মূর্ছা! আমাদের বলেছিলেন—মাথায় হাতুড়ি মারলে যা হয় সেই রকম হয়েছিল। বাবা, কি অবস্থা! কেউ কি কল্পনা করতে পারে একথা! এসব হলো কেন? না, নজীরের জন্য। তাই এক একবার বলতেন, মা এসব অবস্থা করান ভক্তদের শিক্ষার জন্য—নজীরের জন্য।

কর্মকাণ্ড বড় কঠিন। গুরুর উপদেশ, আদেশ পেলে তখন কর্ম করা যায় ঠিক ঠিক। গুরু যা করতে বলেন কেবল তাই করা। অন্য

কর্ম নয়। কর্ম লোককে জড়িয়ে ধরে—যেমন জলেডোবা লোক জড়িয়ে ধরে যে তাকে তুলতে যায়।

গুরুর উপর বিশ্বাস চাই। তবেই কাজ হয় সহজে। নইলে অনেক দেরী হয়ে যায়। হয়তো একশত জন্ম পিছনে পড়ে যায়।

গুরুভক্তির একটি গল্প বলেছিলেন ঠাকুর। একজন গুরুর বাড়ীতে ছেলের পৈতে। শিষ্যরা এক একজন এক এক দ্রব্য দিচ্ছে উৎসবের জন্য। অনেক লোক খাবে। একটি বিধবা শিষ্যা বললে, আমি দই দেব। তারপর উৎসবের দিন সে এক খুরি দই নিয়ে এসে হাজির। গুরু দেখে ক্রোধে অধীর হয়ে বললো—পোড়ারমুখী, তুই আমার মুখে কালি দিলি? অত লোক খাবে, আর এইটুকু দই নিয়ে এলি? যা, তুই গিয়ে নদীতে ডুবে মর! শিষ্যা নদীতে গিয়ে যত নামছে কেবল কোমর জল। তার মরণ হলো না। সে তখন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে—হা ভগবান, আমার গুরুবাক্য রক্ষা হলো না! ভগবান তখন দেখা দিয়ে আর একটি খুরি দই ওর হাতে দিলেন। আর বললেন, যত ঢালবে তত বাড়বে। গুরুর বাড়ীতে গিয়ে ঐটি যত ঢালছে, ততই বাড়ছে। গুরু বিস্মিত হয়ে বললেন—মা, যিনি তোমায় এটা দিয়েছেন তাঁকে তুমি আমায় দেখাবে? বিধবা বললো, হাঁ জী। নদীতীরে গুরু চলে গেল—উৎসব পড়ে রইল। ভগবানকে ডাকতেই তিনি এসে বিধবাকে দর্শন দিলেন। তখন সে বললে গুরুকে দর্শন দিতে। ভগবান বললেন, ওর হবে না। তখন বিধবার পীড়াপীড়িতে একবার দর্শন দিলেন।

দেখ, আপনার বিশ্বাসে ভক্ত শিষ্যাই গুরুর কাজ করলে যথার্থ। গুরুতে বিশ্বাস চাই। তাঁর কথায় কাজ করলে বন্ধন হবে না। 'বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।'

২

মর্টন স্কুল। চার তলার সিঁড়ির ঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন বেঞ্চিতে, দক্ষিণাস্য। এখন অপরাহ্ণ তিনটা। পাশে জগবন্ধু বসা।

লক্ষ্মণ আসিয়াছে। সে অদ্বৈত আশ্রমের পাচক ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যাবাসী আর ভক্ত লোক। লক্ষ্মণ এই কর্ম ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছে লোকের পরামর্শে। তাহারা বলিয়াছে, বিশ টাকা মাসিক বেতনে অত কাজ করা যায় না। এই বেতন খুব কম। তাহা ছাড়া সাধুরা যখন অর্থ উপার্জন করিতেছেন তখন কেন অত অল্প বেতন দিবেন? অদ্বৈত আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের মায়াবতী শাখার পুস্তকাদির প্রকাশকেন্দ্র।

শ্রীম (লক্ষ্মণের প্রতি)—ঠাকুর একটা গল্প বলেছিলেন। একটা মণি নিয়ে একজন বাজারে গিছলো বেচতে। বেগুনওয়ালা ওটার দাম দিল নয় সের বেগুন। কাপড়ওয়ালা দেখে বললে, এর দাম নয়শ' টাকা। আব জহুরী বললে এই নাও এক লাখ টাকা। সে অনেক মণি-মাণিক্যের ব্যবসা কবে কি না!

তুমি মাত্র দাম দিলে বিশ টাকা? তা নয়, বল—এব দাম নয় লাখ টাকা, কি এক কোটি টাকা। একশ' লাখে হয় এক কোটি। সাধুসঙ্গ অমূল্য জিনিস। আবাব সাধুসেবা দিবাবাত্রি। এব দাম মুক্তি—মোক্ষ, যার জন্য মুনি-ঋষিগণ জন্ম জন্ম তপস্যা করেন। আব তুমি অনায়াসে পাচ্ছ সেই অমূল্য সম্পদ। তোমায় দেখলে সাধুদেব কথা মনে পড়ে।

ঈশ্বর সর্বত্রই প্রকাশিত। কিন্তু মানুষে বেশী প্রকাশ। তার মধ্যে আরও অধিক প্রকাশ সাধুতে। আর যিনি আত্মদ্রষ্টা তাঁ'তে এর চাইতেও বেশী প্রকাশ। সবাধিক প্রকাশ অবতারে—যেমন ঠাকুব, চৈতন্যদেব, ক্রাইস্ট।

এ সাধু পাবে কোথায়? তাঁরা দিনরাত ঠাকুরের চিন্তা করেন। ঠাকুর হলেন অবতার, অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বেদে যাঁকে পরব্রহ্ম বলেছেন ঋষিরা, তাঁরই নররূপ। ঠাকুর নিজে বলেছেন এ কথা। স্বামীজী তাঁকে বার বার নমস্কার করছেন—'নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত মনোবচনৈকাধার।' এই সাধুরা সর্বস্ব ছেড়ে এসে ঠাকুরের চিন্তা কবছেন দিনরাত। তাঁদের ভিতর বেশী প্রকাশিত ঈশ্বর।

অর্থোপার্জনেব কথা যা লোক বলে, সে উপার্জন কি জন্য?

এ কি আর নিজের জন্য—লোক যেমন করে ? তা নয়—আশ্রমের জন্য, লোককল্যাণের জন্য, এই সব পুস্তকাদির প্রচার। অর্থ না হলে তো পুস্তক প্রকাশ হয় না, তাই তাঁরা পুস্তকের বিনিময়ে অর্থ নেন। এই আশ্রম কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আজ আছেন, কাল হয়তো এইসব ছেড়ে তপস্যা করতে লাগলেন হিমালয়ে ঋষিকেশে। তখন তাঁরা সকল সাধুর মত ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই আশ্রমের কোনও অর্থ সঙ্গে নিয়ে যান না। অন্য লোক তা করতে পারে ? বললেই হলো, সাধুরা অর্থোপার্জন করছেন! ঠাকুর বলতেন, পুলি দেখতে সব এক রকম। কিন্তু কারও ভিতর কড়ার ডালের পোর, কারও ভিতর ক্ষীর। এই সাধুদের ভিতর তেমনি ক্ষীর! এঁরা এই সব করছেন সমাজের কল্যাণের জন্য, নিজের জন্য নয়। এঁদের কত বড় ত্যাগ! কত বড় বিদ্বান সব লোক এসেছেন! আবার খুব বুদ্ধিমান। এঁদের কি না ছিল ঘরে ? সংসারে তাঁরা এক একজন কত বড় হতে পারতেন। কিন্তু সব ছেড়ে দিয়েছেন ঈশ্বরলাভের জন্য। অপর লোক কার জন্য রোজগার করছে ? নিজের পেটের জন্য, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্য। তাঁরা করছেন সমাজের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, ঈশ্বরের জন্য। আকাশ পাতাল তফাৎ।

লোকের কথা অত শুনতে নেই। ঠাকুর বলতেন, এই সব লোক পোক—যারা কেবল অভ্যুদয়ের পরামর্শ দেয় নিঃশ্রেয়সকে ছেড়ে।

শ্রীমর এই অমৃতবাণী শুনিয়া ভক্ত লক্ষ্মণের মন প্রশান্ত হইল। সে আনন্দে শ্রীমকে প্রণাম করিয়া পুনরায় সাধুসেবার জন্য আশ্রমে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যার ভক্তসভা বসিয়াছে চার তলার ছাদে। শ্রীম উত্তরাস্য চেয়ারে বসা, আর ভক্তগণ শ্রীমর সামনে আর ডান দিকে ও বাম দিকে। বড় জিতেন, ছোট নলিনী, শান্তি, রমেশ, বিনয়, ভৌমিক, বলাই, শচী, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন।

দুই দিন পূর্বে বেলুড় মঠে 'যাজ্ঞবল্ক্য' অভিনয় হইয়াছিল, সংস্কৃত

ভাষায়। সাধু ব্রহ্মচারীরা সব নটনটী সাজিয়াছিলেন। তাহারই কথা হইতেছে। ভক্তগণ শ্রীমকে সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারিতেছেন না। জগবন্ধু শ্রীমর রিপোর্টার। কিন্তু আজ তাঁহার রিপোর্টও শ্রীমর মনঃপূত হইল না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এমন অনেক রিপোর্টার আছে তারা একটা ঘটনাকে একেবারে visualise (প্রত্যক্ষ) করিয়ে দিতে পারে। তাদের art (কৌশল) এমনি জীবন্ত! এটা একটা খুব উচ্চ স্তরের শক্তি। কৃষ্ণযাত্রা কয়দিন শুনেছিলাম। যে প্রধান গায়ক সে দৃশ্যগুলি একেবারে চোখের সামনে এনে ধরে দিত। এতে লোকের খুব উপকার হয়। এমন করে ধরতো যে লোকের মনের উপর ঐ ছবি জোর করে রেখাপাত করতো—এত realistic (বাস্তব)! ঠাকুরের এ শক্তি ছিল অতি অসাধারণ। একজন নিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু তিনি এমনি বর্ণনা করতেন যে বাধ্য হয়ে তাকে মনে ঐ ছবিকে আসন দিতে হতো। যেমন একজন বলছে খাবে না, কিন্তু তরকারীর এমনি সুগন্ধ যে সামনে ধরতেই সে এক থালা ভাত খেয়ে ফেলে।

মেকলেতে আছে, art (ললিত কলা) বলতে এই তিনটেই বুঝায়—poetry, painting and music (কবিতা, চিত্রকলা ও সঙ্গীত)। কিন্তু পেইন্টিং-এ এ তিনটাই রয়েছে। ভিতরে ভাব না থাকলে পেইন্ট করা যায় না। তাই poetry (কবিত্ব) চাই। আবার music-এর (সঙ্গীতের) মাধুর্যও চাই। এ না হলে যেমন খাবার দেখতে সুন্দর, কিন্তু রসনার রুচিকর নয়, তেমনি হয়।

পেইন্টিং আবার দু'রকম আছে—তুলি দিয়ে আর ভাষা দিয়ে। কারো কারো realistic faculty (রূপায়ন শক্তি) এমন strong (প্রবল) যে, সমস্ত ঘটনা যেমন দেখছে ঠিক তেমনি পেইন্ট করে দিতে পারে তুলি দিয়ে, আবার ভাষাতেও তাই হয়। ভগবানদর্শন হয়েছে যাঁদের, তাঁদের এই faculty (শক্তি) জীবন্ত, মধুর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। ঠাকুরের ঐ শক্তি ছিল।

Realisation (আত্মজ্ঞান) মানেই দর্শন, সাক্ষাৎকার।

একবার ভক্তরা ৺বদ্রীনারায়ণ বাক্সে দেখেছিল। কে বুঝি দু'টি পয়সা দিল। ঠাকুর বললেন, বদ্রীনারায়ণ দেখে মাত্র দু'পয়সা? বরং দু'টো টাকা দাও। এ অমূল্য বস্তু দেখে তার দাম দিলে মাত্র দু'পয়সা!

ঠাকুর সর্বত্রই দেখতেন নারায়ণ। মানুষ দেখে কেবল বাইরের ছবিটা। ঠাকুর দেখতেন ভিতর-বাইরে দুই-ই। সকল বস্তুর ভিতরে-বাইরে নারায়ণ, সকল জীবের ভিতরে-বাইরে নারায়ণ—নারায়ণময় জীবজগৎ। ঠাকুরের দৃষ্টি সর্বদা ঐ depth-এ (গভীরে), ঐ মূলে। সমাধির পর হয় এই অবস্থা। মন একেবারে বিলীন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে। তারপর যখন নীচে নামতে থাকে নাম-রূপে, তখন দেখে ঐ সচ্চিদানন্দই এই নাম-রূপ ধারণ করে রয়েছেন। একে ঠাকুর বলতেন, বিজ্ঞানীর অবস্থা। তাই ঠাকুরের ভাষা, তাঁর কথা অত attractive (হৃদয়গ্রাহী)। 'কথামৃতে'র charm (সৌন্দর্য) এইখানে। তিনি যা বলেছেন সব গোড়ায় বসে বলেছেন, সকল ভাবের প্রান্তদেশে বসে বলেছেন। তাই ভাষা অত সরল, অত জীবন্ত, অত সরস আর চিত্তাকর্ষক! যে শোনে তার প্রাণে গিয়ে প্রবেশ করে। এ শক্তি অবতারাদির হয়।

সন্ধ্যার আলো আসিতেই সকলে ধ্যানমগ্ন। তারপর 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে—ঠাকুর চৈতন্যলীলা-অভিনয় দর্শন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর সমাধিস্থ কেন হচ্ছেন মুহুর্মুহু? চৈতন্যদেবকে যে সাক্ষাৎ দর্শন করছেন, তাই! মানুষ তো আর তা দেখতে পারে না। মানুষ থিয়েটারের দৃশ্য দেখতে যায় নিম্ন স্তরের আনন্দের জন্য। আর ঠাকুর ঐ দৃশ্য দেখে একেবারে সমাধিস্থ। কেন?—না, তিনি দেখছেন এক সচ্চিদানন্দেরই রূপ মানুষের এই কাল্পনিক দৃশ্যাবলী। সচ্চিদানন্দ সকল আনন্দের খনি। তাঁকে তিনি সর্বদা সর্বত্র প্রত্যক্ষ করছেন। সাধারণ মানুষ দেখে উপরটা, তিনি দেখেন ভিতরটা। বাইরের আলোর সাজ দেখে বালকের ন্যায় আনন্দ করতে লাগলেন। দেখ, মানুষ-সাধারণে আর ঠাকুরে কত পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গিতে!

তাই আজ আমরা লক্ষ্মণকে বললাম, সাধুরা অন্য মানুষের মত বাইরে মানুষ হলেও তাঁদের ভিতরের ভাবনা অন্যরূপ। তাঁরা সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন। তাঁদের সেবা করলে ঐ ঈশ্বরচিন্তার অংশ লাভ হয়। তাকেই বলে ভক্তিলাভ। কে তাকে পরামর্শ দিয়েছে অদ্বৈতাশ্রমের কর্ম ছেড়ে দিতে। এখানে টাকা কম আর কাজ বেশী। আমরা তাকে ঠাকুরের মানিকবিক্রির গল্পটা শুনিয়ে দিলাম। জহুরী মানিকটা দেখে একেবারে লাখ টাকা দাম দিলে। আর কাপড়ওয়ালা দিলে ন'শ টাকা, আর বেগুনওয়ালা দিছলো ন'সের বেগুন। তেমনি সাধুরা হলেন অমূল্য মানিক। তাঁদের চেনেন শুধু মহাপুরুষগণ, অবতারগণ—যেমন ঠাকুর।

আরও বললাম, তুমি তো কেবল সাধুসঙ্গ করছো না, আবার সেবা করছো। আর তোমাকে দেখলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। কেন? না, যাঁরা দিবারাত্রি সারা জীবন ঈশ্বরের চিন্তা করছেন তুমি সেই সাধুদের সেবা করছো। দেখ না, তাঁদের ত্যাগ কত—বাড়ী ঘর, পিতা মাতা, আত্মীয় কুটুম্ব, ঐশ্বর্য, দেহসুখ, বিদ্যা, সব ছেড়ে এক ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল!

সর্বত্রই ঈশ্বর রয়েছেন বটে, কিন্তু মানুষ তা দেখতে পায় না। তাই তিনি কৃপা করে বিশেষ বিশেষ মানুষে, দ্রব্যে, অধিকতর প্রকাশিত হয়েছেন। মানুষের ভিতরে প্রকাশ বেশী সাধুতে। তুমি সেই সাধুদের সর্বদা সঙ্গ ও সেবা করছো। তাই তোমাকে দেখলে সাধুদের কথা মনে হয়; সাধুদের কথা মনে হলেই ঈশ্বরের কথা মনে আসবেই।

ঠাকুর বলেছিলেন, বাবলা গাছ দেখে একজনের ঈশ্বরের উদ্দীপন হল, আর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো। বাবলা গাছের ডাল দিয়ে রাধাকান্তের বাগানের কোদালের বাঁট তৈরী হয়। তাই বাবলা গাছ দেখে রাধাকান্তের ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়েছিল।

ছোট রমেশ (সহাস্যে)—একজন বলেছিল, ইনি আমার সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনঝি-জামাই। এও যে তাই!

শ্রীম—সই মানে সখা, অর্থাৎ বন্ধু। ঈশ্বরকেই বলা যায় একমাত্র বন্ধু। তিনি সর্বদা সঙ্গে আছেন। এই 'সই'কে যদি কেউ চিনতে পারে তবে তাকে আব জন্ম-মবণ চক্রে পড়তে হয় না—'ইহৈব তে জিতং সর্বম্'।

শ্রীম—হাঁ, ভৌমিক মশায, আপনি গান না। একলা না পাবেন বিনয়বাবু ও শুকলালিবাবুকে সঙ্গে গাইতে বলুন (সকলের উচ্চহাস্য, অন্তেবাসীব পেটফাটা হাস্য)। ইঁহাবা কখনও গান কবেন না। এই উচ্চ বেদান্ত, আবাব এই গভীব বহস্য। এ যেন বহুরূপীর খেলা!

এখন বাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা
২৩শে জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ, ৯ই আষাঢ় ১৩৩১ সাল
সোমবাব, কৃষ্ণা সপ্তমী, ৪৭।৭ পল

সপ্তদশ অধ্যায়

নরেন্দ্র সহস্রদল পদ্ম

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলেব বারান্দা। সকাল সাডে সাতটা। শ্রীম বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন—দক্ষিণাস্য। সম্মুখে ভক্তদের বাসগৃহ। শ্রীমব কাছে বসা জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেন, মণি ও শচী। শচীর বিবাহের কথা হইতেছে। শ্রীমব ইচ্ছা নয় শচী এখন বিবাহ কবে। তাহাকে বি. এ. পড়িতে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। বলিতেছেন, পড়ায় মন বসিলে বিবাহেব ইচ্ছা চলিয়া যাইবে।

শ্রীম (শচীর প্রতি)—পড়াশোনা করা ভাল। এতে অনেকগুলি moral qualities developed (নৈতিক গুণের বিকাশ) হয়। আজকাল মঠে বি. এ. পাশ না করলে নিতে চায় না। হেমেন্দ্র

যেতে চেয়েছিল মঠে। তা নিলে না, তাড়িয়ে দিল সুধীর মহারাজ। তারপর আমাদের স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করলো।। তারপরে ফারস্ট আর্ট পাশ করে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল হয়তো—plucked (ফেল) করে থাকবে। তখন মঠে নেয়।

পড়াতে patience, perseverance (ধৈর্য, অধ্যবসায়) বাড়ে। পাশকরা লোক চায় কেন কর্মে? তার মানে, এরা অনেক চিন্তা করেছে, perseverance (অধ্যবসায়) আছে। এই যে ছেলেরা এক একটা examine (পরীক্ষা) পাশ করছে, তা'তে কত চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই বি.-বাবু একবার স্যানিটারি examine (পরীক্ষা) দিল, সুবিধা হল না! অমনি ছেড়ে দিল। এতে কি দেখা যাচ্ছে? না, perseverance (অধ্যবসায়) কম। পাশকরা লোকেব উপর ভবসা হয়। তাব দৃষ্টান্ত দেখ না, অনঙ্গ আমাদের স্কুলের ছাত্র। এম. এ. পাশ করে মঠে যোগদান কবেছে। তাই ওর হাতে মঠের management (পবিচালন) ছেড়ে দিয়েছে। পাশকরা লোকের উপব ভবসা হয় এই জন্য—তাবা অনেক চিন্তা করেছে, sense of responsibility (দায়িত্ববোধ) বেড়েছে। তা ছাড়া যতদিন পড়াশোনা নিয়ে থাকা যায় তত দিনই ব্রহ্মচর্য থাকে।

সুভাষ বোসকে চিফ্ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার করেছে। কত এগজামিন পাশ করেছে—আই. সি. এস. পর্যন্ত। তবে তো ঐসব গুণেব পরিচয় পেয়ে অত উঁচু জায়গায় বসিয়েছে। অনঙ্গ একবার ভাল তৈরী হয় নাই দেখে পবীক্ষা দিল না। পরের বছর সেকেণ্ড ক্লাস পেল ফিলজফিতে। তার জন্যই তোমায় বলছি, পড়।

আর বি. এ.-টা না পড়লে আজ পর্যন্ত human mind (মানুষের মন) যতটা চিন্তা করেছে, তার সঙ্গে পরিচয় হয় না। ঈশ্বরের বিষয় তো সব জানা যায় না। তবুও যতটুকু ভেবেছে, চিন্তা করেছে সেটুকু জানা দরকার। (জগবন্ধুর প্রতি) কি বলেন আপনারা? (রহস্যচ্ছলে সহাস্যে) মশায়, যা বলবার আমরা বললুম,

এখন আপনারা বলুন! আমার মনে হয়, মঠে গেলেও তাঁরা তাই বলবেন।

আজ ২৪শে জুন, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ১০ই আষাঢ় ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার কৃষ্ণা অষ্টমী, ৪৯।২০ পল।

এখন সকাল সাড়ে নয়টা। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী গঙ্গানন্দ আসিয়াছেন। তিনি পরিব্রাজক। আজকাল মধ্য প্রদেশে ভ্রমণ ও প্রচার করিতেছেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমর সহিত কথা হইতেছে। আর পরিতোষপূর্বক উত্তম আম ও মিষ্টি খাইতেছেন।

মর্টন স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির আজ শেষ দিন। অপরাহ্ণে শ্রীম চারতলার ছাদ সিমেণ্ট দিয়া সারিতেছেন, সঙ্গে জগবন্ধু ও শচী।

রাত্রিতে ভক্তসভা বসিয়াছে ছাদে। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, শান্তি, ছোট রমেশ, বড় অমূল্য, বিক্রমপুরের ভক্ত, শচী, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়াছেন্। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। শুকলাল ভক্তসেবার জন্য অনেকগুলি লেংড়া আম আনিয়াছেন।

শ্রীম (শান্তির প্রতি)—তুমি এই চারটে আম নিয়ে যাও। ঠন্ঠনের মা কালীকে দর্শন করে দু'টো আম ওখানে দিও। আর দু'টো দিও ঠাকুরবাড়ীতে।

শুকলাল—শান্তিবাবু, এই চার আনার পয়সাও নিন্, মায়ের কাছে দেবেন।

শ্রীম—চৌদ্দ পয়সার সন্দেশ কিনে দিও, আর দু'পয়সা দিও প্রণামী।

শ্রীম (সিঁড়ির ঘরে জগবন্ধুর প্রতি)—আপনিও একবার মা কালীকে প্রণাম করে আসুন না। আর সন্দেশটা মা কালীকে নিবেদন করে দিলে চেয়ে নিয়ে আসবেন। ভক্তদের দেওয়া হবে। ওখানে থাকলে waste (নষ্ট) হবে। লজ্জা করবেন না। একটি রেখে দিতে বলবেন। নিবেদন করা হয়ে গেলে পর বলবেন।

ভক্তরা আম ও সন্দেশ প্রসাদ পাইতেছেন ছাদে।

শ্রীমর এক আত্মীয়া ৺বদ্রীনারায়ণ হইতে ফিরিবার পথে কলেরায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ঝি ও রাঁধুনী ব্রাহ্মণ সেবা করিয়াছিল। সেই সব কথা হইতেছে।

শ্রীম ভক্তদিগকে বলিতেছেন--শুনলুম, ওঁর অসুখ হলে সঙ্গীরা ফেলে চলে যায়! তীর্থে পুণ্য করতে গেছে। তারা জানে না, বিপন্নকে সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা হয়। সর্বত্রই তিনি আছেন। এটা লোক বুঝতে পারে না। তাই তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন, আমি এই এই মানুষে ও জিনিসে বেশী প্রকাশিত। বিপন্ন এর মধ্যে একটি।

রাত্রি সওয়া নয়টা। শ্রীম ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার মোটরে শিকদারবাগান যাইতেছেন ঐ আত্মীয়ার মৃত্যুর সম্বন্ধে আরও সংবাদ জানিবার জন্য। ডাক্তারেব মোটরে আজ এই প্রথম উঠিলেন।

পরদিন ২৫শে জুন বুধবার ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। আজ মর্টন স্কুল খুলিয়াছে। শ্রীম ব্যস্ত। এখন সকাল সাতটা। জগবন্ধু ও বিনয়কে চারতলার ছাদ মেরামত করিতে নিযুক্ত করিয়া নিজে নীচে আফিসে গেলেন। সাড়ে এগারটার সময় স্কুলের আফিস হইতে জগবন্ধু ও গোপেনকে ডাকাইয়া তিনতলায় আনিয়া বলিলেন, স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ শীঘ্র কপি করে দাও। মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। পরে এই সকল প্রবন্ধই 'কথামৃতে'র পঞ্চম ভাগের পরিশিষ্ট-রূপে প্রকাশিত হয়।

সন্ধ্যার সময় শ্রীম ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছেম ভক্তসঙ্গে। বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, শচী, ছোট রমেশ, শান্তি, বলাই, ছোট জিতেন, বিক্রমপুরের ভক্ত, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন। সাড়ে সাতটার সময় আসিলেন খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ)—সঙ্গে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ আর বিমুক্তানন্দ ও ব্রহ্মচারী কানাই। কয়েকদিন পূর্বে অদ্বৈতাশ্রমে রজ্জুতে সর্পভ্রমে একটি দুর্ঘটনা হয়।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ* স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, 'সাপ সাপ'। ব্রহ্মচারী মহাবীর ঐ কথা শুনিয়া ঘুমের ঘোরে একটা কোমরবন্ধ দেখিয়া ঐটাকে সর্প মনে করিয়া বেগে ঘরের বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মাথা চৌকাঠে আঘাত লাগিয়া ফাটিয়া যায় আর ব্রহ্মচারী সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে এক তলায় পড়িয়া যান। সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থা। ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ আসিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ব্রহ্মচারীর জ্ঞান সঞ্চার করেন। এখন তিনি শয্যাগত—একজন রোগী।

শ্রীম (স্বামী বিমুক্তানন্দের প্রতি)—সর্পভ্রমে রজ্জুতে যাঁর বিভ্রাট ঘটেছিল তিনি এখন কেমন আছেন? সকলেরই এই রজ্জুতে সর্পভ্রম। মিছে, 'আমি আমি' করছে। কিন্তু বস্তুতঃ কিছুই নাই।

স্বামী বিমুক্তানন্দ—এখন তিনি একটু ভাল। কিন্তু শয্যাগত।

*বিগত ১১. ৩. ৭৫ তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এক পত্রে গ্রন্থকারকে জানাইয়াছেন—"এই বিবরণ ঠিক নয়। আমি স্বপ্নে "সাপ সাপ" বলিয়া উঠিও নাই বা দৌড়াইও নাই এবং পড়িয়াও যাই নাই। প্রকৃত ঘটনাটি এইরূপ: শঙ্কর ঘোষ লেনে অদ্বৈত আশ্রমে থাকাকালীন গরমের সময় এক রাত্রিতে আমরা অনেকে ছাদের ওপর পাশাপাশি শুইয়াছিলাম। সেইদিন স্বামী গঙ্গেশানন্দজীও (দ্বিজেন মহারাজ) সেখানে ছিলেন। তিনি শেষরাত্রে মজা করিবার জন্য তাঁহার পাশে যিনি শুইয়াছিলেন (সম্ভবতঃ স্বামী দয়ানন্দজী—বিমল মহারাজ) তাঁহাকে হঠাৎ "সাপ, সাপ" বলিয়া উঠেন। সে সময় আমার ও অন্যান্যদের আগে থাকিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ওঁর "সাপ সাপ" বাক্য শুনিয়া কেহই উঠিও নাই, দৌড়াইও নাই, কিছুই করি নাই। কিন্তু তাঁহার ওই কথা শুনিয়া এক দক্ষিণ ভারতীয় ব্রহ্মচারী, যে একটু দূরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, চমকাইয়া উঠিয়া পড়ে ও দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় পড়িয়া যায় এবং বেশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই হইল প্রকৃত ঘটনা। পরবর্তী সংস্করণে এইটি সংশোধন করিলে সুখী হইব।"

শ্রীম—দেখ, কি কাণ্ড! এই ভাল লোক, মিছে একটা কথা শুনে কি কাণ্ড করে বসেছে! যে একথালা ভাত খেত সে এখন দুধ সাগু খাচ্ছে। এই helpless (অসহায়) অবস্থা সকলেরই।

খোকা মহারাজ ঠাকুরের শিষ্য ও শ্রীমর ছাত্র। ঠাকুর তাঁহাকে বালক বয়সে বলিয়াছিলেন, তুমি মাস্টারের কাছে যেও—তোমাদের পাড়ার লোক। ওখানে গেলে তার মুখে এখানকার (ঠাকুরের) কথাই শুনতে পাবে। এখন তিনি বৃদ্ধ। তথাপি গুরুবাক্য পালন করিতে সর্বদা আসা-যাওয়া করেন। বাহিরে গেলে আসিয়া বিদায় লইয়া যান। আর বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করেন। সম্প্রতি তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়াছেন। তাই শ্রীমর সঙ্গে ঢাকা, সোনারগাঁ প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণের কথা হইতেছে। ওদেশে ঠাকুরের বহু ভক্ত আছে শুনিয়া শ্রীমর আনন্দের সীমা নাই। শ্রীম বলিতেছেন, ভক্ত যে হবে তার তো আশ্চর্য কিছু নাই। ঠাকুর ওদেশে যেতে চেয়েছিলেন। পদ্মা দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। তাঁর দৃষ্টি যখন পড়েছে ওদেশে তখন নিশ্চয় ভক্ত হবে। তা ছাড়া তিনি বলেছিলেন, আমিই গৌরাঙ্গ। তিনি ঐ দেশেরই লোক কি না। তাই ওদেশের লোকের অত ভক্তি।

বহুকাল হইতে শ্রীমর কাছে আসিলে, খোকা মহারাজ এইরূপ উপচারে পূজিত হন—এক প্যাকেটে হাওয়া গাড়ী সিগারেট ও একটি দেশলাই, এক বোতল সোডাওয়াটার আর বড় দু'টি রসগোল্লা। আজও তিনি এই পঞ্চোপচারে পূজিত হইলেন। অধিকন্তু হইল একটি বড় লেংড়া আম। অপর সাধুদিগকেও দেওয়া হইল আম আর রসগোল্লা। সাধুগণ কিছুক্ষণ পর বিদায় লইলেন।

শ্রীম (অন্তর্মুখীন দৃষ্টিতে সকলের প্রতি)—লোকে ভাবে, আমার সব খাওয়া (জ্ঞান) হয়ে গেছে, যেমন বানর ভাবে। বানরের সামনে খাবার রাখলে তাড়াতাড়ি সব মুখে ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু বস্তুতঃ খায় না—গলায় ঝুলিয়ে জমিয়ে রাখে। তেমনি অনেকে মনে করে আমাদের অনেক খাওয়া হয়ে গেছে—অত ঈশ্বরের কথা শোনা

গেছে। কিন্তু হজম হয় নাই। শুনেছে বটে, কিন্তু কাজে লাগায় নাই। জীবনে ফলাতে চেষ্টা করে নাই। তাই প্রকাশ নাই। তাই অন্য জিনিস খেতে ইচ্ছা হয়—বিষয়ভোগে মন দৌড়ায়। শুধু শুনলে কি হবে? মাথায় রাখলেও কিছু হবে না, যদি না নিজের জীবনে পালন করার প্রবল চেষ্টা হয়। ঢিমেতেতালায় কাজ হয় না। শোনার পর উগ্র-চেষ্টা চাই। প্রাণ যায় যাক্, তবুও ছাড়বো না চেষ্টা—তবে সত্যিকার খাওয়া হয়, জ্ঞানলাভ হয়।

এখন রাত্রি নয়টা। শ্রীম উঠিয়া পড়িলেন। আজও ডাক্তারের মোটরে শিকদারবাগান যাইতেছেন ৺বদ্রীব পথে মৃতা আত্মীয়ার সংবাদ লইতে।

২

মর্টন স্কুলের চারতলার সিঁড়ির ঘরে শ্রীম বসা। এখন সকাল সাতটা। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন, আজকের মধ্যে এই প্রবন্ধগুলির (স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে) পাণ্ডুলিপি তৈরী করে 'বসুমতী'তে দিতে হবে। সন্ধ্যার মধ্যে অবসর সময়ে লিখিয়া জগবন্ধু পাণ্ডুলিপি 'বসুমতী' আফিসে পাঠাইয়া দিলেন।

আজ ২৬শে জুন, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ১২ই আষাঢ়, ১৩৩১ সাল। বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা দশমী ৫১।৩০ পল।

সন্ধ্যায় ভক্তসভা বসিয়াছে চারতলার ছাদে। শ্রীম চেয়ারে বসা—উত্তরাস্য। ভক্তগণ শ্রীমর সামনে তিন দিকে বেঞ্চিতে বসিয়াছেন—বড় জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, ছোট রমেশ, শান্তি, শচী, জগবন্ধু প্রভৃতি। আলো আসিতেই শ্রীম ও ভক্তগণ ধ্যান করিতেছেন। তাহার পর শ্রীম নিজেই মায়ের নাম গান করিতেছেন—'মজলো আমার মন ভ্রমরা'। আর কখন কি রঙ্গে থাক মা'। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—যাকে দেখলে ভগবানের উদ্দীপন হয় তাকে বলে ভক্ত। কেন হয় উদ্দীপন? না, সে যে দিবানিশি ঈশ্বরের ভজনা করে কায়মনোবাক্যে। কায়দ্বারা ভজন মানে, হাতে

তাঁর কাজ করা—ফুল তোলা, বাসন মাজা, মন্দির মার্জনা করা, সাধু ভক্তদের সেবা করা, ভোগ রাঁধা, এইসব। আবার চোখ দিয়ে তাঁর রূপ দর্শন কবা, পায়ে হেঁটে তাঁব স্থানে যাওয়া, হাতে তাঁর পাদস্পর্শ করা, পদসেবা করা, কর্ণে তাঁর নামগুণ কীর্তন শোনা, জিহ্বা দিয়ে নামগুণ কীর্তন করা, আর প্রসাদ, চরণামৃতাদি আস্বাদন করা। আর নাসিকা দিয়ে তাঁর প্রসাদী পুষ্পের আঘ্রাণ করা, ধূপ ধূনা অগুরুর গন্ধ গ্রহণ করা। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়কে তাঁর কাজে লাগান। আর মন দিয়ে তাঁর চিন্তা করা—তাঁর রূপ, লীলা ও মহাবাক্য। এইরূপ যে করে তাকে দেখলে ঈশ্বরের কথাই মনে জাগ্রত হয়।

আব সাধুকে? সে সব ভোগ ছেড়েছে। যদি বল, এসবের দরকাব কি—সব ভোগ ছাড়া, কি কায়মনোবাক্যে তাঁব সেবা করা? তার উত্তর এই—মৃত্যু যে সামনে রয়েছে—কি করবে অন্য জিনিস দিয়ে? সব যে পড়ে থাকবে! কেবল সঙ্গে যাবে ঐটি—ভক্তি, তাঁর উপর ভালবাসা। মৃত্যু যদি abolished (বন্ধ) হয়ে যায় তবে ভোগ করা চলে। কিন্তু তা তো হবার নয়, তাই ত্যাগ—সংসারভোগ ত্যাগ, যতটা সম্ভব। পরে সম্পূর্ণ ত্যাগ—'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' তখনই হয় নবদেবত্ব লাভ। এইটিই মানুষের চরম কাম্য—সদানন্দময় অবস্থা।

আনন্দে সৃষ্টি, আনন্দে পালন, আবার আনন্দে বিনাশ—এসব কথা উপনিষদে আছে। মানুষ প্রথম তু'টো আনন্দ বোঝে—'আনন্দে বিনাশ' এটা বুঝতে পারে না। কিন্তু ভগবানের এই কার্যেই আনন্দ। আনন্দ যে তাঁর স্বরূপ। লোকে দেখে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ। পরন্তু তাঁর দৃষ্টিতে সব আনন্দ। এই সবই যে মিথ্যা। তিনিই সত্য।

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' জার্মান ফিলজফার সোফেনহার উপনিষদের এই স্থানটা দেখে আনন্দে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে পড়েছিলেন। তাই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন,

'It has been solace of my life. It is the solace in my death. (আমার জীবন ও মরণের একমাত্র সান্ত্বনা এই মহাবাক্য)। মহাপুরুষ লোক ছিলেন। সকালে জলখাবার পর ঐ আসনে বসেই শরীর ত্যাগ করেন সমাধিতে। ডাকাডাকি করেও ওঠেন না দেখে servant (ভৃত্য) বুঝতে পারল শরীরত্যাগ হয়েছে। একটা হোটেলের দু'খানা ঘরে বসেই ত্রিশ বছর কাটিয়ে দিলেন—এরূপ শোনা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক ছিলেন তিনি।

মৃত্যুভয় এই ভাবনাতে দূর হতে পারে—যদি লোক ভাবে, আমরা যাচ্ছি ভাল স্থানে। এটা অভ্যাস করতে হয় সারা জীবন। যদি লাভের আশায় মানুষের কোন কষ্টই কষ্ট বলে বোধ না হয়, তবে মৃত্যুচিন্তায় কেন সে ভীত হবে—যদি তার বিশ্বাস থাকে মৃত্যুর পর পরমানন্দ লাভ হবে। এইরূপ যাদের বিশ্বাস, তারা জীবিতাবস্থায়ও আনন্দে থাকে—'নাভিনন্দতি মরণং নাভিনন্দতি জীবনং'। ভৃত্যের মত তারা মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকে—জীবন্মুক্তগণ। দিনের কাজ শেষ হয়ে গেলেই ভৃত্য নিজ গৃহে চলে যায় আনন্দে। এদের কাছে মৃত্যু বরং আদরণীয়। কেন না, এরপর সদা পরমানন্দ উপভোগ হবে বলে, দেহ ধারণের দুঃখ হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হবে বলে—আত্মানন্দের আশায়। দেহ ধারণ করেও যদি সর্বদা সমাধিতে থাকতে পারেন কেউ, তবে তিনিও আত্মানন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু এ অবস্থায় সর্বদা থাকা যায় না। দেহধারণের দুঃখ অবতরাদিকেও ভোগ করতে হয়। তাই মৃত্যু তাঁদের কাছে পরম মিত্র—কেন না, এর পরই নিত্যানন্দ উপভোগ করবেন।

সাধুদের 'শান্ত' বলে। তার মানে, তাঁদের শান্তি আছে অন্তরে। তাহলেই যথার্থ সুখ আছে। তবেই আনন্দ উপভোগ তাঁরাই করতে পারেন। একদিন একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, শান্তি হয় কিসে? অমনি ঝট্ করে উত্তর করলেন—ক্ষোভ, বাসনা গেলে। ক্ষোভ মানে, agitation of the mind—চিত্তচাঞ্চল্য, মনস্তাপ।

বড় জিতেন—তাঁদের খিদেটিদেতে agitated (চঞ্চল) হয় না মন?

শ্রীম—হাঁ, হয়। বালকের অবস্থা—পেলেই তুষ্ট। সাময়িক। কিন্তু অপরদের মন সর্বদা চঞ্চল। কত বাসনা রয়েছে ভিতরে। তারা সর্বদা নাড়াচাড়া দেয়। আর সাধুর এক বাসনা—ঈশ্বর। আর দেহধারণের জন্য একটু থাকে। সেটুকু পেলেই আবার শান্ত।

শ্রীম (রমেশ গুপ্তের প্রতি)—অবিদ্যার ছেলে কে? ঠাকুর বলতেন, যে টাকার জন্য, চাকরীর জন্য ঘরে ঘরে ফেরে। আবার বিয়ের জন্য পাগল! শুধু তাই নয়। আবার নিজে কনে দেখতে যায়। (গ্রাবা বক্র করিয়া) আবার এমন এমন করে দেখে। ছি ছি!

শ্রীম (সকলের প্রতি)—কিন্তু যারা বিয়ে করে নাই তাদের বড্ড chance (সুবিধা)। তারা কারুকে care (গ্রাহ্য) করে না! তারা looking the whole world in the face (সমগ্র জগৎ চোখের সামনে রেখে নির্ভয়ে) চলে যায়। আর যারা বিয়ে করে ফেলেছে তাদেরও কম chance (সুযোগ) নয়। এখন যে অবতার এসেছেন! ঠাকুর অবতার কিনা—নিজে বলেছেন। আর বলেছেন নিজের ঘরে দাসীর মত থাকবে। স্ত্রীর সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরীয় বিষয় আলোচনা করবে। এক বিছানায় শোবে না, এক ঘরে শোবে না। স্ত্রীকে পূজোপাঠে লাগাবে। তাঁর এই ব্যবস্থা শুনলে, পালন করলে তাদের আর তত ভয় থাকে না। তাদের case (ব্যাপার) complicated (জটিল) একটু। তা হোক। তিনি কি আর তাদের case (সমস্যা) solve করতে পারেন না? তিনি যে অবতার! 'But with God all things are possible', বন্যা এলে ডাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল হয়, ঠাকুর বলতেন। এখন যে ধর্মের বন্যা—ঠাকুর অবতার যে এসেছেন!

একটা বেজী বেশ আরামে দেয়ালের উপর বসে ছিল। একটা দুষ্টু ছেলে হঠাৎ একটা ইঁট বেঁধে দিলে তার ল্যাজে। আর তো সে চলতে পারে না! বিয়ে যারা করেছে তাদের এই অবস্থা। ইচ্ছামত, চলতে পারে না। যারা বিয়ে করে নাই তাদের মুক্ত গা।

তাই ঠাকুর রাখাল মহারাজকে বলেছিলেন, বরং শুনবো তুই গঙ্গায় ডুবে মরেছিস্, তবু যেন না শুনি তুই চাকরী করছিস্, অন্যের গোলামি করছিস্। তিনি অল্প বয়সেই বিয়ে করেছিলেন।

৩

বিবেকানন্দের জীবন দেখ। আমেরিকায় কত সব সুন্দরী মেয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইতো! একদিন একটি পরমা রূপসী মেয়ে বিয়ের প্রস্তাব করলো। সে আবার heiress—multi-millionaire-এর (ক্রোড়পতির) কন্যা। এক মিলিয়ন—মানে, দশলাখ টাকা—তার বহুগুণ অর্থশালিনী সেই মেয়েটি। সেই মেয়েটি বললো, আমাকে গ্রহণ কর। আর আমার এই অতুল ঐশ্বর্য নাও। বিবেকানন্দ উত্তর করলেন—ভদ্রে, আমি সন্ন্যাসী। আমার বিয়ে করতে নেই। মেয়েটি বললো, কেন নাই? তুমি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে discuss (বিচার) কর। চেয়ে দেখ, সমস্ত বিশ্বে সব জীবজন্তু, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, সব mated (যুগল)। বিবেকানন্দ তখন উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমার মাহুত নারায়ণ বারণ করেছেন বিয়ে করতে। তাঁরই কথা শুনবো। মাহুত নারায়ণ মানে, হৃদয়ে যিনি আছেন অন্তর্যামী ঈশ্বর। তিনিই ঠাকুর—অবতার। আহা কি বীর! কি দৈবী instinct (ভাব) দিয়ে তাঁকে গড়েছিলেন ঠাকুর!

যে টাকার নামে মুখে জল আসে তা উনি গ্রাহ্যও করলেন না। আবার পরমাসুন্দরী রমণী! অত টাকা, যাকে বলে অতুল ঐশ্বর্য, সেই টাকা। যে রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল আলেকজাণ্ডার, সেই রূপকে তিনি পায়ে ঠেলে ফেলে দিলেন একটা নীরস মলিন বাসি ফুলের মত। রূপকথায় যাকে একটা রাজ্য ও রাজকন্যা বলে, তাই তিনি পরিত্যাগ করলেন—থুথুর মত। কি বজ্রকঠোর লৌহে ঠাকুর গড়েছিলেন নরেনের মন! আর সর্বদা ঠাকুরের জাগ্রত অধিষ্ঠান সেই মনে। তবেই তো এই বিশ্বগ্রাসী প্রলোভনের সময় ঠাকুরকেই মনে পড়লো। তাইতো দোহাই দিলেন, 'মাহুত নারায়ণের!' ঠাকুর

নরেন্দ্রকে শিখিয়েছিলেন, সন্ন্যাসীর বিয়ে করতে নাই। স্ত্রীজাতি তার কাছে মাতৃজাতি।

রমেশ, শচী ও শান্তির বিবাহের কথা হইতেছে। তাই কি শ্রীম দিগ্বিজয়ী বীরাগ্রণী বিবেকানন্দের এই দেবদৃশ্য তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিলেন?

শ্রীম (অবিবাহিত যুবকদের প্রতি)—তাই সাধুসঙ্গ করতে হয়। তবে মনে তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজবৃদ্ধি মানে, ইন্দ্রিয়সংযম। ভেবে দেখ না বিবেকানন্দের এই ঘটনাটি। কি বীরত্বব্যঞ্জক দৃশ্য! এই অপরূপ জাগতিক সুখ কে কাকবিষ্ঠার মত পরিত্যাগ করতে পারে অবতারাদি ছাড়া? তাই, যে এঁদের সঙ্গ করবে, তার ভিতরও এই তেজ, এই শক্তি, এই অলৌকিক ত্যাগ আসবে।

দশরথকে জিজ্ঞাসা করলেন একজন ঋষি, 'মহারাজ, আপনি তো কত রাজ্য জয় করলেন; কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় করতে পারলেন কি?' দশরথ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করলেন, 'আজ্ঞে না'। তখন ঋষি বললেন, 'তবে আর বীরত্বের অভিমান কেন?'

যে ইন্দ্রিয় সংযম করেছে—সেই যথার্থ বীর, যেমন বিবেকানন্দ।

(ছোট রমেশের প্রতি) যারা বিয়ে করে নাই এমনতর চারজন সাধু কাল এসেছিলেন।

আজ ২৭শে জুন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই আষাঢ় ১৩৩১ সাল। শুক্রবার, কৃষ্ণা একাদশী, ৫৫।১৪ পল। শ্রীম মর্টন স্কুলের সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন। এখন অপরাহ্ন চারটা। ভবানীপুরের মনু আসিয়াছে—সঙ্গে একজন বন্ধু। শ্রীম ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিতেছেন।

শ্রীম— মরুভূমিতে যেমন oasis (মরূদ্যান), মঠও তেমনি সংসার মরুতে oasis (মরূদ্যান)। শান্তির জন্য লোক সেখানে যাবে, তাই ঠাকুর এটি করে দিয়েছেন। যে যতই বড়লোক হোক—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, গুণী, ধনী, মানী হোক না কেন, কারো চিত্তে শান্তি নাই। কিন্তু তাঁর ভক্ত হলে, তাঁর দাস, পুত্র হয়ে, যন্ত্র হয়ে সংসারে থাকলে শান্তি। তাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে সংসারে থাকা। এই,

সম্পর্ক জ্ঞানপথেও হয়, সব পথেই হয়। যেমন টেলিগ্রাফের তার। কথাটা হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাক।

আর প্রার্থনা কর—হে ঈশ্বর, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না। গীতায়ও ডংকা মেরে ভগবান এই কথাই বলেছেন—'নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্'। ভগবানের চিন্তা যার নাই তার শান্তি নাই। আর যার শান্তি নাই, তার কদাপি সুখ নাই।

অত সোজা পথ, তবুও লোক নেবে না! তাহলে তো দুঃখ হবেই। আজ মনে করছ, বেশ আরামে আছি। কাল যদি একটি পুত্র মরে যায়, কিংবা তুমি পঙ্গু হয়ে পড়, তখন কি বলতে পার, বেশ আরামে আছি? তবে বুঝি, বীব! যদি তা না পার তবে কেন বলছ মিছে, বেশ আছি। এমন একটা অবস্থা মনে তৈবী না হওয়া পর্যন্ত—যে অবস্থায় সাংসারিক সর্বাবস্থায় মনে শান্তি থাকে—'বেশ আছি' বলা চলে না। সেটি হয় ঈশ্ববেব সঙ্গে একটি জীবন্ত সম্পর্ক পাতাতে পারলে। আব বিশ্বাস থাকলে—ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময়। এমন বিশ্বাস চাই, ঈশ্বর জন্মে জন্মে আমাব স্নেহময়ী মাতা। এই বিশ্বাস একেবারে পাকা হয় ঈশ্বরকে দর্শন করলে। ক্রাইস্ট এই বিশ্বাসেই ক্রসেব যাতনা অম্লান বদনে ভোগ করলেন।

যদি নিজের এই বিশ্বাস, পাকা বিশ্বাস না থাকে তবে alternative (অন্য উপায়) গুরুবাক্যে বিশ্বাস। গুরু মানে ঈশ্বর, অবতার, ঠাকুর। যাঁদের এইরূপ বিশ্বাস হয়েছে, তাঁদের সঙ্গ করলে তোমাব এই বিশ্বাস হতে পারে। তাঁদেরই বলে সাধু। তাঁরাই থাকেন মঠে। তাই মঠে থাকা, মঠে যাওয়া দরকার।

একজন ইঞ্জিনিয়ার আসিলেন। শ্রীম তাঁহাকেও পুনরায় ঐ কথাই বলিলেন। জগবন্ধু শ্রীমর আদেশে পাশেই বসিয়া 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায় কপি করিতেছেন।

সন্ধ্যার পূর্বে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। ভক্তসভা ছাদে বসিয়াছে, বৃষ্টি আসায় পুনরায় সিঁড়ির ঘরে আসিয়া বসিলেন সকলে।

শুকলাল, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, নলিনী, বিনয়, মন্নু ও সঙ্গী, শচী, শান্তি, ছোট রমেশ, ফকির, বলাই, দিনাজপুরের ভক্ত, জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীমর পাশে ও সম্মুখে বসিয়া আছেন। শ্রীম বসা দক্ষিণাস্য চেয়ারে, দরজার পাশে। অনেকক্ষণ ধ্যান হইল। তারপর শ্রীম বলিলেন—'স্বামী বিবেকানন্দ' নামক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে। জগবন্ধু পড়িতেছেন—'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর।' নরেন্দ্র 'সহস্রদল পদ্ম', 'বড় দীঘি', 'রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই', 'বড় যুটোওয়ালা বাঁশ', 'নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়—আসক্তি, ইন্দ্রিয় সুখের বশ নয়।' প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ হইলে শ্রীম বলিলেন, কিছুকাল চুপ করে এই কথাগুলি আপনারা ধ্যান করুন। তারপর এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতে বাড়ী যান।

কলিকাতা
২৭শে জুন, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, মঙ্গলবার

অষ্টাদশ অধ্যায়

সনাতন ধর্মবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ

১

এখন সকাল সাড়ে সাতটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দার পূর্বধারে বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন—পাশে শচী। প্রুফ দেখিতেছেন। শচী কপি পড়িতেছে আর শ্রীম compare (গরমিল আছে কি না লক্ষ্য) করিতেছেন। জগবন্ধু পাশে বসিয়া জেনারেল ফিলজফি পড়িতেছেন। শ্রীম আদেশ করিয়াছেন, শচীকে উহা পড়াইতে হইবে। শ্রীম প্রুফ শুদ্ধ করিতেছেন আর শচীকে সংকেতগুলি শিখাইয়া দিতেছেন। মাঝে মাঝে উপদেশও দিতেছেন।

শ্রীম (শচীর প্রতি)—অক্ষরগুলি খুব স্পষ্ট করে লিখতে হয়।

ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা। ভাবের বাহন ভাষা। এখন সেই ভাষাই যদি না বোঝা যায় তাহলে ভাব বুঝবে কি করে? ভাষার প্রকাশক অক্ষর। এসব symbol (সংকেত)। তাই এগুলি খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার। নচেৎ অর্থ হয়ে যায় অন্য রকম। তাছাড়া পাঠকের কষ্ট হয়।

তার জন্যই বলছি পড়তে বি. এ.টা। এতে অনেকগুলি moral qualities developed (নৈতিক গুণসমূহ পরিপুষ্ট) হয়। 'কালচার' মানে কর্ষণ, চাষ। মনের কর্ষণ হয়, ভাল সংস্কার হয় পড়াশোনা বেশী করলে। টাকাপয়সা রোজগার করাই কি কেবল পড়াশোনা করার উপকারিতা? এই পড়াশোনায় কত গুণ বাড়ে দেখ। প্রথম—patience (ধৈর্য) দ্বিতীয়—perseverance (অধ্যবসায়), তৃতীয়—accuracy (যাথাযথ্য), চতুর্থ—attention (মনোযোগ), পঞ্চম—concentration (একাগ্রতা), ষষ্ঠ—sense of responsibility (দায়িত্ববোধ), সপ্তম—breadth of vision (দৃষ্টির প্রসারতা), অষ্টম—perception (অনুভূতি), নবম—application (কার্যকুশলতা)।

Well-informed (জ্ঞানবিশারদ) না হলে গোঁড়ামী এসে ঢোকে। এমন সংবাদ রাখা উচিত, অন্য জাতির foreign policy (বৈদেশিক নীতি) কি। সব খবর জানা থাকলে লোক চেনা যায় শীঘ্র। এই দেখ না, অনঙ্গ এম. এ. পাশ করেছে বলে নূতন লোক হলেও মঠের management (ব্যবস্থাপনা) ওর হাতে ছেড়ে দিয়েছে। অন্য লোক তো কত আছে, তাদের দেয় নাই। আবার দেখ, সুভাষ বোস, সাতাশ বছর মাত্র বয়স—তাকে করে দিলে কর্পোরেশনের চীফ্ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার। একে আমরা watch (পর্যবেক্ষণ) করছি। দেখছি, বেশ চালাচ্ছে। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে ওঠে কি না চিঠিগুলি। যখন যা করা উচিত তা করছে।

তার মানে, তারা কত examine (পরীক্ষা) পাশ করেছে। আই. সি. এস. পাশ করেছে। এতে কি বোঝা যায়? না, sense

of responsibility (দায়িত্বজ্ঞান) আছে। আর সবগুলি moral qualities (নৈতিক গুণ) আ..ছ। Accuracy (যাথাযথ্য) রয়েছে—মানে, ভুল হয় না—carefully (সাবধানে) সব করে। Attention (মনোযোগ) আছে বলেই মনে কর, যাজ্ঞবল্ক্য অভিনয় মঠের সাধুরা করেছেন। Concentration (একাগ্রতা) এখন আমার নেই বলেই আমি (কথামৃত) লিখতে পাাব না। ও করলেই শরীরের অসুখ বেড়ে যায়।

শ্রীম (বিনয়ের প্রতি)—মুখস্থ বল গীতার শ্লোক। রোজ দু'টি করে মুখস্থ করবে। (শচীর প্রতি) তুমিও বল তোমার পড়া মুখস্থ।

অপরাহ্ণ তিনটা হইতেই শনিবারের ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দিন আফিস সকালে ছুটি হয়। ললিত রায়, ভোলানাথ মুখার্জী প্রভৃতি আসিয়াছেন। ললিতের সঙ্গে দুইজন নূতন লোক আসিয়াছেন, একজন উকিল।

শ্রীম পাঁচটার সময় ছাদে আসিয়া চেয়াবে বসিলেন। নীচে মাদুরে ভক্তগণ বসা। একটু পর একজন বৈষ্ণব ভক্ত আসিলেন—ললাটে তিলক, গায়ে নামাবলী। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল, উনি একজন পদকীর্তনীয়া। তাই শ্রীমর ইচ্ছায় সখীসংবাদ পদাবলী গান হইতেছে। বেশ মিষ্টি গলা আর ভক্তিমান লোক। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণ কাতর—রাধা উন্মাদিনী। শ্রীম চেয়ার ছাড়িয়া মাদুরে আসিয়া বসিলেন, আর ধীর কণ্ঠে কীর্তনীয়ার সহিত গাহিতে লাগিলেন। শ্রীম ভাবস্থ। দুই ঘণ্টার উপর এই কীর্তন চলিতেছে। শ্রীম কখন গাহিতেছেন, কখন একেবারে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন, কখন প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। ইতিমধ্যে নিত্যকার ভক্তগণ—বড় জিতেন, ছোট জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, বড় অমূল্য, শচী, শান্তি, ছোট রমেশ, রমণী, ডাক্তার, বিনয়, ভৌমিক, বলাই, অমৃত, মাখন, বিক্রমপুরের ভক্ত, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়া যোগদান করিলেন। ভক্তরাও কেহ কেহ সঙ্গে গাহিতেছেন। কীর্তনের উন্মাদনায় অনেকেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন। যাঁহারা বসিয়া ছিলেন শ্রীমর ইঙ্গিতে তাঁহারাও

দাঁড়াইয়া বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্তন করিতেছেন। শ্রীম মধ্যস্থলে। এরপর দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য।

এইবার শ্রীম গাহিতেছেন, 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে আমার প্রাণ রে।' এইবার কীর্তন উচ্চ রোলে চলিতেছে, নৃত্যে বুঝি ছাদ ভাঙ্গে। শ্রীম ক্লান্ত হইয়া কীর্তনমণ্ডলের উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া দক্ষিণাস্য হইয়া দর্শন করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পর ভক্তগণের উন্মাদনা চরম সীমায় উঠিল। স্থান কাল ভুল হইয়া গেল। খালি শোনা যাইতেছে, 'জয় রাধে গোবিন্দ বল'। শেষে কেবল শোনা যাইতেছে, 'জয় রাধে' 'জয় রাধে'। দেড় ঘণ্টা এই মধুর কীর্তন ও নৃত্য চলিল।

মর্টনের ছাদ আজ যেন নবদ্বীপ। কীর্তনীয়া দুইবার ভাবাবেগে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। আবার তাঁহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইল। খোল করতাল কিছুই নাই, কেবলমাত্র যন্ত্র ভক্তগণের করতালি। স্বভাবগম্ভীর শ্রীম আজ যেন এলোমেলো হইয়া পড়িলেন।

এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। শ্রীম ও ভক্তগণ সকলে মাদুরে বসিয়াছেন। কীর্তনীয়া কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে 'আমি অধম, আমি অধম' বলিতেছেন।

শ্রীম (কীর্তনীয়ার প্রতি)—ঠাকুর বিজয় গোস্বামীকে বলেছিলেন, একশ'বার 'আমি অধম, আমি অধম' বলা কেন? বল, আমি একবার তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ!

কীর্তনীয়া (করযোড়ে)—কি করবো—উপায়?

শ্রীম—সে কি আমরা বলতে পারি? আপনার গুরু রয়েছেন। তিনি যা বলবেন তাই করবেন। পরমহংসদেব বলেছিলেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি দেখা দেন। বলেছিলেন, আন্তরিক হলে শুনবেনই শুনবেন।

এই সবই তিনি। চাঁনীতে দাঁড়িয়ে ঠাকুর বললেন, মা আমায় ধপ করে দেখিয়ে দিলেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। আর

বলেছিলেন, নবদ্বীপে যিনি গৌরাঙ্গ হয়েছিলেন সেই গৌরাঙ্গই আমি। কেবল অন্তরঙ্গদের বলতেন এই কথা, সকলকে নয়।

পর দিন রবিবার। সকালে মর্টন স্কুলের নিম্নতলে 'সৎপ্রসঙ্গ সভা' বসিয়াছে। মর্টন স্কুলের কৃতী ছাত্র প্রণবপ্রকাশ সেন গত ১৯শে তারিখ শরীর ত্যাগ করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পরই সংবাদ আসিল সে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পাইয়াছে। তাহার স্মৃতিতেই আজ শোকসভা। শ্রীম জগবন্ধু'কে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—মর্টন স্কুলের সকল ছাত্রগণ গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি যেন কণ্ঠস্থ করে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি॥
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

সভাভঙ্গের পর জগবন্ধু ও বিনয় কাশীপুরে ডাক্তার বক্সীর বাড়ীতে গেলেন। রাত্রিতে ডাক্তারের সহিত ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, শ্রীম অপরাহ্ণে বীরেন বসুর মোটরে ৺পুরীর বিখ্যাত সাধু বাসুদেব বাবাজীকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। বাসুদেববাবা শ্রীমর অতি প্রিয় সুহৃদ।

২

পরের দিন সোমবার। অপরাহ্ণ পাঁচটা। বেলুড় মঠ হইতে মুক্তি মহারাজ (স্বামী নির্গুণানন্দ) আসিলেন। অন্তেবাসী তাঁহাকে চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসাইয়াছেন। পাশেই শ্রীমর কক্ষ। কিয়ৎক্ষণ পর শ্রীম বাহিরে আসিয়া বসিলেন বেঞ্চিতে। সাধু দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা ও প্রণাম করিলেন। শ্রীম পূর্বেই যুক্তকরে নমস্কার করিয়াছেন। সাধুকে মঠের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কথা-প্রসঙ্গে সাধু শ্রীমকে প্রশ্ন করিতেছেন।

স্বামী নির্গুণানন্দ—নির্বিকল্প সমাধি কি, মহাভাব কি?

শ্রীম—ঠাকুরের এই দুই অবস্থাই হতো। চৈতন্যদেবেরও হয়েছিল। ঠাকুর বলতেন, শ্রীকৃষ্ণেরও একবার হয়েছিল। বেশ বোঝা যায় এটা। তখন সকলে ভীষ্মের শরশয্যায় উপস্থিত ছিলেন।

পাণ্ডবরা দেখে বড়ই ভয় পেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, বুঝি বা শরীর ত্যাগ হল। অবতারাদির এসব হয়। কর্ম থাকলে, বাসনা থাকলে এসব হয় না। শ্রীরাধার সর্বদা মহাভাব হতো।

ঠাকুর বলেছিলেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো। এসে আর খবর দিলে না। সব সমুদ্র হয়ে গেল—সব জল! সব সচ্চিদানন্দ-সাগর! Complete cessation of individuality (জীবত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ)। নিরাকার উপাসনায় এটি হয়—এই নির্বিকল্প সমাধি। সাকার হলে হয় মহাভাব। এখানেও এক, দুই জ্ঞান নাই। Time, space and causation এর পরের অবস্থা। ঠাকুর গান গাইতেন, 'শ্রীকৃষ্ণ-রূপসায়রে ডুবিল তরী, ফিরে না এলো।' শ্রীরাধার এই অবস্থা। চৈতন্যদেব শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রায়ই এই অবস্থায় নিমগ্ন থাকতেন। এ দু'টিই এক। জীবত্বের বিলোপ হয়। এক অদ্বিতীয় সত্তা চিদ্‌সাগর, প্রেমসাগর। একটা বিচারের শেষ, অপরটা ভালবাসার শেষ।

স্বামী নির্গুণানন্দ—আচ্ছা, সন্ন্যাস নেওয়ার সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলতেন?

শ্রীম—হুঁ, খুব বলতেন। (সহাস্যে) লোকে ভয় পাবে তাই সোজাসুজি বলতেন না। কিন্তু ভিতর ফাঁক করে দিতেন। তা না হলে কি করে হল এসব ত্যাগী! কলার ভিতর যেমন কুইনাইন—এমনি বলতেন। ছেলে কুইনাইন খেতে চায় না। মা কলার ভিতরে কুইনাইন দিয়ে খাওয়ায়। কারুকে কারুকে আবার সোজাসুজি বলেছেন সন্ন্যাসের কথা। সে খুব কম! অন্তরঙ্গদের বলতেন, ছোকরাদের—বিশেষ করে যারা বিয়ে করে নাই। যারা বিয়ে করে ফেলেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সন্ন্যাসী হয়েছে। কারুকে গৃহে রেখেছেন। সন্ন্যাস চাইলেও বলতেন, মা বলেছেন তোমাকে গৃহে থেকে তাঁর কাজ করতে হবে। লোককে তাঁর কথা শুনাতে হবে! একজন ভক্ত (শ্রীম) সন্ন্যাসের জন্য পীড়াপীড়ি করলে বলেছিলেন, কেউ মনে না করে, আমি নইলে মায়ের কাজ চলবে না। মা তৃণ

থেকে বড় বড় আচার্য সৃষ্টি করতে পারেন। তখন রাত্রি আটটা। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসা। এই মাত্র সমাধি থেকে নীচে নেমে এলেন। সব শান্তি, ঘরে আর কেউ নাই। এমনতর ব্যাপার তাঁর! 'যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি—তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।' কারুকে (শ্রীমকেও) তান্ত্রিক সন্ন্যাস দিয়ে গৃহে রেখেছেন। ভিতর ফাঁক করে দিয়েছেন—পূর্ণ সন্ন্যাস ভিতরে।

কিন্তু যাদের সব ছাড়িয়ে রাস্তায় বের করেছেন তাদের কত সুবিধা। তারা ইচ্ছা করলে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। অন্যদের কত কাজ—পাঁচটা জিনিসে মন ছড়ান থাকে। তারা মাঝে মাঝে মনটাকে তুলে এনে ঈশ্বরে বসিয়ে দেয়—ছড়ান মন কুড়িয়ে আনে। ব্রহ্মার কাছে সনক, সনন্দ ঋষিরা গেলে বললেন, বসো একটু। তারপর ছড়ান মন কুড়িয়ে এনে—তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করলেন। ব্রহ্মার অনেক কাজ কিনা! তাই সাধুদের খুব সুবিধা, যারা সব ছেড়ে দিয়েছে।

নেপোলিয়ান যখন পড়াশোনা করতেন মিলিটারি কলেজে, তখন ম্যাথ্‌মেটিকসের একটা problem solve (সমস্যার সমাধান) করার জন্য 72 hours অর্থাৎ তিন দিন একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে ছিলেন। বের হন নাই! একটা জানালা দিয়ে খাবার গলিয়ে দিত। একে বলে সন্ন্যাস—মনের যোগ।

ঠাকুর বলেছিলেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরির হিসাবও করতে পারে। সন্ন্যাসীর সর্বদা ভগবানকে ডাকা উচিত সব ছেড়ে দিয়ে। ঈশ্বর যখন অত সুবিধা করে দিয়েছেন তখন তার benefit (সুযোগ) নেওয়া উচিত, রাতদিন তাঁকে ডাকা উচিত।

শ্রীম ছাদে আসিয়া পায়চারি করিতেছেন, সঙ্গে সাধু, ভক্তগণ।

স্বামী নির্গুণানন্দ—আচ্ছা, সনাতন ধর্ম কি? যদি বলা হয় হিন্দুধর্ম—তার তো কত রূপ আছে, পথ আছে—শৈব, শাক্ত,

বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, আবার বৌদ্ধ, জৈন। এর কোন্‌টা হিন্দুর সনাতন ধর্ম ?

শ্রীম—সনাতন ধর্ম বুঝতে হলে ঠাকুরকে বুঝতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই personification of Sanatan Dharma (সনাতন ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ)। তাঁকে না বুঝতে পারলে সনাতন ধর্ম বুঝবার যো নাই। দিনবাত যারা তাঁকে চিন্তা কবে, তারাই বুঝতে পারবে। আহা, তিনি যে কি ছিলেন! নিজেকে নিজে দেখে এক একবার অবাক্ হয়ে যেতেন। তাঁর মায়ের অন্তর্জলীর সময়ে পা ধরে বলেছিলেন, 'তুমি কে গো, আমায় গর্ভে ধারণ করেছ।' তাই বলতেন, 'যারা আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তাদের এখানে আসতে হবে।'

যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন, তাঁর ঘৃণা লাভ করেছেন তাঁদের ভাবনা কি ? তাঁরা কম নন! বলতেন, তোমাদের বেশী কিছু করতে হবে না—এখানে আনাগোনা করলেই হবে। নিজেকে নিজে জানতেন। বলেছিলেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তিনি এই শরীর ধারণ করে এসেছেন। বলতেন, এখানে যারা সর্বদা আসা যাওয়া করে তারা আমার আপনার লোক, অন্তরঙ্গ। কখনও একটু জপ ধ্যান করতে বলতেন। না করলেও বিশেষ কিছু বলতেন না। কারণ, তারা যে তাঁকে সর্বদা দর্শন করছে। জপ ধ্যান তো ঈশ্বরদর্শনের জন্য। এখানে যে সাক্ষাৎ মানুষরূপে অবতীর্ণ! আর একটা মজা দেখ, পাঁচ বছরের মধ্যে সবগুলি ভক্ত এসে জুটল। ক্রাইস্টের ভক্তেরা একত্রে মিলিত হয়েছিলেন তিন বছরের মধ্যে। কিন্তু ঠাকুরকে বাইশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তবে সব অন্তরঙ্গরা একে একে আসতে লাগলো।

শ্রীম আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, সাধুকেও চেয়ারে বসাইলেন। তাঁহারা দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ পূর্ব ও পশ্চিমে স্থাপিত বেঞ্চিতে বসিয়াছেন—জগবন্ধু, বড় জিতেন, শান্তি, শচী, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি।

শ্রীম 'কথামৃত' পড়িতে বলিলেন এবং নিজেই চতুর্থ ভাগ অষ্টম খণ্ড বাহির করিয়া দিলেন। জগবন্ধু পড়িতেছেন।

পাঠক পড়িতেছেন—(শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন)…আমার বাবা গয়াতে গিছলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব।…

শ্রীম—ঝাউতলায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন নিজ মুখে, আমি অবতার। আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি। বলেছিলেন, আবার একবার আসতে হবে।

ঈশ্বর এই মানুষ হয়ে এসে বলে গেছেন, মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য ঈশ্বর দর্শন করা। আবার নিজের জীবনে এই আদর্শটিকে পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত করে গেছেন। এক নিমেষও ঈশ্বরজ্ঞান থেকে বিচ্যুত হন নাই। আমরা অনেকবার, চব্বিশ ঘণ্টা কাছে থেকে watch (পর্যবেক্ষণ) করেছি যদি কখন ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হন তা দেখতে। কিন্তু কখনও বিচ্যুত হন নাই। নিদ্রার সময়ও দেখেছি শ্বাস চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে 'মা মা' করছেন। কতখানি ভালবাসা হলে এ অবস্থা হয়! বাহ্য জগৎ, অন্তর্জগৎ সব যেন বিলুপ্ত হয়ে গিছলো তাঁর কাছ থেকে। নামরূপবান জগৎটা যেন একটি অতি ক্ষীণ শুভ্র পরদার মত ভাসতো। কখন তাও বিলুপ্ত হয়ে যেতো—জড়ত্বপ্রাপ্তি হত। কখনও জড়বৎ থাকতেন, কখনও ভাবসমাধিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকতেন। এ দু'টিই সমাধি—নির্বিকল্প ও সবিকল্প। এ দু'টিই আভ্যন্তরিক অতি সূক্ষ্ম উচ্চাবস্থা—চরম অবস্থা। বাহ্য জগতেও যখন ফিরে আসতেন, তখনও দেখছেন, ঐ অখণ্ড সচ্চিদানন্দই নামরূপে পরিব্যাপ্ত। তাই বলতেন, আমি কি বিচার করবো, এই চোখে দেখছি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন। যেন নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ; পয়েন্ট ওয়ানে, এই নামরূপ, জগৎ—যেন অতি সূক্ষ্ম একটি পরদা। যেমন বলতেন ঠাকুর, লণ্ঠনের ভিতরের আলো—কাঁচমাত্র ব্যবধান।

'আমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বরের, মায়ের ছেলে', আর মা-ই এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হয়ে রয়েছেন—এই ভাবগুলির ভিতর যাতায়াত করতেন, যেন বাচ খেলতেন, যেমন নৌকার বাচ খেলা হয়।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে—ধর্মে এই শিক্ষা দেয়, মানুষের কর্তব্য। ঈশ্বর দর্শন করা, আর ঈশ্বরই এই সব হয়ে আছেন—তারই নাম সনাতন ধর্ম। মানুষেব ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাগতিক সকল কর্তব্য ঈশ্বরের অধীন হয়ে করতে যে ধর্মে শিক্ষা দেয়, তা-ই সনাতন ধর্ম। সভা ভঙ্গ, বাত্রি নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
৩০শে জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৬ই আষাঢ় ১৩৩১ সাল
সোমবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ৪।৪২ পল

ঊনবিংশ অধ্যায়

উল্টা সমঝালয়া রাম

১

মর্টন স্কুলের চারতলাব ছাদে মাদুব পাতা হইয়াছে। এখন অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম আসিয়া দক্ষিণ প্রান্তে বসিলেন উত্তরাস্য। তাঁহার সম্মুখে ভক্তগণ বসিয়াছেন—ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বড় জিতেন, বলাই, গদাধব, শুকলাল, ছোট বমেশ, শান্তি, শচী, বিক্রমপুরেব ভক্ত প্রভৃতি।

আজ ১লা জুলাই, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ। ১৭ই আষাঢ়, ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার।

শ্রীম গত রবিবার ৺পুরীর বাসুদেববাবাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। আজ সকলে মিলিয়া তাঁহারই কথা কহিতেছেন। বাসুদেববাবা রামায়ত সাধু—বৃদ্ধ। ত্রিশ বৎসর বয়সে পর্যটন করিতে করিতে পুরীতে আসেন। এই স্থানেই পঞ্চাশ বছর ধরিয়া আছেন। অন্য কোথাও যান না। মন্দিরের ভিতরই নিজের কুটীরে সারাদিন থাকেন। রাত্রিতে আশ্রমে যান। সাতবার ভোগ হয় জগন্নাথের,

সারাদিনে। সাতবারই ভোগারতির সময় বাবাজী জগন্নাথকে চামর ব্যজন করেন। রথের পূর্বে স্নানযাত্রার পর, যখন জগন্নাথের অদর্শন হয় পনের দিন, সেই সময় কখনও ৺রামেশ্বর, কখনও কলিকাতা, কখনও অন্য তীর্থে গমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদগণকে বাসুদেববাবা অতিশয় ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি নিত্য কয়েক শত সাধু ভক্তকে পরিতোষপূর্বক মহাপ্রসাদ সেবন করান। উনিও মহাপ্রসাদই দেহধারণের জন্য সামান্য গ্রহণ করেন। অবসর সময় তক্তার উপর বসিয়া বড় অক্ষরযুক্ত রামায়ণ পাঠ করেন।

একজন ভক্ত বলিলেন, পুরীবাসের সময় ভজনে অরুচি হলেই আমি নাটমন্দিরে বাসুদেববাবার পাশে দেড় ঘণ্টা বসতাম। তারপর দেখেছি, ভজনে রুচি ফিরে আসতো নিষ্ঠার সহিত।

বড় জিতেন—সাধুসঙ্গ ছাড়া আর গতি নাই, এটা বোঝা গেছে। সাধুসঙ্গই একমাত্র পথ, এ সম্বন্ধে আর কোন সংশয় নাই।

শ্রীম—শুধু বললেই তো হবে না 'বোঝা গেছে', কাজ করতে হবে। কতকগুলি কথা repeat (আবৃত্তি) করলে কিছু হয় না। ঠাকুর বলতেন, শ্রীরাধার ভাবে—'তোদের শ্যাম কথার কথা, আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা।' এ সব গানে মানুষের মনের ফাঁকিগুলি প্রকাশ করে গেছেন মহাপুরুষগণ। হাতে-কলমে সাধন করতে সাধুর কাছে যেতে হয়। তা নইলে যেমন ঐ গানে বলা হয়েছে, কেবল 'কথার কথা'।

ডেমস্থেনিস যখন বলতেন, তখন সকলে বলতো, Let us march against Phillip (ফিলিপের বিরুদ্ধে অভিযানে চল)। আর অন্য লোক যখন বলতো (সিসারো) তখন সকলে বলতো, What a splendid orator (কি বিচিত্র বাগ্মী)! আর হাততালিতে কর্ণ বধির করে দিত। এর কোন্‌টা চাই—'What a splendid orator' (কি বিচিত্র বাগ্মী) 'অথবা Let us march against Phillip' (ফিলিপের বিরুদ্ধে অভিযানে চল)—কোন্‌টা (হাস্য)?

আর্ম চেয়ারে বসে বসে কেবল বললে কি হবে—সাধুসঙ্গ উত্তম

জিনিস। এ ছাড়া গতি নাই। যেমন বলে বাবুরা, what a beautiful flower (কি সুন্দর পুষ্প)। ইস্টিক-হাতে বাবুর গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবী, আবার সর্বাঙ্গে এসেন্স-মাখা, পায়ে কাল বার্নিশ পাম্‌সু আর চোখে চশমা।

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ বলে চেঁচালে কি হবে, নিজে না করলে?

ঠাকুর একটা গল্প বলতেন। যদু মল্লিকের কাছে একজন লোক এসেছে। সে বললে বড়বাজারে একটা বাড়ী বিক্রী হবে। যদু মল্লিকের দরকার নাই বাড়ীর। তবুও সে জিজ্ঞাসা করছে, আচ্ছা, পার্টি ভাল তো, দাম কত, কতদিনের পুরানো বাড়ী? ঠাকুর শুনে তাকে ধমক দিলেন আর বললেন, তোমার দরকার নাই, তবুও কেন খামাকা জিজ্ঞাসা করছো? অর্থাৎ যার যা স্বভাব, যার যা প্রকৃতি সে তাই করবে। হাজার অন্য কথা বল, সে তা কানে নেবে না। হদ্দ মুখে বলবে, কাজে করবে না।

বৃষ্টি আসিল। সকলে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন। কথামৃত' পাঠ হইতেছে, চতুর্থ ভাগ উনবিংশ খণ্ড। দক্ষিণেশ্বরে জ্ঞানবাবু আসিয়াছেন।

শ্রীম—যারা একটু অভিমানী তাদের মান দিয়ে মান ভাঙ্গতেন। তাই বললেন, 'হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়।' জ্ঞানবাবুর পত্নীবিয়োগ হয়েছে, মন এখন খারাপ। তাই ঔষধ দেবার উপযুক্ত সময়। অন্য সময়ে উল্টে ফেলে দেয়। কথাচ্ছলে জ্ঞানবাবুকে highest idealটি (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শটি) দেখিয়ে দিলেন। বলছেন, 'তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও।' বিজ্ঞানী অবস্থা, জনকরাজার অবস্থা। এটি কখন লাভ হয় তাও বললেন, 'তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন নির্লিপ্ত হতে পারে।' এই যে বললেন, এর কিছুটা অবশ্য হবে।

এখন চতুর্থ পরিচ্ছেদ পাঠ হইতেছে। ঠাকুর যদু মল্লিকের বাগানে আসিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কেন যেতেন যদু মল্লিকের কাছে?

ঠাকুরকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন উনি। ভিতরে ভক্তি ছিল, কখনও কাঁদতেন। ঠাকুরকে বলেছিলেন, আমি এদের (মোসাহেবদের) সঙ্গে থাকি বলে তুমি আমায় পার করবে না? ঠাকুর কে—ভিতরে তাঁর এ জ্ঞান ছিল।

কি নিরভিমান, দেখ। উনি ডেকে পাঠালেন, আর ঠাকুর অমনি চললেন। তিনি কি আর ধনী যদু মল্লিকের কাছে যেতেন? ভক্ত যদু মল্লিকের কাছে যেতেন। এই অন্তর্দৃষ্টি কার আছে? যদুবাবুর সখ্য ভাব ছিল। তিনি গৌরভক্ত ছিলেন। ভক্ত যে ছিলেন তার প্রমাণ, ঠাকুরকে উনি বললেন—তুমি একটু তাঁর নাম কর।

ভিতরে মাল না থাকলে কি ঠাকুরের ভালবাসা পায়? ঠাকুর তাঁর পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যদুবাবুর বাগানে প্রায়ই যেতেন। যখনই যদুবাবু যেতেন বাগানবাড়ীতে তখনই ঠাকুরকে ডেকে পাঠাতেন। ঠাকুর তাঁকে ভালবাসতেন।

(সহাস্যে) ভালবাসা, আবার অতি হিসেব। তিন টাকা দুই আনা গাড়ী ভাড়া। পাছে বেশী লাগে; তাই গাড়ী পৌছাতেই ভাড়া চুকিয়ে দিতেন। ওয়েটিং চার্জ তা হলে লাগবে না। ঠাকুর তাই বলেছিলেন, তুমি আড়াই টাকা দিও। তাই দিলেন। কি আশ্চর্য, বিষয়ী লোকের বিষয়ে কত প্রীতি—ঈশ্বরকে ঠেলে ফেলে দেয় স্বভাব।

রাত্রে সাড়ে নয়টা। ভক্তরা আম খাইতেছেন।

২

পরদিন ২রা জুলাই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ১৮ই আষাঢ় ১৩৩১ সাল। বুধবার, অমাবস্যা ১৪ দণ্ড। ১৭ পল।

শ্রীম মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। এখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। আকাশ নির্মল হইয়াছে। উজ্জ্বল সূর্য আকাশে বিরাজ করিতেছে। গত কয়দিন বেশ বৃষ্টি-বাদল গিয়াছে। মৃদু মন্দ বায়ু বহিতেছে। শ্রীমর পাশে বেঞ্চিতে জগবন্ধু বসিয়া আছেন।

অনেক বাড়ীর ছাদ হইতে ছেলেরা ঘুড়ি উড়াইতেছে—লাল, নীল, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি নানা রং-এর ঘুড়ি। ঘুড়িগুলিও নানা ভাবে উড়িতেছে। কোনটা খুব উঁচুতে উঠিয়া একেবারে স্থির হইয়া আছে। কোনটা পৎ পৎ করিতেছে। কোনটা হঠাৎ গোঁৎ খাইয়া নীচে নামিয়া গেল। বালকগণ সুতা কাটাকাটি খেলিতেছে। যে জয়লাভ করিয়াছে সে চীৎকার করিয়া 'ভো কাট্টা' বলিয়া বিজয় উল্লাসে নৃত্য করিতেছে।

শ্রীমর তৃতীয় ও চতুর্থ পৌত্র তোতা ও ভোলা ছাদের উত্তর প্রান্তে ঘুড়ি উড়াইতেছে। শ্রীম বালকগণের এই আনন্দোল্লাস একমনে দর্শন করিতেছেন। তোতা ঘুড়িখেলায় মত্ত। শ্রীম তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কিছুক্ষণ নিজেব পাশে বসাইয়া রাখিলেন। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য—খেলার ঝোঁকে নীচে না পড়িয়া যায়, আর বালকের মনোযোগ পরীক্ষা করা। তোতাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু দেখিতেছেন—তাহার সমগ্র মন ঐ ঘুড়িতে নিমগ্ন। শরীরটাই বসা, কিন্তু মন উড়িতেছে আকাশে, ঘুড়ির সঙ্গে। বালকের দেহজ্ঞানবিবর্জিত এই অদ্ভুত একাগ্রতা দেখিয়া শ্রীম অতীব আনন্দিত। কিয়ৎকাল পর শ্রীম বালককে ছাড়িয়া দিলেন। বালকের আনন্দ আর ধরে না। মন তাহার পূর্বেই মুক্ত ছিল। এইক্ষণে পিতামহের আদেশে দেহের মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় ঘুড়িখেলায় মত্ত। অপর একটি ঘুড়ির সঙ্গে তাহার লড়াই চলিতেছে। নানারূপ অঙ্গভঙ্গিতে সে তাঁহার ঘুড়িকে নিয়া খেলিতেছে। যাহাতে প্রতিপক্ষের সুতা ছিন্ন হইয়া যায়। কখন শুইয়া নীচু হইয়া দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া লাটাই চালাইতেছে। কখন সুতা ছাড়িতেছে, কখনও গুটাইতেছে। প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—দেখুন, দেখুন, ওর সমগ্র মনটা ঘুড়িতে মগ্ন। এনে বসিয়ে রেখেছিলাম। তখনও দেখেছি মনটা ঐ ঘুড়িতে নিমগ্ন। বাধ্য হয়ে শরীরটা কেবল এখানে বসে ছিল। এখন মুক্ত শরীর মন খেলায় মত্ত। এই মনটি ঈশ্বরে দিয়ে দিলেই কাজ হয়ে গেল।

হঠাৎ 'ভো কাট্টা' বলিয়া লাটাই হাতে তোতা আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আহ্লাদ আর ধরে না। উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমকে বলিতেছে, দাদাবাবু, ভো কাট্টা, ভো কাট্টা।

শ্রীম (সোৎসাহে)—বা, বা। বেশ, বেশ—বীর তুমি।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—এই বিজয়োল্লাস ভাল। এতে বিজয়ের বাসনা প্রবল হবে। শেষে অবিদ্যা জয় করতে পারবে। এই মনকেই ওদিকে চালিয়ে দেওয়া। মনটা তো তৈরী হয়ে রইল। কি মনোযোগ, দেহজ্ঞান যেন লুপ্ত হয়ে গিছলো! আর বিজয়ের বাসনা। এ দু'টো ঈশ্বরের দিকে চালিয়ে দিলেই হল। যে বিষে প্রাণ যায় তা'তেই অমৃতত্ব লাভ হয়।

তাই ঠাকুর বলেছিলেন, মোড় ফিরিয়ে দাও। যে একাগ্র মনে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে।

এ সব দেখতে হয়। এতে অনেক শিক্ষা লাভ হয়। ঠাকুর বলেছিলেন, পরমহংস চার পাঁচ বছরের ছেলেদের কাছে রেখে দেয়, তাদের ভাব আরোপের জন্য। ঈশ্বর সারা দুনিয়াই আমাদের সামনে রেখে দিয়েছেন শিক্ষার জন্য। 'সখী গো সখী, যতকাল বাঁচি ততকাল শিখি'—এ-ও ঠাকুরের নিজের কথা। শিক্ষার শেষ নাই।

যিনি জীবকে বদ্ধ করেছেন তিনিই আবার মুক্তির উপায় বলে দিয়েছেন। কিন্তু জীব তা দেখতে পাচ্ছে না। তার মন অন্য জিনিসে – সংসারভোগে মগ্ন। সে বিষয়ানন্দ চাইছে—ব্রহ্মানন্দ ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, সংসারী জীবগণ চোখ থাকতে কানা আর কান থাকতে কালা—'They seeing see not ; and hearing they hear not.'

এই যে বিজয়োল্লাস, এতে এই বালকটির ভাল হবে—সংসার জয় করতে শেষে চেষ্টা হবে।

বালকদ্বয় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের খেলা সাঙ্গ হইয়াছে। শ্রীম কিছুক্ষণ একান্তে কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)—দেখুন, এই খোলা ছাদে মনটি যেমন

হয় তেমন হয় না ঘরে। ঘরে মন হয় বদ্ধ। এখানে এলে মুক্ত। তেমনি অজ্ঞান চলে গেলে একেবারে মুক্ত। যেমন কলসী ভেঙ্গে গেলে কলসীর জল আর সমুদ্রের জল এক হয়ে যায়। আমাদের মনটাও একটা ঘর বানিয়ে তার ভিতর আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সেই ঘরটি হলো বিষয়বাসনার। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলা। ওটা ভেঙ্গে গেলেই নিত্যপ্রকাশিত সচ্চিদানন্দের দর্শন হয়। ঠাকুর বলতেন, যেন হাঁড়ীর মাছ নদীতে গিয়ে পড়লো। এ বোধ যাদের আছে তারা ইচ্ছা করলে মনের ক্ষুদ্র গণ্ডি ভেঙ্গে বিরাট মনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। একেই বলে মুক্তি। এটাই মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

এখন ছয়টা। কীর্তনিয়া বাবাজী আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে দেখিয়া অন্তেবাসীকে বলিলেন, এঁকে দেখলে ভারী উদ্দীপন হয়। তাঁহাকে অতি যত্নে ও স্নেহে নিজের কাছে বসাইলেন। দেখিতে দেখিতে নিত্যকার ভক্তগণ—বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, ছোট নলিনী, ছোট রমেশ, বড় অমূল্য প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কীর্তনিয়া শ্রীমর আদেশে বসিয়াই পদ গাহিয়া শুনাইতেছেন। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণবিরহে পাগলিনী। সখীরা তাঁহার অবস্থা বুঝিয়াছেন—চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছেন, কি উপায়ে কৃষ্ণসঙ্গে শ্রীরাধার মিলন হইতে পারে।

সন্ধ্যা হইতেই শ্রীম ও সকলে একঘণ্টা ধ্যান করিলেন। তারপর 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে। রমেশ গুপ্ত পড়িতেছে দ্বিতীয় ভাগ, অষ্টাদশ খণ্ড।...অধর সেনের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। বৈষ্ণবচরণের কীর্তন হইতেছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর কেদার চাটুয্যে আসিয়াছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—জীব অষ্টপাশে আবদ্ধ। কেদারবাবু অধরের গৃহে অন্ন গ্রহণে আপত্তি করলেন। ঠাকুর বুঝতে পেরে কেমন কৌশলে তাঁকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ালেন। অধর ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁর গৃহে অন্ন গ্রহণ না করলে পাপ হবে।

সেই পাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। তাই বলে, গুরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু। কেদারবাবু খুব উঁচু থাকের লোক, তবু সমাজবন্ধনে আবদ্ধ। ঠাকুর তা আজ ভাঙবেন বলে রাস্তা থেকে তাঁকে নিয়ে এলেন। এঁরা যাচ্ছিলেন দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর আসছেন কলকাতা। রাস্তায় দেখা হতেই ঠাকুর বললেন, ঈশ্বরেচ্ছায় দেখা হল। কিন্তু কেদারবাবু বললেন, সে আপনার ইচ্ছায়। দেখুন, ঠাকুরকে কেদারবাবুর ঈশ্বর বলে বোধ হয়েছিল। তবু সংস্কার যেতে চায় না। কিন্তু ঠাকুর ভগবান। তিনি সেই সংস্কার মুছে দিলেন।

৩

মর্টন স্কুলের চার তলার ছাদ। রাত্রি আটটা। শ্রীম উত্তরাস্য চেয়ারে বসিয়া আছেন। তিন দিকে সম্মুখে ভক্তগণ বেঞ্চিতে বসা—শুকলাল, বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, শচী, শান্তি, ছোট রমেশ, নলিনী, বিক্রমপুরের ভক্ত, বলাই, সুখেন্দু, গদাধর, বারেন বোস প্রভৃতি। জগবন্ধু 'কথামৃত' ছাপার কাজে প্রেসে গিয়াছিলেন—এইমাত্র ফিরিলেন।

আজ ৩রা জুলাই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ১৯শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, শুক্লা প্রতিপদ ১৮৷৭ পল।

একজন হিন্দুস্থানী ভক্ত আসিয়াছেন। এই তাঁহার প্রথম দর্শন। ইনি কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার—বাংলা ভাষা জানেন। প্রশ্ন করিতেছেন।

হিন্দুস্থানী ভক্ত—সংসারে কি করে থাকলে সংসারও হয় আর ঈশ্বরকেও সর্বদা স্মরণ রাখা যায়?

শ্রীম—বড়লোকের ঘরের দাসীর মত থাকবে, পরমহংসদেব এই কথা একজন ভক্তকে বলেছিলেন। সে মনিবের সকল কাজ করছে উৎসাহের সহিত, কিন্তু তার মন থাকে গ্রামে, নিজের কুটীরে। সেখানে তার ছেলেরা রয়েছে। তেমনি সংসারের সকল কাজ করা মন ঈশ্বরে রেখে। মহামায়া সর্বদা ভুলিয়ে দেন। তাই যাদের মন রয়েছে ঈশ্বরে তাদের সাধুদের সঙ্গ করা উচিত, নিত্য। তাহলে

ভুল হবে না। অথবা, নষ্টা স্ত্রীর মত সংসারে থাকবে, ঠাকুর বলেছিলেন। নষ্টা স্ত্রী ঘরের সব কাজ করে কিন্তু মন পড়ে থাকে উপপতির উপর।

হিন্দুস্থানী ভক্ত—বেশ কথা, অমূল্য! কিন্তু কাজের বেলা মনে থাকে না। তখন মনে হয়, আমি কর্তা।

শ্রীম (সহাস্যে)—তাহলেই হল—যাদের মন থাকে সর্বদা তাঁ'তে, তাদের সঙ্গে friendship (বন্ধুত্ব) করা। যেমন আপনাকে দেখলে কোর্টের কথা মনে হয়, তেমনি যাঁদের দেখলে ঈশ্বরের কথা মনে হয়, তাঁদের সঙ্গ করা দরকার। সাধুসঙ্গ। সাধুরা সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। তাঁদের ঐ এক কাজ। তাঁরা যদি কর্মও করেন, তা নিষ্কামভাবে করেন, ঈশ্বরের জন্য করেন। পূজা-পাঠ, জপ-ধ্যান—এই সব কর্মও নিষ্কামভাবে করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাই বলেছিলেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সাধারণ ভাবে যা কিছু কর তার ফল আমাতে অর্পণ কর। ভালমন্দ সব। কেবল ভাল দেব তাঁকে, মন্দ নয়—তাহলে হবে না। অভিমান থাকবে একটি—আমি তাঁর যন্ত্র। যন্ত্রের সকল কাজ তাঁ'তে সমর্পণ করা।

শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবনটি দেখুন। অত কাজ করলেন—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—কিন্তু বলছেন, কর্ম আমাকে বদ্ধ করতে পারে না। কি শ্লোকটা?

ডাক্তার বক্সী—ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীম (হিন্দুস্থানী ভক্তের প্রতি)—এই শুনলেন তো উপায়টি 'ইতি মাং যোঽভিজানাতি'—এইরূপে যে আমায় জানে। কিরূপে? না, কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না, কারণ কর্মফলে আমার

স্পৃহা নাই। কর্মের ফল নিলেই বদ্ধ হয়ে পড়ে জীব। Benefit (ফল, লাভ) না নিয়ে কর্ম করা। শ্রীকৃষ্ণ অত কর্ম করলেন, কিন্তু benefit নিজে নেন নাই। কতজনকে রাজা বানালেন, নিজে কখনও রাজা হন নাই।

অপূর্ণ যে তারই ভোগে কর্মে স্পৃহা থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং পরিপূর্ণ! তাঁর চরিত্রের এই দিকটি যে সর্বদা লক্ষ্য রাখে সে কর্মে আবদ্ধ হয় না। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।'

মেসিনের মত কাজ করা। কাপড়ের কল দেখেছেন তো? তুলো এক পথ দিয়ে মেসিনে প্রবেশ করে, তারপর পঁচিশটা অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে একজোড়া ধুতি হয়ে বেরোল। মেসিন কখনও claim (দাবী) করে না, এই ধুতিজোড়া আমার। মেসিনের মালিকই ধুতিরও মালিক। তেমনি মেসিনের মত কাজ করতে পারলে হয়।

মেসিনটা অচেতন। কিন্তু জীবের ভিতর থাকবে একটি জীবন্ত চেতন ভাব। কি সেটি? না, আমি কাজ করছি ঈশ্বরের জন্য, আমার নিজের লাভের জন্য নয়। আমার এই কর্মফলে কোনও অধিকার নাই।

নীচের 'আমি'টা claim (দাবী) করে বসে ফলটি, কিছু করলেই। না করেই বা করে কি! মনে রয়েছে sense of possession (অধিকার জ্ঞান) গোড়া থেকে। উপরের 'আমিটা'কে দিয়ে এটা disown (পরিত্যাগ) করা। আমি ঈশ্বরের সেবকমাত্র, এইটে হলো উপরের 'আমি'। আমার কর্মফলে কোনও অধিকার নেই— সেবায় অধিকার—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। যেমন মনে করুন, একজন মাসে এক হাজার টাকা রোজগার করছে। কিন্তু নিজের জন্য খরচ বিশ টাকা আর একখানা কম্বল। বাকী টাকার প্রথম চতুর্থাংশে দেবসেবা, তারপর দ্বিতীয় চতুর্থাংশে সাধুসেবা, তৃতীয় চতুর্থাংশে দরিদ্রনারায়ণসেবা। শেষ চতুর্থাংশে পরিবারসেবা করে।

৪

গান্ধী মহারাজ চেষ্টা করছেন নিষ্কাম কর্ম করতে। দেশ পরাধীন। লোকে যাতে দু'টি খেতে পারে সেই চেষ্টা। ইনি এটা বুঝেছেন—'ন মে কর্মফলে স্পৃহা'। তাই নিষ্কাম কর্ম করতে পারছেন। কি ত্যাগ! এক একবার প্রাণ যায় যায় হয়, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের এই দিকটা বুঝলে যে শুধু কর্মফলে বদ্ধ হবে না, তা নয়—অদম্য কর্মশক্তিও বাড়বে! একজন একা একশ'জন লোকের কাজ করতে পারে। গান্ধী মহারাজ কি করেন, কি বলেন তার দিকে সমস্ত জগৎ তাকিয়ে আছে।

'মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ' হয় বলেই এই অদম্য কর্মশক্তি আসে। উৎসাহের অভাব হয় না। কারণ ভগবান্‌লাভের জন্য ব্যাকুল। বুঝেছে, যত শীঘ্র কর্ম করবো তত শীঘ্র তাঁকে লাভ করতে পারবো। তাই দিবানিশি কর্ম করে।

শ্রীকৃষ্ণ কত কাজ করলেন—বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র—এ সবই তাঁর কর্মক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে রথে বসে বললেন, 'ন মে কর্মফলে স্পৃহা।' কি প্রহেলিকা! অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মে উদ্বুদ্ধ করছেন কিনা! তাই জনকাদির উদাহরণ দিলেন। তা'তেও অর্জুন বোঝে না। তখন নিজেই নিজের উদাহরণ অর্জুনের সম্মুখে ধরলেন।

পূর্বজন্মে ঈশ্বরের জন্য কর্ম করা থাকলে এই সব কথা লোক ধরতে পারে। নচেৎ এই সব কথা byepass (অতিক্রম) করে যায়। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যাচ্ছেন সকলেই মনে করছে আপনার লোক। কিন্তু যখন ছেড়ে চলে যান তখন আর মনে নাই—নির্মোহ যে! কিন্তু ভক্তের কথা মনে থাকে। 'জিতসঙ্গদোষঃ' যে তিনি। সঙ্গদোষে দুষ্ট হন নাই কখনও। কিন্তু গোপীদের কথা মনে রেখেছিলেন—তাঁরা যে তাঁর একান্ত শরণাগত ভক্ত! বলেছিলেন, তাঁদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারবো না। তাঁরা কৃপা করে যদি আমায় ঋণমুক্ত করেন তবে শোধ হতে পারে, নচেৎ নয়। কেন? না, যখন আমায়

কেউ জানতো না, যখন আমি ব্রজের কিশোর রাখালমাত্র ছিলাম, তখন তাঁরা আমায় ভালবেসেছেন—আমার জন্য পতি, পুত্র, কন্যা, পরিজন, বিত্ত, সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কর্তব্যবোধে তাঁদেরও ছেড়ে গেলেন।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি)—যারা বিয়ে করে নাই তাদের বড্ড chance (সুযোগ), বুঝলে? 'মুক্তসঙ্গঃ' হবার খুব সুবিধা। কিছু আসক্তি এসে গেলেও ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু বিয়ে করলে এটি চলে না। বড়ই মুশকিল। যেখানে যাও সঙ্গে সঙ্গে ঐ চিন্তা। (শচী ও শান্তির প্রতি) বুঝলে?

শ্রীম (কোর্ট ইনস্পেক্টারের প্রতি)—যারা বিয়ে করে ফেলেছে তাদেরও সুবিধা বড় কম নয় এখন! অবতার এসেছেন যে! তাঁর কৃপায় তারাও জীবন্মুক্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে। পরমহংসদেব অবতার ছিলেন কিনা! তিনি নিজেই বলেছিলেন, বেদে যাকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়েছে, সেই সচ্চিদানন্দই এখন এই শরীরে অবতীর্ণ। তিনি পথ সোজা করে দিয়ে গেছেন। বলেছিলেন, 'তোদের বেশী কিছু করতে হবে না—আমাকে চিন্তা করলেই হবে।' তারপর প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে—যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সুখ, প্রেম, সমাধি—এ সব আমার ঐশ্বর্য।'

ঠাকুর পথ খুব সোজা করে দিয়ে গেছেন। জানেন কিনা, কলির জীব বেশী করতে পারবে না। আর বলেছিলেন—সাধুসঙ্গ, আর প্রার্থনা কর নিত্য। কখনও নির্জনে চলে যাও এই environment (পরিবেশ) থেকে।

ক্রাইস্টও কৃপাভরে জগতের লোকদের সোজা পথ দেখিয়েছিলেন। 'Come unto me all ye', বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে বলেছিলেন, 'that labour and are heavy laden and I will give you rest.' 'For my yoke is easy' and 'my burden is light

(হে শ্রান্ত, হে ভারক্লান্ত জনগণ, তোমরা আমার কাছে এস। আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করব। আমার মত অতি সরল, আমার পথ অতি সুগম।)

ওয়েস্টের ওরা বুঝতে পারে নাই ক্রাইস্টের এই শান্তির মহাবাণী। যদি বুঝতো তাহলে ভারতে এসে রাজনীতি আর লুণ্ঠন নিয়ে থাকতো না। ভারতের যা অতুল সম্পদ ধর্ম (spirituality), তার দিকে নজর যেতো। খালি ভোগ নিয়ে রয়েছে কি না, তাই ক্রাইস্টের কথা বুঝতে পারে না।

অক্সফোর্ডের একজন গ্রাজুয়েট লিখেছেন এই কথা। বলেছেন, ভারতের যে অতুল সম্পদ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তার সন্ধান আমরা পাই নাই। কতকগুলি টাকাকড়ি কেবল নিয়ে এসেছি ওখান থেকে। আর তার ফল এই—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাটাকাটি মারামারিতে ঐ অর্থব্যয়।

আমাদের পাড়ার ডাক্তার প্রাণধনবাবুর পিতা ছিলেন পাদ্রী। তাঁর সঙ্গে কখনও কখনও আমাদের আলাপ হতো। ক্রাইস্টের কথার ব্যাখ্যা আমাদের মুখে শুনে অবাক্ হয়ে যেতেন। প্রাণধনবাবুকে তাই বলেছিলেন, মহেন্দ্র এ সব ব্যাখ্যা পেলো কোথায়? (সহাস্যে) উনি তো জানেন না যে আমরা ক্রাইস্টের সঙ্গে ছিলাম, ক্রাইস্টের সঙ্গে ঘর করেছি। ঠাকুর নিজে বলেছিলেন কি না— 'ক্রাইস্ট, চৈতন্য, আর আমি—এক।' আবার বলেছিলেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।'

এখন কলিকাল। পেটের চিন্তা চমৎকারা। তাই এসব ভাববার অবসর নাই। যাদের পেটের চিন্তা নাই—যেমন ইংরেজরা, তাদেরও অবসর কোথায়, দিনরাত ভোগ নিয়ে ব্যস্ত!

ভারতের এই প্রাচীন cultureএর (সংস্কৃতির) কাছে এদের এই রাজনীতি টিকবে না। ওরা এদেশে এসে প্রথমে মনে করতো, ভারতের লোক সব barbarous (বর্বর)। আমরা শিক্ষা দিয়ে এদের সভ্য করবো। কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশে দেখতে পেল এদেশে culture (সংস্কৃতি) অতি গভীর। ম্যাক্সমূলারের 'What

India can teach' (ভারত কি শিক্ষা দিতে পারে)-নামক গ্রন্থে এদেশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। এক ঋগ্বেদ নিয়েই তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর কাটিয়েছিলেন।

ওরা এসেছিল শিখাতে, এখন নিজেরাই শিখছে! 'উল্টা সমঝলিয়া রাম' হয়ে পড়েছে! (কোর্ট ইনস্পেক্টারের প্রতি) জানেন তো গল্পটা! এক সাধু পর্যটন করে বেড়ান। অনেক বইটই সঙ্গে আছে। রামজীকে প্রার্থনা করলো, একটি ঘোড়া হলে এই বইটই নেওয়ার সুবিধা হয়। সাধু রাস্তায় চলছেন। এর মধ্যে একদল সিপাইয়ের সঙ্গে দেখা। তারা সব ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। তাদের একটা ঘোড়ী বাচ্চা প্রসব করলো। এটাকে ছাউনীতে বয়ে নেওয়ার জন্য একজন লোক চাই। সাধুকে দেখে তার ঘাড়ে দিলে চাপিয়ে ওটাকে। কি আর করে বেচারা! যেতে যেতে বলছেন, 'উল্টা সমঝলিয়া রাম' (সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীম (এটর্ণি বীরেনের প্রতি)—বাসুদেববাবার স্বভাবটি বেশ মধুর, বালকের ন্যায়। ভাগবতে বেশ well-versed (সুপণ্ডিত)। আমরা suggest (উত্থাপন) করলাম উদ্ধবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, যাও উদ্ধব যাও, ব্রজে গিয়ে গোপগোপীদের সংবাদ নিয়ে এসো। উদ্ধব গিয়ে দেখেন, তারা সবাই গোপালের জন্য পাগল। দই মন্থন করছে, গোপালের নাম করছে। গৃহকার্য করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে গোপালের গুণকীর্তন করছে। গাই দোয়াচ্ছে, আর মুখে গোপালের রূপ কীর্তন চলছে। তারা সব গোপালময়। উদ্ধব দেখে অবাক্। উদ্ধবের শিক্ষার জন্যই পাঠিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধব বুঝল, গোপগোপী কৃষ্ণময়।

বাসুদেববাবা সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে বেশ বললেন—সাধুর সঙ্গে থাকলে সাধু হয়ে যায়। শুনেছি, উনি খুব সাধুসেবা করেন। ভক্তরা যা পয়সাকড়ি দেয়, সব মন্দিরে জমা থাকে। আর তা'তে মহাপ্রসাদ কিনে নিত্য বহু সাধুর সেবা হয়।

কলিকাতা। ৩রা জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ, বৃহস্পতিবার

বিংশ অধ্যায়

বাজীকরের হাতে সকল সমস্যার সমাধান

মর্টন স্কুলের ছাদ। এখন রাত্রি আটটা। আষাঢ় মাস, তাই আকাশে মেঘের খেলা। কখনও গাঢ় অন্ধকার, কখনও ফরসা। মানব-মনের প্রবীণ দৈবী চিকিৎসক শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। তাঁহার সম্মুখে তিন দিকে বেঞ্চিতে উপবিষ্ট ভক্তগণ—শুকলাল, বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, মনোরঞ্জন, শচী, শান্তি, সুখেন্দু, বলাই, গদাধর, বীরেন বসু প্রভৃতি। জগবন্ধু কথামৃত ছাপার কাজে প্রেসে গিয়াছিলেন। তিনি এইমাত্র ফিরিলেন।

আকাশের আলো-আঁধারের ন্যায় শ্রীম মানবমনের আলো-আঁধারের বর্ণনা করিতেছেন, বদ্ধ মোক্ষের কথা কহিতেছেন। সাধুদের স্নেহের কথা উঠিল। পুরীর সিদ্ধ মহাপুরুষ বাসুদেববাবার কথা আসিয়া পড়িল।

বীরেন—বড়ই স্নেহ বাসুদেববাবার! আমার ছোট মেয়েটিকে কত স্নেহ করলেন।

শ্রীম—ওটা স্নেহ নয়, আশীর্বাদ। শিশুরা সরল বলে সাধুরা ভালবাসেন। স্নেহ ভগবানের পথের বিঘ্ন সকলেরই, তবে সাধুদের বিশেষ করে। এই স্নেহ দিয়ে ভগবান জগৎকে বেঁধে রেখেছেন। মা বাপ এই স্নেহেতেই সন্তানের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেয়। সাধুর প্রতি যদি স্নেহ থাকে তা'তে মোক্ষলাভ হয়, তা'তে মন ভগবানে যায়। ঈশ্বরের প্রতি স্নেহকে প্রেম বলে। গোপীদের এই প্রেম হয়েছিল।

শ্রীম—এর (স্নেহবন্ধনের) একটি ব্রহ্মাস্ত্র আছে। (বীরেনের প্রতি) বলুন তো কি?—সেটি হলো, out of sight out of mind—দূরে পালিয়ে যাওয়া। জেল থেকে যেমন পালিয়ে যায়, তেমনি বহুদূরে চলে যাওয়া। জড়ভরতের এইরূপ হয়েছিল।

ব্রাহ্মণরা খাচ্ছে, একটি কুকুরও খাচ্ছে। এই দেখে বললে—আহা, খাক্ খাক্! শেষে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হতেই দূরে পালিয়ে গেল। হরিণের স্নেহে পড়ে তাঁকে হরিণ-জন্ম নিতে হয়েছিল। স্নেহ এমনি ভীষণ জিনিস! মহামায়ার সৃষ্টি রক্ষার অপূর্ব কৌশল এই স্নেহ। জগতের অপর নাম স্নেহ।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—শোকেরও একটি ব্রহ্মাস্ত্র আছে। বলুন তো কি? মৃত ব্যক্তির দোষচিন্তা করা। গুণচিন্তা স্বাভাবিক। কিন্তু দোষচিন্তা করলে শোক পালিয়ে যায়।

সাধকের অবস্থায় এসব বিঘ্ন—স্নেহ, শোক। সিদ্ধ হলে আর বদ্ধ করতে পারে না। তখন 'নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা' (গীতা।১৫: ৫) হয়ে যায়। অধর সেনের জন্য কাঁদলেন ঠাকুর, কিন্তু শুধু ঐ সময়—যখন শুনলেন তাঁর শরীর গেছে। তারপর আর কখনও এ-সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। কেশব সেনের শরীরত্যাগের কথা শুনেও কাঁদলেন। কিন্তু ঐ সাময়িক। কিন্তু অপরের তা হবার যো নাই। সারা জন্ম কাঁদে।

বড় জিতেন একটু স্থূলকায়, আবার আজ ক্লান্ত। তাই হাই-বেঞ্চে ঠেস দিয়া একটু আরাম করিতেছেন। শ্রীমর সর্বতোমুখী দৃষ্টি উহাতে পড়িয়াছে। অত গভীর তত্ত্বকথায় মগ্ন থাকিলেও সরস রসিকতার অবতারণা করিয়া বলিলেন, এই আপনাদের তপস্যা করিয়ে নিচ্ছেন তিনি। আপনারা তো আর উঠে পড়ে লাগবেন না। তাই এই কাঠের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তপস্যা করিয়ে নিচ্ছেন (হাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—সুখদুঃখ তো আছেই। দেহ ধারণ করলে দুঃখকষ্ট হবেই। এর হাত থেকে কারও নিষ্কৃতি নাই। অবতারাদি নিজ জীবনে উহা দেখিয়ে গেছেন। ঠাকুর ক্যানসারে কি কষ্ট পেয়েছেন দশ মাস! আর ক্রাইস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মারলো—Christ was nailed in the Cross. (গদাধরের হাস্য)।

এমনতর কেউ কেউ ভক্ত আছে, তারা এগুলি মনে গ্রাহ্য করে

না—স্নেহ, মমতা, আরাম। রোখ করে চলে যায়। তারা জানে, ঈশ্বর সকলের আপনার লোক। যে যত বেশী জানে তাঁকে আপনার লোক বলে, সে সংসারের আকর্ষণ থেকে তত মুক্ত। ঈশ্বর রয়েছেন, ভয় কি? এইরূপ বিশ্বাস, এই রোখ চাই। ক্রাইস্ট ভক্তদের ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, 'Rejoice, rejoice' (আনন্দ কর, আনন্দ কর)। কেননা, ঈশ্বর রয়েছেন যে ভক্তদের সঙ্গে! তিনি যে সর্বদা দেখছেন!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি —একজন (শ্রীম) ভেবেচিন্তে ঠাকুরকে গিয়ে বললেন, suicide (আত্মহত্যা) করাই একমাত্র উপায় দেখছি। ঠাকুর শুনে বললেন—ছিঃ, এ কি কথা! তোমার যে গুরু লাভ হয়েছে! তুমি এটা করবে কি করে? এ কেমন জান? হাজার গাঁটওয়ালা একটা দড়ি। বাজীকর দশ হাজার লোকের সামনে ফেলে দিল। কেউ একটাও গাঁট খুলতে পারলো না। কিন্তু বাজীকর হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে সব গাঁট খুলে ফেললো। তেমনি যত বড় সমস্যাই হোক না কেন, জগতের সেই বাজীকর অর্থাৎ ঈশ্বর সব সমস্যা নিমেষে দূর করে দিতে পারেন। With man it is impossible, but everything is possible with God.'

(কোর্ট ইনস্পেক্টারের প্রতি) তিনিই সব করেছেন কিনা! কেন করছেন, এ উত্তর দেবে কে? Madam How and Lady Why' এখানে নেই। কি বিচার করবে—'একসের ঘটিতে কি দশসের দুধ ধরে?' আম খেতে এসেছ আম খাও। অতশত খবরে কাজ কি? অর্থাৎ তাঁকে কিসে দর্শন হয় তাই কর।

বড় জিতেন—জানবার কিছু আছে কি?

শ্রীম—কৈ তেমন! তাঁকেই জানা—এই তো একমাত্র জ্ঞাতব্য। এও তাঁর কৃপাতেই হয়। ঠাকুর বলতেন, চার রকম সিদ্ধ আছে—সাধন-সিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ, স্বপ্ন-সিদ্ধ, আর সিদ্ধের-সিদ্ধ। সাধন করতে করতে কেউ কেউ সিদ্ধ হয়ে যায়। এটাই সাধারণ পথ। হঠাৎ-সিদ্ধ বা কৃপা-সিদ্ধ—ঈশ্বরের কৃপায় হঠাৎ-সিদ্ধ হয়ে যায়। কেউ স্বপ্নে

তাঁর দর্শন পেয়ে স্বপ্ন-সিদ্ধ হয়। হঠাৎ-সিদ্ধ—যেমন একজন গরীবের ছেলে হঠাৎ বড়লোকের নজরে পড়ে গেল। মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিল তার সঙ্গে—আর জমিদারী দিল। সিদ্ধের-সিদ্ধ—যে ঈশ্বরকে দর্শন করে সর্বদা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়, আদান প্রদান করে—যেমন, ঠাকুর, চৈতন্য, ক্রাইস্ট। অবতারাদি ঈশ্বরকোটির কেবল এটি হয়—জীবকোটির হয় না।

সিদ্ধের-সিদ্ধর অহেতুক ভক্তি হয়, অহেতুক প্রেম হয়। হাজার আপদবিপদ হোক, তারা তাঁকে ছাড়ে না। এরা যেন পাতালফোঁড়া শিব। কিছুতেই ঈশ্বরকে ছাড়বে না। ঠাকুরের কত কষ্ট, প্রায় এক বছর যম-যন্ত্রণা ভোগ করলেন ক্যানসারে! কিন্তু যেই ঈশ্বরের কথা উঠল, অমনি সব যন্ত্রণা ভুলে গেলেন। একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার দেখে অবাক্! তারপর ঈশ্বরীয় গান, কথা, কত কি—যেন সুস্থ লোক! তিন চার ঘণ্টা একটানা এরূপ চলতো। কখনও রহস্য করে ডাক্তারকে বলতেন, কি গো, তোমাদের সায়েন্সে বুঝি এসব নেই? ক্রাইস্ট ক্রুশে বিদ্ধ হবেন জেনেও বললেন, Father, thy will be done'—পিতঃ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

যে-ভক্তিতে লোক অম্লানবদনে ক্রুশে বিদ্ধ হয়, তাকেই বলে অহেতুক ভক্তি, অহেতুক ভালবাসা। এ কেমন? যেমন ছেলেকে মা মারছে, ছেলে মায়েরই গলা জড়িয়ে কাঁদছে। দুঃখবোধ আছে বটে, কিন্তু এ বোধও আছে সঙ্গে সঙ্গে, মা ছাড়া যাবার স্থান নেই! এমন যে ভক্তি, সেটি হলো পাকা ভক্তি। শোক, তাপ, দুঃখ, আপদ-বিপদে, এমন কি পরম ঐশ্বর্যের ভিতরও, ঈশ্বরের জন্য ঐকান্তিক আকর্ষণ। শুনেছি, প্রহ্লাদের ছিল সে ভক্তি। ভাগবতে তার লক্ষণ এইরূপ :

আত্মারামাস্তু মুনয়ঃ নিগ্রন্থাপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্যম্ভূতোগুণো হরিঃ॥

এই ভক্তি যার হয়, সে কিছুই চায় না ঈশ্বরের কাছে—কেবল তাঁকে ভালবাসে। এদের হাজার মার, কাট—বলবে, মা-ই মারছে,

কাটছে। স্তুতি বন্দনা কর, তা'তেও নির্বিকার। এরা 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।' (গীতা, ২ : ৫৬)। আবার গানে আছে, 'সুখ দুঃখ সমান হলো আনন্দসাগর উথলে।' মার হাত এরা সর্বদা দেখে।

ক্রাইস্টের জীবন দেখুন। জ্যুবা সকলে বিরুদ্ধে দাঁড়াল। ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবে জানেন, তবুও সত্য থেকে বিচ্যুত হন নাই। জজ পন্টিয়াস পাইলেট জিজ্ঞাসা করলো—তুমি নাকি বল, তুমি জ্যুদের রাজা? ক্রাইস্ট উত্তর করলেন, তুমি বলছো এই কথা—you say so. আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নাকি বল—আমি ঈশ্বরের ছেলে, I am the Son of God? তখনও ঐ একই জবাব দিলেন, তুমি যেমন বলছ—you say so. জ্যুদের মতে ঈশ্বরের পুত্র বলা ধর্মদ্রোহিতা। আর রাজা বলা রাজদ্রোহিতা। তারপর কি মার! একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তখনও প্রার্থনা করছেন যারা মেরেছে তাদের জন্য—পিতঃ, এদের ক্ষমা কর। এরা জানে না কি অন্যায় করছে। Father, forgive them; for they know not what they do.

আর্ম চেয়ারে বসে এ তত্ত্ব বুঝবার যো নাই। ঋষিরা বনে-জঙ্গলে গিয়ে সারা জীবন তপস্যা করে এ তত্ত্ব বুঝেছিলেন। কি সে তত্ত্বটি? না, সব তাঁর খেলা—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'।

(বড় জিতেনের প্রতি) বুঝতে চান কি? তাহলে তপস্যা করুন। আমরা গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে আছি। ঠাকুর বলেছেন, 'আমি দেখছি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন, আবার তিনিই সব করছেন। তুমি কাঁদ আর বল—মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।'

মা যেমন মারেন, তেমনি আবার অভয়ও দেন ভক্তদের। এক কথায় আমাদের বিশ্বাস আছে। কোলাব্যাঙ কি পাকা কথাই না বলেছিল—রাম, অপরে যখন মারে তখন 'রাম রক্ষা কর' বলে রামের দোহাই দিই, আর যখন রাম মারেন তখন কার দোহাই দেব? রাম যখন মারেন তখন চুপ করে সহ্য করা। এইটি পথ।

এইবার শ্রীম উঠিয়া ঘরে গেলেন এবং ভাগবতখানা হাতে লইয়া

বাহিরে আসিলেন। একজন ভক্তকে 'গজমোক্ষণ' বাহির করিয়া দিলেন, অষ্টম স্কন্ধ।

...একটি রাজহস্তী একদিন বনে একটি সরোবরে নামিয়াছিল জলপানের জন্য। তখন একটা কুমীর উহার পায়ে কামড় দিয়া উহাকে ধরিল। কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিয়া সে ভগবানের শরণাপন্ন হইল। ভগবান চক্রদ্বারা কুমীরের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া হস্তীকে উহার কবল হইতে মুক্ত করিলেন। রাজহস্তী তখন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিল। এই হস্তীটি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে দ্রাবিড় দেশের রাজা ছিল। অভিশাপে হস্তীজন্ম লাভ করে। কিন্তু জড়ভরতের মত পূর্বজন্মের সকল কথা স্মরণ ছিল। স্তবটিও পূর্বজন্মেরই স্মৃতি।...

পাঠক (পড়িতেছেন)—গজরাজ বলিতেছে—অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ আচরণকারী, নিঃসঙ্গ, সর্বজীবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূতহিতৈষী মুনিগণ যে ভগবানের পরমমঙ্গলময় স্বরূপ দর্শনের জন্য ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত ধারণ করিয়া, নিরন্তর বনে বাস করিয়া তপস্যা করেন, সেই ভগবানই আমার একমাত্র গতি।

শ্রীম (বড জিতেনের প্রতি)—ঐ শুনুন, তাঁকে জানবার জন্য তপস্যার দরকার। ঋষিরা কত তপস্যা করে তাঁকে জেনেছেন। আবার ব্রহ্মচর্য চাই! আর্মচেয়ারে বসে হয় না। কিছুই করলাম না, আর অমনি হয়ে যাবে? অসম্ভব! কিছু করলে খেদ মেটে। তিনিই তো সব করবেন, কিন্তু বলতে হবে তো তাঁকে—করে দাও! সংসারের আর পাঁচটা বিষয়ে যতক্ষণ প্ল্যান থাকে, চেষ্টা থাকে, ততক্ষণ চেষ্টা এতেও দরকার। যাদের দেহবুদ্ধি বিলুপ্ত তাদের ভার ঈশ্বর নেন।

দেখুন না, রাজহস্তী চেষ্টা করেও যখন নিজেকে মুক্ত করতে পারল না তখনই তার প্রাণ থেকে আপনিই ডাক এলো। আর অমনি ভগবানও এসে মুক্ত করে দিলেন। মন মুখ এক করে ডাকতেই হাজির হলেন ভগবান। মন মুখ এক করার জন্যই নির্জনে তপস্যা।

পুরুষকারের দরকার। আহার বিহার প্রভৃতি সকল বিষয়ে যতক্ষণ পুরুষকার থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরলাভের জন্যও এই পুরুষকার দরকার। জোর করে সাধুসঙ্গ করতে হয়, তপস্যা করতে হয়। চেষ্টা করতে করতে যখন আর পেরে ওঠে না নিজের শক্তি দিয়ে, তখনই আপনি আসে ভগবানে শরণাগতি—যেমন এই গজরাজের এলো।

ঠেকে-শেখা, দেখে-শেখা আর শুনে-শেখা—পরপর ভাল। যাদের সংস্কার খুব ভাল তারা গুরু, শাস্ত্রবাক্য শুনে শেখে। তাদের অশান্তি কম হয়। দেখে-শেখাও ভাল। একজনের খারাপ কাজে কষ্ট হয়েছে, আর ভাল কাজে সুখ হয়েছে, এই দেখে খারাপ কাজ বর্জন করে ভাল কাজে মনোযোগ দেওয়া—এইটে দেখে-শেখা। ঠেকে-শেখা হলো থার্ড ক্লাস। অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে না শুনবে কারও কথা, না দেখবে কারও কাজ। যখন যা এল নিজের উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে করে, আর ধাক্কা খায়। এরপর ফোর্থ ক্লাসও একটা আছে। হাজার লাঠি মার, হাজার দুঃখ হোক, তবুও নিজের গোঁ ছাড়বে না, নড়বে না। ঠাকুর তাই বলতেন, উটের মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে তবু কাঁটা ঘাস খাবে।

এটর্ণি বীরেন—মাঘী পূর্ণিমাতে জগন্নাথের গজমোক্ষণ বেশ হয়!

শ্রীম—এ দেখা ভাল। আমরাও দেখেছি কয়েক রকম, বেশ কয়েকবার। চৈতন্যদেব সর্বদা দেখতেন। এসব দর্শন করলে উদ্দীপন হয়।

কাল আসছে একটি দিন—খুব দিন। কাল রথযাত্রা। চৈতন্যদেব সাত দল কীর্তনীয়া নিয়ে রথাগ্রে নৃত্য করতেন! ঠাকুরও মাহেশের রথে গিছলেন নৌকো করে। (সহাস্যে) আমরা হাওড়া থেকে গেলাম রেলে। ভক্তরা তাঁকে খুঁজছে। ওমা, দেখি ঠাকুর রশি ধরে রথ টানছেন! রথ টানা মানে—ঈশ্বরের দাস আমি, এভাবটি প্রকাশ করা। শাস্ত্রে আছে—'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্মং ন বিদ্যতে'। সেটা হল দেহরথে ভগবানকে দেখা। অর্থাৎ, এই মনুষ্যশরীরে তাঁকে দর্শন করা। এটি তো সকলের পক্ষে সহজ নয়, তাই কাঠের রথে

কাঠের মূর্তিতে ভগবানকে দেখা। এসব মহাপুরুষগণ প্রবর্তন করেছেন জীবের কল্যাণের জন্য। যেতে হয়, দর্শন করতে হয়। মহাপুরুষগণের আচরণ অনুকরণ করতে হয়। গিয়ে ফলফুল দিয়ে পূজা, রথটানা, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, নৃত্যগীত—এসব করতে হয়। ঠাকুর এই সবই করেছিলেন। কৃষ্ণ বোসদের বাড়ীতে ছিলেন—বলরাম-বাবুদের জ্ঞাতি। এঁদেরই ঠাকুরবাড়ী। ঠাকুর যেকালে গিছলেন, ভক্তদের যাওয়া উচিত। এই সব করতে করতেই ভক্তি হয়, ঈশ্বরের উপর ভালবাসা হয়। তবেই শান্তি, তবেই সুখ, যে অবস্থায়ই থাকা যায়। তাঁর শরণাগত হয়ে সংসারে থাকা, এই সব উপায়ে।

সভা ভঙ্গ। রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
৩রা জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৯শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল
শুক্লা প্রতিপদ ১৮।৭ পল।

একবিংশ অধ্যায়

এখন খালি ডিমে তা-দেওয়া

১

আজ রথযাত্রা। ৪ঠা জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ, ২০শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল। শুক্রবার, শুক্লা দ্বিতীয়া ২০।৫৭ পল।

এখন সকাল সাতটা। শ্রীম অন্তেবাসীর চারতলার ঘরে আসিয়া বলিলেন, এই ক'টা ভাল আম এসেছে। মাকে দর্শন করে আসুন ঠনঠনে। একটি আম ওখানে দেবেন। পাশেই অদ্বৈতাশ্রমের সাধুদের এই দু'টি দেবেন। ফিরবার সময় ঠাকুরবাড়ীতে প্রণাম করে এইটি দেবেন। আর মাহেশে জগন্নাথকে দেবেন এইটি।

অন্তেবাসী মনোরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া আম বিলি করিতে বাহির

হইলেন। ফিরিয়া আসিতেই শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, একে (শচীকে) সঙ্গে নিয়ে এখনই বেরিয়ে যান মাহেশে।

এখন সকাল আটটা।

হাওড়া হইতে রেলে জগবন্ধু ও শচী রওনা হইলেন। বেলুড় স্টেশনে উঠিলেন বিনয় ও ছোট নলিনী। রিষড়াতে নামিয়া পদব্রজে মাহেশে উপস্থিত হইলেন ভক্তগণ। এখানে মেলা বসিয়াছে। নানা রকমের খাবারের দোকান, হাঁড়ি-পাতিলের দোকান, ছুরি-কাঁচি-বঁটির দোকান, মনিহারী প্রভৃতি অনেক দোকান বসিয়াছে। ছেলের দল নানা রকমের বাঁশি বাজাইয়া আনন্দ করিতেছে। কেহ রাধাচক্রে, কেহ বা নাগরদোলায় আনন্দে দোল খাইতেছে।

জগন্নাথ, বলরাম সুভদ্রা এখনও মন্দিরেই বিরাজ করিতেছেন। ফুলের মালা ও ফলের স্তূপ মন্দিরের ভিতর দেখা যাইতেছে। যাইবার সময় অন্তেবাসীকে শ্রীম বলিয়া দিয়াছিলেন, 'শ্যাম বসুর সঙ্গে দেখা করবেন। ওঁদেরই ঠাকুরবাড়ী। ভক্ত লোক। জগন্নাথের গলার একটি ফুলের মালা চেয়ে আনবেন, আর ডোর। দুই একটা পয়সা দিলেই পূজারীরা দিয়ে দেয়। একটু bold (সাহসী) হওয়া চাই।'

অন্তেবাসী পয়সা দিয়া জগন্নাথের গলার একটি ফুলের মালা চাহিয়া লইলেন। তারপর শ্যাম বসুর ঘরে গিয়া তাঁহার হাতে শ্রীমপ্রদত্ত আমটি দিলেন। শ্যামবাবু বলিলেন, 'আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাবেন মাস্টারমশায়কে।

এখন অপরাহ্ণ দুইটা। ভগবান জগন্নাথ রথে আরোহণ করিলেন। রথের চারিদিকে লোকারণ্য হইয়াছে। কাছি ধরিয়া ভক্তগণ রথ টানিতেছে। রথচক্রের কর্কশ ধ্বনি অগণিত ভক্তগণের ভক্তিরসে সিঞ্চিত হইয়া আজ আর কানে লাগে না। মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি হইতেছে। ভক্তগণ আম, কলা, শসা, আনারস, বাতাসা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া রথে ফেলিতেছে। এ যেন এক সাময়িক ভক্তির উন্মাদনায় জনগণ প্রমত্ত।

রথ থামিলে একটি ভক্ত রথে চড়িয়া পূজারীকে পয়সা দিয়া খানিকটা ডোর চাহিয়া লইলেন।

রাত্রি সাড়ে দশটায় ভক্তগণ মাহেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীম এতক্ষণ সকলকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন মর্টন স্কুলের ছাদে—বড় জিতেন, মনোরঞ্জন, ছোট রমেশ, শান্তি, বলাই, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি ভক্তগণকে।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—আলোটা ধর, এঁদের মুখ দর্শন করি। এঁরা ভগবান দর্শন করে ফিরেছেন। বিশ্বাস চাই। 'বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।' বিচার করলে পেছনে পড়ে যায়। বিশ্বাস হলে এক্ষুণি হয়ে যায়।

অত লোক একমনে আজ তাঁকে ডাকছে। জাগ্রত না হয়ে থাকতে পারেন কি? সেখানে থেকে এঁরা এসেছেন টাটকা। এঁদের ভিতর তাঁর সত্ত্বা সঞ্চারিত।

শ্রীম হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া রথের ফেরৎ ভক্তগণের মুখ দর্শন করিতেছেন একে একে খালি পায়ে। তাঁহার হাতে প্রসাদী মালা ও ডোর দিলে দুই হাতে উহা মস্তকে ধারণ ও প্রণাম করিয়া লণ্ঠনের আলোতে বিস্ফারিত নয়নে উহা দর্শন করিতেছেন। কি দেখিতেছেন ইহার ভিতর তাহা তিনিই জানেন, ভক্তগণ দেখিতেছেন একটি গোলাপের গড়ে মালা। এইবার আনন্দে বলিতেছেন, এই আমাদের touch (সংযোগ) হল ভগবানের সঙ্গে। তাঁর গলার মালা। আপনারাও দর্শন করুন স্পর্শ করুন। (ভক্তগণ উহা করিলে) এবার রেখে দিন। দেখলে তাঁর কথা মনে হবে। এ কম জিনিস! যে জগন্নাথকে ঠাকুর দর্শন করেছিলেন, টেনেছিলেন—এ তাঁর গলার মালা। ঠাকুর যেকালে এই মূর্তিকে পূজা করেছেন, ঈশ্বর জাগ্রত হয়ে আছেন ঐ মূর্তিতে। সেই জীবন্ত ভগবানের মহাপ্রসাদ! বিশ্বাস—বিশ্বাস চাই!

শ্রীম নিজেও অপরাহ্নে রথ দেখিতে বাগবাজারে গিয়াছিলেন।

পরদিন ৫ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ। এখন সকাল সাতটা। শ্রীম

চারতলার নিজের ঘর হইতে নামিয়া দোতালার বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন বেঞ্চিতে। পাশের ঘরে বসিয়া আছেন জগবন্ধু, শচী, বিনয় ও গদাধর। শচীর বিবাহের কথা হইতেছে। সংসারে তাহার কেহ নাই। যথেষ্ট জমিজমা আছে। শ্রীমর ইচ্ছা, বিবাহ না করে। এখন পড়াশোনা লইয়া থাকুক।

শ্রীম (শচীর প্রতি)—পড়, পড়—বি. এ.-টা পাশ কর। এর (জগবন্ধুর) কাছে সব বই রয়েছে বেলেঘাটায়। একে নিয়ে একদিন যাও ওখানে। বই এনে পড়া আরম্ভ ক'রে দাও। পয়সা বাঁচাতে চাও, একে ট্রামে তুলে দিয়ে নিজে নেমে পড়। উৎসাহ দেখাও। এমন করে (বিষণ্ণ হয়ে) বসে থাকলে হবে কেন? ওঠ, উৎসাহ দেখাও। (সহাস্যে) 'বই-রাগ্য' করলে চলবে কেন? অর্থাৎ বইয়ের সঙ্গে রাগ করা। ওঠ, ওঠ।

শ্রীম স্নান করিতে পাশের বাথরুমে গেলেন।

২

এখন আটটা। হেয়ার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেড মাস্টার হরনাথ-বাবু আসিয়াছেন। ভক্তরা তাঁহাকে দ্বিতলের বারান্দার পূর্ব ধারে চেয়ারে বসাইলেন। তাঁহার বয়স সত্তর প্রায়, হাতে একভাগ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'। শ্রীমর নিকট হইতে পড়িতে নিয়াছিলেন। এইখানা ফেরৎ দিয়া অন্য একভাগ লইতে আসিয়াছেন। পড়ায় খুব রুচি, কিন্তু জপধ্যানে মন নাই।

শ্রীম স্নান করিয়া আসিয়া হরনাথবাবুর কাছে গিয়া বসিলেন। ভক্তরা কাছে বসা—কেহ বা ঘরে। অন্তেবাসী পাশের ঘরে বসিয়া অলক্ষ্যে তাঁহাদের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

শ্রীম (হরনাথের প্রতি)—ভক্তিই সার। শাস্ত্র বই-টই পড়ে কি হবে? ঋষিরা বলেছেন, 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।' খুব বুদ্ধি থাকলেও হয় না। মেধা দিয়েও হয় না। চাই ভক্তি, চাই বিশ্বাস!

শ্রীম গান গাহিতেছেন।

গান। নামেরি ভরসা কেবল, নামেরি ভরসা,
শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি,
দেঁতোর হাসি লোকাচার ॥

শুনুন রামপ্রসাদ কি বলছেন—কেবল নাম জপ করেই তাঁকে লাভ হয়। তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন—এই নাম করে করে, গান গেয়ে গেয়ে।

বসে বসে তাঁর নাম জপ করা।

পরমহংসদেব আর একটি গান গাইতেন—

গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায় ॥

অর্থাৎ, নানান্ দিকে মন দেওয়ার কি দরকার। আমি কেবল বসে বসে তাঁর নাম করবো, এই সঙ্কল্প চাই। 'অজপা' মানে শ্বাস, অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসে তাঁর নাম করবো সর্বদা।

ওটাই তাঁর (ঠাকুরের) ঠিক ভাব—সব ত্যাগ করে শুধু তাঁকে ডাকা।

তা ছাড়া আমাদের যে বয়স হয়ে গেছে। Probabilityর (প্রবেবিলিটির) আঁক কষেছেন তো? আমাদের এখন মৃত্যুর probability (সম্ভাবনা) হয়েছে। পুরানো যন্ত্র কিনা! এখন আর আমাদের শাস্ত্র পড়ার বয়স নেই। কেবল বসে বসে তাঁর নাম করা। পাকা আঁব (আম) যেমন, কখনও ভেঙ্গে পড়ে। উঠে পড়ে লাগা চাই। কেশব সেনকে এই কথাই বলেছিলেন ঠাকুর।

আবার বিদ্যেসাগর মশাইয়ের বাড়ীতে গিয়েও এই কথাই তাঁকে শুনিয়েছিলেন।

গান। মন কি তত্ত্ব কর তারে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি জানতে পারে ॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥

শুধু বিচার করে তাঁকে পাওয়া যায় না—ভক্তিতে ভাবেতে তাঁকে পাওয়া যায়। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাবেতে তিনি বাঁধা পড়েন। ফাঁকা কতকগুলি কথা বললে হয় না। যেমন কতকগুলি ভাত পড়ে আছে থালায়, কিন্তু মাখবার কিছু নাই। ভক্তি সেই মাখবার জিনিস। তা'তে তিনি ধরা পড়েন। সেটি পাকলে হয় ভাব। তখন আর যায় কোথায়! ভগবান তখন ভক্তের অধীন!: ছুঁচকে চুম্বক টানে। কখনও ছুঁচ আবার চুম্বককে টানে। ভগবানকে ভাবতে ভাবতে ভক্তও ভগবান হয়ে যায়। বেদে আছে 'ভ্রমর কীটবৎ'—আরসোলা কাঁচপোকা হয়ে যায়—তাকে ভাবতে ভাবতে।

আর একটি গান গাইতেন ঠাকুর।

কে জানে কালী কেমন।
ষড় দর্শনে না পায় দরশন,
আগম নিগম তন্ত্রসারে।
আত্মারামের আত্মা কালী
প্রকাশ প্রণবের মতন॥
মূলাধারে সহস্রারে
সদা কালী করে রমন।
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধুতরণ॥
ও তার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না
ধরবে শশী হয়ে বামন॥

বামনের চন্দ্র ধরার সাধ যেমন, তেমনি মনুষের পক্ষে ভগবান লাভ। জোর করে প্রেম হয় না। প্রথমে ভক্তি, তারপর উহা পাকলে ভাব হয়। তারপর প্রেম। প্রেম জীবকোটির প্রায় হয় না। ভক্তিতে ঈশ্বর বশ হন। কেঁদে কেদে আন্তরিক শরণ নিলে তিনি এসে ধরা দেন। নইলে ঐ দুরাশা—'ধরবে শশী হয়ে বামন।' যাঁরা তাঁকে জেনেছেন এ সব তাঁদের কথা। তাঁদের কথা না শোনা আর উন্মত্তের মত আঁধার ঘরে ঘোরা, এক।

এখন কি আর আমাদের ওসব সাজে, বিচার টিচার? এখন শরণাগত হওয়া। এখন নানান্ খানা না করে, পাখী যেমন ডিমে তা দেয় তাই করা। সংসার তো অনেক করা হয়েছে। এখন খালি ডিমে তা দেওয়া উচিত।

একজন ছোকরা ভক্ত বইটই পড়তো। ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'আর বইয়ে কি আছে? যদি পনের মিনিট তাঁকে ডাকিস্ তাহলে যা হবে তোর, এক বছর বই পড়ে কি তা হবে?' বলেছিলেন, 'পাঁজিতে আছে (এ বছর) বিশ আড়া জল। কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও বের হয় না।'

আপনি যে গানটি বলেছিলেন, পরমহংসদেব সেইটি ব্রাহ্মসমাজের ওঁদের গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ওঁদের বলেছিলেন, ডুব দাও। খালি উপরে উপরে ভাসলে কি হবে?

গান। ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি যে প্রেমরত্নধন॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে শুন শুন শুন, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

আর একটি গান আছে—'ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো গৌর-রূপসাগরে।' অবতারকে দেখে একজন ভক্ত বলেছিল এই কথা—গৌরাঙ্গ অবতারকে। তার মনপ্রাণ বিকিয়ে গেছে। এরা আর নিজের বশে নাই! ভগবানে প্রেম হয়েছে। তখন কে আর অন্য খবর রাখে? সংসার ফংসার সব ভেসে গেল! খাল আর গঙ্গা এক হয়ে গেল—জোয়ার এসেছে যে! ভক্তির জোয়ার, ভাবের জোয়ার এলে সব ভুল হয়ে রায়। এ না হলে আর শান্তি কোথায়, সুখ কোথায়?

কেশব সেনকে ঠাকুর বলেছিলেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্য-মনের অতীত তিনিই রূপ ধরে এসেছেন, ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন। অর্থাৎ, ঠাকুর অবতার। কেশব সেন ঐ কথা মানলেন। তাই একটা সারমন (sermon) দিয়েছিলেন, মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ীর পূজা।

আমরা তো মাটিকে পূজা করি না। মাটির মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তা'তে ভগবানের পূজা। আপনি জানেন না এটা? আমাদের এখানে idol worship (মূর্তিপূজা) হয় না। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চিন্ময়ীর পূজা হয়—ব্রহ্মশক্তির পূজা। কেশববাবুদেরও এই মত—'মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ীর পূজা।'

হরনাথ—একজন editor (সম্পাদক) একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এই ভাবের।

শ্রীম (তীব্রভাবে)—কথাটা হচ্ছে—অনধিকার চর্চা। তপস্যা চাই আগে, এসব কথা বুঝতে হলে। এ কাগজে কলমে লেখার কাজ নয়। বিচার দ্বারা এসব জানবার যো নাই। কেশব সেনকে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। Editor-এর (সম্পাদকের) কথায় কি হবে? ঠাকুরের কথাই আমাদের নেওয়া উচিত। তিনি অনেক তপস্যা করেছিলেন কিনা! আবার ঈশ্বর দর্শন করে সর্বদা তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন।

Revelationএ (বেদে, দর্শনে) বিশ্বাস করা-বই আমাদের আর কোন উপায় নাই। কি করবে intellect (বুদ্ধিবিচার) দিয়ে? Perfect detachment (সম্পূর্ণ অনাসক্তি) চাই from the sense-world (বাহ্যজগৎ থেকে)। তা না হলে এ তত্ত্ব বোঝা যায় না। তা না হলে ঋষিরা কেন গাছতলায় গেলেন সব ছেড়ে? কয়টা বই পড়ে আর শ্লোক ছেড়ে ঈশ্বরলাভ হয় না। ভাগবতে সেদিন পড়া হচ্ছিল এই কথা। ঈশ্বরলাভের জন্য মুনিগণ ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত ধারণ করে বনে কঠোর তপস্যা করেন। যদি দু'পাতা উলটিয়েই হতো তবে কেন এই কঠোর ব্রত?

নেপোলিয়ান সেভেন্টি টু আওয়ার্স একটা ঘরে বসেছিলেন একটা problem (সমস্যা) solve (সমাধান) করতে। অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে। এ হলো worldly matter (জাগতিক বিষয়)। আর ঋষিরা বসেছিলেন ঈশ্বরের দর্শন পাবেন বলে।

কি right (অধিকার) আছে আমাদের ঈশ্বরের কথা

বলবার? এ সব intellectual discussionএর (যুক্তিতর্কের) বিষয় নয়।

এখন নয়টা। হরনাথবাবু বিদায় লইলেন।

৩

অপরাহ্ণ দুইটা। শ্রীম চারতলার নিজের ঘরে বসিয়া আছেন। গতকালের মাহেশের রথের কথা হইতেছে।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি)—আমাদের মনে ছিল রথে উঠে জগন্নাথকে দেখিয়ে আমটি দেওয়া। শ্যামবাবুর হাতে দেওয়া হয়েছে, সামান্য একটা আম বলে যদি ঠাকুরের ভোগে ওটা দেওয়া না হয়। যে কাজের জন্য যা, তা সেকাজে লাগান উচিত। যে প্রকারে যা করা উচিত ঠিক সেই প্রকারেই তা করতে হয়। সব কাজেই উদ্দেশ্য ও উপায় উত্তম হবে। এখানে ছোট বড় বিচার নাই। যার এসব ক্ষুদ্র বিষয়ে শৈথিল্য, তার সব বিষয়েই এরূপ হবে। ভগবানের বিষয়ে—সাধন-ভজনেও শৈথিল্য হবে।

গতকাল হইতে শ্রীম ঐ আমটি দেওয়ার কথাই ভাবিতেছেন।

অন্তেবাসী চারটার সময় বেলেঘাটা গেলেন শচীর জন্য বি. এ.-র পাঠ্যপুস্তক আনিতে। উনি রাত্রি আটটায় ফিরিয়াছেন, সঙ্গে শুকলাল ও মনোরঞ্জন। ভক্তসভা ছাদে বসিয়াছে। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, শচী প্রভৃতি অনেক ভক্ত বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে, নরেন্দ্রের বিবাহের কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি আশ্চর্য, সব মানুষের মত ব্যবহার! শরীর ধারণ করলে ভগবানের আচরণও ঠিক মানুষের মত হয়। জগদম্বা বলেছেন, নরেন বিয়ে করবে না—লোকশিক্ষা দিবে, তবুও ভাবনা। নরেনের বিয়ের কথা হচ্ছে। ঠাকুর শুনে শিউরে উঠলেন। নরেন বিয়ে করে বদ্ধ হয়ে যাবে সংসারে, ঠাকুর তা সহ্য করতে পারছেন না। সংসার জ্বলন্ত অনল, ঠাকুর বলেন। সে অনল থেকে

নরেন্দ্রকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। গান গেয়ে নরেন্দ্রের কাছে appeal (আবেদন) করছেন।

কথা কইতে ডরাই, না কইলেও ডরাই
পাছে সন্দেহ হয় তোমা ধনে হারাই।
আমরা জানি যে মন্ত্র দিলাম তোরে সেই মন্ত্র,
এখন মন্ তোর, যে মন্ত্রেতে বিপদে তরী তরাই ॥

আহা, কি ভালবাসা!

একজন ভক্ত—ঠাকুর যদি অবতারই হন তবে স্বামীজীর কেন অত দুঃখ হল? তাঁর এক কথাতেই তো সব দুঃখ দূর হতে পারে!

শ্রীম—তাহলে লীলা হয় কি করে—আর লোকশিক্ষা? লোক এসব দেখে শিখবে—দেহ ধারণ করলে অবতারাদিরও দুঃখের হাত থেকে রেহাই নাই। তা ছাড়া, দুঃখ তো ঠাকুরই দূর করেছেন। বললেন, মার কাছে গিয়ে তুই যা চাইবি তাই পাবি। কিন্তু সে তো চাইতে পারলেন না, সাংসারিক ঐশ্বর্য। চাইলেন 'জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য দাও'। তখন ঠাকুর বললেন, 'আচ্ছা যা, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা মা করে রেখেছেন। এর বেশী নয়।' 'এর বেশী নয়' এর মানে কি? না, তা'তে জীব বদ্ধ হয়ে যায়। দেহযাত্রা যাতে চলে ততটা ভগবান দেন যাদের তিনি ভালবাসেন। না দিলেও নয়, আবার বেশী দিলেও আটকে যাবে। তাই বললেন, 'ডাল ভাত হলে হয়'। তিনিই তো দুঃখ দূর করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থেকেও অর্জুনের দুঃখ গেল না। আবার ঠাকুর সঙ্গে থাকতেও নরেন্দ্রের দুঃখ হল—এ প্রহেলিকা, মায়ার ভেতর থেকে বুঝবার যো নাই। ভীষ্মদেব এ খেলা দেখে কেঁদেছিলেন। তাই ঠাকুর বলেছিলেন, মায়ার খেলা বুঝতে যেয়ো না—একটু এলোমেলো থাকবেই। তুমি প্রার্থনা কর—'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার মুগ্ধ করো না'।

জগতের দুঃখকষ্ট, ভালমন্দ, এ সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। তুমি যদি শান্তিতে থাকতে চাও, তাহলে ঐ উপায়—প্রার্থনা, 'মা, তোমার

ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' যদি কেউ দয়া করে তোমার দুঃখ দূর করে, জানবে সেও তিনিই করাচ্ছেন দয়ারূপে অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করে। তাই তো উপায় বললেন ভগবৎকে, লক্ষ্য অর্জুন— 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'। মন বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ কর। বাইবে রাখলেই মুশকিল। এই সৃষ্টিটা দেখ না, চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে! অর্জুন দেখে একেবারে 'বেপথুঃ' হয়েছিলেন। সইতে পারলেন না। তাই সিদ্ধান্ত এই—তুমি তোমার পথ দেখ। শান্তি সুখ হয় কিসে তার চেষ্টা কর। জগতের বিচার করতে যেয়ো না। বুঝতে পারবে না।

পাঠ শেষ হইয়াছে। বিনয় আনারস-প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। তাঁহাদের বাড়ী হইতে আনিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—এই সব নিতে হয়। এতে মন তৈরী হয়। মন তৈরীর জন্যই তীর্থ, দেবালয়, ব্রতনিয়ম, স্তবস্তুতি, প্রার্থনা, প্রসাদগ্রহণ ইত্যাদি। মানুষ এই মন তৈরী করার জন্য কি stupendous efforts-ই (প্রচণ্ড প্রচেষ্টাই) না করছে! চেষ্টা করে করে 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ' নিশ্চল স্থির করেছে মানুষ মনটিকে। তবেই তো এই Grand Mystery (অতি গূঢ় রহস্য) বের হলো। (একজন ভক্তের প্রতি) বলুন তো, সেটি কি? হ্যাঁ, মা-ই সব করছেন, সব হয়ে রয়েছেন—এই মহাসত্যটি।

মন সর্বদা যায় sense objects-এ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে)। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঠিক উল্টো দিকে—ঈশ্বরে। দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। মন্ত্রীদের টানে বেচারা হয়রান। বড় সোজা কাজ নয়! মন তো আসতে চায় না বিষয় থেকে। এখন কি করা যায়? না, এই বিষয়কেই spiritualised (ঈশ্বরে মণ্ডিত) করে ফেলা যাক। যে মাটিতে পড়ে, মানুষ সেই মাটি ধরেই আবার ওঠে। রসনা সর্বদা মনকে সঙ্গে নিয়ে উত্তম সব দ্রব্য আহার করতে চায়। একে বাগ মানাতে হবে। এখন কি করা? শাস্ত্র বলছেন, ঐ উত্তম খাদ্য ভগবানে নিবেদন করে প্রসাদ খাও। খালি উত্তম দ্রব্যরূপে খেলে বন্ধ

করবে, কিন্তু সঙ্গে ভগবানের প্রসাদ—এই ভাবনাটা যোগ করে দিলে রসনা সংযত হয়ে যাবে কালে।

বড় জিতেন—ও বিনয়, আমিও নেবো, আমায় দাও।

শ্রীম—হ্যাঁ নিন্। 'সখী গো সখী যতকাল বাঁচি ততকাল শিখি।' আবার আছে 'সখী গো সখী, আমি যত দেখি তত শিখি।'

(অন্তেবাসী প্রভৃতির প্রতি) কাল সকালে হাওড়া গেলে জগন্নাথের টাটকা প্রসাদ পাওয়া যাবে। পুরীর ফেরত রথের যাত্রী সব কাল সকালে আসবে। যাওয়া উচিত। চাইলেই দেয়। আবার কেউ হয়তো বলবে—মশায়, অনেক বাঁধন-ছাঁদনের ভেতর রয়েছে। তা হোক, একজন না দেয় অপর কেউ দেবে। এসব করলে মনের খেদ মেটে। ঈশ্বরের জন্য কিছু করেছি, মনকে বোঝানো যায়। তা ছাড়া প্রসাদে ভগবানের সত্তা থাকে। তা নইলে ঠাকুর বললেন কেন, জগন্নাথের প্রসাদ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম? নরেনকে যখন বললেন, এ খেলে ভগবানের ভক্তি হয়, তখন নরেন আটকা প্রসাদ খেলেন। ঠাকুর যখন বলেছেন, জগন্নাথের প্রসাদ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আর এ খেলে ভক্তি হয়, তখন এটা Gospel Truth—বেদবাণী।

সভা ভঙ্গ হয় রাত্রি দশটায়।

৪

পরের দিন রবিবার। অপরাহ্ন দুইটা বাজিয়াছে। শ্রীম চারতলার স্বীয় কক্ষে বিছানায় বসিয়া অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন। শ্রীমর কাছে যাতায়াত করেন একজন বিত্তশালী ভক্ত। তিনি একজন সাধুকে কাশীতে মাসিক পঁচিশ টাকা সাহায্য দিতেছেন অনেক কাল হইতে। সম্প্রতি সাধুর উপর কোন কারণে অশ্রদ্ধা হওয়ায় উনি উহা বন্ধ করিয়া দিতে চান। অন্তেবাসী ঐ ভক্তকে উহা বন্ধ করিতে বারণ করিয়াছেন। ভক্ত উহা শুনেন নাই। তাই শ্রীমর নিকট অন্তেবাসী উহা নিবেদন

করিতেছেন। শ্রীম উহা শুনিয়া খুব চিন্তিত হইলেন। বলিতেছেন—(অন্তেবাসীর প্রতি)—প্রথম, অনেক কাল থেকে তিনি দিয়ে আসছেন, এখন বন্ধ করলে তাঁর মনে কষ্ট হবে। দ্বিতীয়, এঁর help-তেই (সাহায্যে) সাধুটি আশ্রম খুলেছেন কাশীতে। এখন না দিলে খুবই কষ্ট হবে। তৃতীয়, moral degradation-এর (নৈতিক অবনতির) কোন positive proof (নিশ্চিত প্রমাণ) যখন পান নাই, তখন বন্ধ করা উচিত কি? আর চতুর্থ, (এই পয়েন্টটা রাত্রিতে বলিয়াছিলেন্) সেকেণ্ড পয়েন্টটার সঙ্গে জড়িত intermediate (মধ্যবর্তী) আর একটা পয়েন্ট আছে। বলবেন, আপনার তো পাঁচ রকমে কত টাকা খরচ হচ্ছে। এই ক'টা টাকা বাঁচালে কি হবে?

অপরাহ্ণ চারিটা বাজিয়াছে। বেলুড় মঠের একজন সাধু আসিয়াছেন (ব্রাদার মুদাপ্পা)। তিনি আলমোড়া থাকেন। শ্রীম তাঁহাকে লইয়া ছাদে বসিয়াছেন। সাধুর পায়ে ব্যথা। ডাক্তার বলিয়াছেন, উহা সারিবে না। তাই মন খারাপ।

শ্রীম (সাধুর প্রতি)—আপনি ডাক্তারের কথা শুনবেন না। তারা সাধুদের treatment (চিকিৎসা) করতে পারে না। তবে যদি ডাক্তার ভক্ত হয়, তা হলে বুঝতে পারে। সাধুদের system (দৈহিক গঠনতন্ত্র) সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা হবে না? সকলে যাচ্ছে একদিকে, সাধুরা যাচ্ছেন ঠিক তার বিপরীত দিকে। তাঁদের সমগ্র nervous system (স্নায়ুমণ্ডলী) অন্য রকম। তাঁদের আলাদা psychology (মনোবিজ্ঞান), আলাদা physiology (দেহতত্ত্ব)। ঠাকুরের গায়ে একবার অসম্ভব জ্বালা। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললো, না, কোনও রোগ নাই শরীরে। তাদের ওষুধে কিছুই হলো না। দিন দিন বাড়ছে জ্বালা—যেন শরীর জ্বলে যাচ্ছে। ডাক্তাররা কিছুই করতে পারলো না। শেষে দৈবী ওষুধে আরাম হয়। সাধকরা ব্যবস্থা দিলেন, গায়ে চন্দন মাখতে আর ইষ্টকবচ ধারণ করতে। তা'তেই রোগের শান্তি হয়। সাধুদের শরীরে যোগজ ব্যাধি।

সারান এসব ডাক্তারের কর্ম নয়। এর জন্য ভিন্ন রকম চিকিৎসক আছে। তাঁরা যোগী। মন খারাপ করবেন না। শরীরের রোগের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অতি নিকট। যিনি চিকিৎসা করবেন তাঁর দরকার আগে রোগীর মনের চিন্তাটি জানা। তারা সে-পাড়া দিয়েই গেল না। কি করে বোঝে রোগ কি ?—এ যেন আঁধারে ঢিলছোঁড়া।

তপস্যার সময় স্বামীজী একবার ঋষিকেশে যায় যায়। শ্বাস নাই—শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, সান্ন্যাল মশায়, এঁরা সব ছিলেন। এঁরা কাঁদতে লাগলেন। রাখাল মহারাজও বুঝি ছিলেন। কাঁদবেন না, কত ভালবাসা! স্বামীজীকে কেন্দ্র করে সকলে আনন্দে রয়েছেন। হঠাৎ তাঁর এই অবস্থা—মৃতবৎ সামনে পড়ে আছেন। ও মা, এরই মধ্যে কোথা থেকে একজন সাধু এলেন দৈবাৎ। তিনি মধু ও পিপ্পলের চূর্ণ মিশ্রিয়ে দিলেন। ওটা জিভে ঘষে ঘষে দিতে শ্বাস ফিরে এল, নাড়ী চলতে লাগলো।

নিজে বুঝতে না পারলে, কিংবা বইয়ে তার কথা না থাকলে, ডাক্তাররা বলে সারবে না। কত বড় বড় অসুখ সাবছে এই সব টোটকা-টাটকাতে। ডাক্তাররা ঠাওরেছিল, ঠাকুর পাগল। গঙ্গাদাস কবিরাজ এসে বললেন, এটা যোগজ ব্যাধি। ব্রাহ্মণী দেখে বললেন, এটা মহাভাব। বৈষ্ণবচরণ corroborate (সমর্থন) করলেন। আপনি ভয় পাবেন না, ভাল হয়ে যাবেন।

সাধু মিষ্টিমুখ করিয়া প্রণামান্তে প্রসন্ন মনে বিদায় লইলেন।

৫

এখন সাড়ে পাঁচটা। মুনসেফ অনুকূল সান্ন্যাল আসিয়াছেন। তিনি বেলুড় মঠের ভক্ত, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। প্রাথমিক সম্ভাষণাদির পর ধর্মপ্রসঙ্গ হইতেছে।

শ্রীম—আপনি কোথায় মার দর্শন লাভ করেছিলেন ?

অনুকূল—জয়রামবাটীতে। আমার বয়স তখন সতের বছর। 'কথামৃত' পড়ে মাকে শুনিয়েছিলাম।

শ্রীম (সবিস্ময়ে)—বলেন কি ? কোন্ পার্ট ?

অনুকূল—তৃতীয় ভাগ।

শ্রীম—দেখাতে পারেন কোথায় ?

অনুকূল—প্রথম থেকেই।

শ্রীম—(আনন্দে)—এই একটি সিন্ পাওয়া গেল—মা 'কথামৃত' শুনছেন জয়রামবাটীতে। (অনুকূলের প্রতি চাহিয়া) আপনি খুব fortunate (ভাগ্যবান)।

শ্রীমর পৌত্র অরুণ, অজিত প্রভৃতি ছাদের উত্তর দিকে ঘুড়ি উড়াইতেছে। অরুণ এক এক করিয়া অনেকগুলি ঘুড়ি কাটিয়া দিয়াছে। আর 'ভো কাট্টা, ভো কাট্টা' বলিয়া অজিত আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

অন্তেবাসী (শ্রীমর প্রতি)—ছেলেরা ঘুড়ি কেটে খুব আনন্দ করছে।

শ্রীম—হাঁ, এ খুব ভাল, জয়লাভ করে আনন্দ। পরে তাহলে আরও জয়লাভ করতে চেষ্টা করবে সর্বদা। হেরে গেলেও আবার জয়লাভ করতে চাইবে।

শ্রীম (অনুকূলের প্রতি)—আপনি ঘুড়ি উড়াতে পারতেন ?

অনুকূল (সহাস্যে)—আজ্ঞে না। (একটু পর) 'কথামৃত' আর লেখা হবে ?

শ্রীম—ইচ্ছা তো কত ছিল—হয় কৈ ? আরও কয়েক পার্ট লিখে, তারপর ঠাকুরের কথা দিয়ে ঠাকুরের life (জীবনী) লেখা। বুড়ো মানুষের পুরানো যন্ত্র, concentrate (মন একাগ্র) করা চলে না। পাকা আঁব যেমন—কখন পড়ে যায়! এই শরীরটা flesh and blood (রক্ত মাংস) দিয়ে তৈরী। কখন চলে যায় তার ঠিক নাই!

অনুকূল (সহাস্যে) পঞ্চম ভাগ আগে হোক। তারপর যা হবার হবে।

শ্রীম (সহাস্যে) শিশির ঘোষ অমৃতবাজারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বেশ একটি গল্প বলতেন। খুব রসিক পুরুষ ছিলেন। বলতেন, একজন সাধক দেবীর আরাধনা করছেন। তুষ্ট হয়ে দেবী দর্শন দিয়ে বর চাইতে বললেন। সাধক চাইল—ভারত উদ্ধার। 'তথাস্তু' বলে মা অন্তর্ধান হচ্ছেন। আর যেতে যেতে বললেন, তবে চারশ' বছর পর, বাবা। সাধক উদ্বেগে চীৎকার করে বললো, আমি তো তখন থাকবো না (শ্রীম ও সকলের উচ্চহাস্য)।

শ্রীম—ঠাকুরের মায়ের গর্ভযন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুরের বাবা শুনে বললেন, এখন প্রসব বেদনা কি ? আগে রঘুবীরের সেবা শেষ কর (হাস্য)।

এতক্ষণে শুকলাল, শান্তি, শচী, গদাধর, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন। মিষ্টিমুখ করিয়া অনুকূল বিদায় লইতেছেন আর প্রার্থনা করিতেছেন, একদিন আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে হবে। শ্রীম উত্তর করিলেন, কাছে হলে হয়। অনেক দূর যে আপনার বাড়ী ! তা হয় না। ঐ ভয়—পাকা আঁব, কখন হয়ে যায়। মঠে দক্ষিণেশ্বরে যেতে কত সাধ, কিন্তু হয়ে ওঠে না। এক একবার উৎসাহে ভুল হয়ে যায় যে আমি বুড়ো হয়েছি। তার ফল হয় কষ্ট। Old manদের (বুড়োদের) কিছুই ঠিক নাই।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভৃত্য হ্যারিকেন লণ্ঠন দিয়া গেল। শ্রীম হাততালি দিয়া 'হরিবোল, হরিবোল'—এই নাম উচ্চারণ করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন—শুকলাল, বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, জগবন্ধু, বড় অমুল্য, বলাই, গদাধর, শান্তি, ভৌমিক, রমণী, বিক্রমপুরের ভক্ত, শচী প্রভৃতি। একটু পর আসিলেন বালিয়াহাটির হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী একজন বন্ধুর সহিত।

ধ্যানান্তে 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে—তৃতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড। কিছুক্ষণ পূর্বে মুন্সেফ অনুকূল সান্ন্যাল বলিয়াছিলেন, মা তাঁর মুখে এই পাঠ শুনেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর মিলন।...

…ঠাকুর বলিতেছেন, বোতাম খোলা থাকলে অসভ্যতা হবে না তো?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—কি আশ্চর্য পুরুষ! এই একটু পূর্বে গাড়ীতে ভাবসমাধি হয়েছে। তার প্রভাব এখনও চলছে টলতে টলতে চলছেন। কিন্তু এদিককার হুঁশও রয়েছে—ভদ্রসমাজে সেজে-গুজে যেতে হয়। কি অদ্ভুত মন! একই সময়ে দু'টি contradictions meet (দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের মিলন) হচ্ছে এখানে। জগৎ ছেড়ে মন বিলীন ভগবানে, কিন্তু জাগতিক ব্যবহারের খবরও করছেন। 'True to the kindred points of heaven and earth'—এইটি আদর্শ। অবতারদের এটি হয়। অখণ্ডের খবর এনে দিচ্ছেন খণ্ডে, অর্থাৎ finite-এ (জগতে)।'

পাঠক পুনরায় পড়িতেছেন—(শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে)…

…সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে… কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই। সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারে নি।…

শ্রীম—দেখুন, বিদ্যাসাগর মশায়ের কি আহ্লাদ এই কথা শুনে। বললেন, 'ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই', এটি নূতন কথা। মুখের ভিতর দিয়ে যা আসে তাই উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় কিনা! অবতারাদিতে অনেক originality (মৌলিকত্ব) থাকে, তাঁদের কথায় ও কাজে। এটি মানুষের একটি unique and original utterance (অভিনব ও অপূর্ব মহাবাক্য)!

পাঠ শেষ হইল। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভগবান নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনে নিজেই গিয়ে উপস্থিত তাঁর কাছে। তাঁকে আরও উৎসাহিত করলেন। বললেন, 'তোমার ভিতর মানিক আছে। তার খবর নাই।' এই খবরটি দিতেই তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায়কে দক্ষিণেশ্বরে যেতে বলেছিলেন।

কিন্তু তিনি কথা দিয়েও যেতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরের hintটা (ইঙ্গিত) ধরতে পারলেন না। ঠাকুর বলেছেন, ভক্ত ভগবানের দিকে এক পা এগুলে ভগবান দশ পা এগিয়ে আসেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
৬ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ, ২২শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল
রবিবার, শুক্লা চতুর্থী ২২ ৫৬ পল

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মহারাজ, বুদ্ধবংশে আমার জন্ম

১

মর্টন স্কুল, দ্বিতলের বারান্দা। এখন সকাল সাড়ে সাতটা। আজ ৭ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৩শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল। সোমবার, শুক্লা পঞ্চমী ২২।১ পল।

শ্রীম চারতলার নিজের কক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়াছেন। কাছেই বেঞ্চিতে ভক্তগণ বসা—জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয়, শচী, মণি, গদাধর প্রভৃতি। শচী এখানেই জগবন্ধুর সহিত থাকেন ও আহার করেন। শচীর বিবাহের কথা হইতেছে। শ্রীম তাহাকে পড়ায় নিযুক্ত করিতে চাহিতেছেন। তাহা হইলে বিবাহে মন যাইবে না। নিজে তাহাকে বি. এ.-র পাঠ্য সংস্কৃত পড়াইতেছেন। আর জগবন্ধুকে বলিলেন, আপনারা একে ফিলজফি পড়ান। আর মাঝে মাঝে একে নিয়ে সিটি কলেজে যাবেন। প্রফেসরদের লেকচার শুনলে পাঠে রুচি আসবে।

শ্রীম (শচীর প্রতি)—ফিলজফি বাংলায় লিখে নেবে। তাহলে বুঝতে পারবে ভাল। অন্য ভাষায় থাকায় ওসব কথা বুঝতে পারে না ছেলেরা। কথা তো ক'টা মাত্র। বাংলায় বললে সকলেই বুঝতে পারে। একে নূতন বিষয়, আবার বিদেশী ভাষা। ভাষার ভিতর

ভাবের নিবাস। ভাষা বুঝতে পারলে ভাব বোঝা খুব সহজ হয়। তুমি লিখে নেবে উনি যা বলেন।

কলেজে কি-ই বা হয় পড়া! খালি কতকগুলি বুলি ঝাড়ে। Ideas (ভাবগুলি) clear ('বোধগম্য) হয় না। বাংলায় লিখে নাও। তাহলে ইনিও (গদাধর) পড়তে পারেন। (গদাধরের প্রতি) তোমার 'ফেলাজফি' পড়তে ইচ্ছা হয় কি (ঈষৎ হাস্য)? না মশায়, আমার ফিলজফি পড়া হবে না, ভাই লক্ষ্মণের help (সহায়তা) ছাড়া (হাস্য)।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি)—এ কি ভাল, সাধুদের ওখানে (খাওয়া)? লুকোচুরি করে যেমন। একটু বেশী রইল, খেলুম। না রইল, কিনে খেলুম। এ কি? এ ভাল নয়। সাধুরা সামনা-সামনি বলেন সে এক কথা। তা না হলে এ কি লুকোচুরি!

ভিক্ষে করে খাওয়া। ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করতে পারে। বিদ্যাসাগর মশায় বলেছিলেন, তিন মুঠো চাল হলে আমার হয়ে যায়। তা তিন বাড়ী থেকে ভিক্ষে করে নেবো। কেন যাব অন্যের গোলামী করতে? আমি ব্রাহ্মণ!

যদি বুক এমনতর (উঁচু) করে চলতে চাও তবে ভিক্ষে কর। (আস্তে আস্তে) গিন্নীকে (শ্রীমর ধর্মপত্নীকে) দিয়ে ঠাকুর ভিক্ষে করিয়েছিলেন কাশীপুরে। আরও ভক্ত স্ত্রীরাও ভিক্ষে করেছিলেন। এতে অভিমান নষ্ট হয়, মন ভাল থাকে। ঠাকুর বলতেন, 'ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়।'

ভক্ত—রাঁধবো কোথায়?

শ্রীম—কেন, আমাকে এনে দিও তোমার যদি রাঁধতে কষ্ট হয়।

শ্রীম—(ভক্তদের প্রতি)—যার যেমন সংস্কার। ভিক্ষে করতে যাবে না। এই হবে আর কি, শেষে বাপের বাড়ীতে গিয়ে বসে বসে খাবে। আর জমি চাষ করবে। যেমন সংস্কার, যেমন আর দশজন করে।

গঙ্গাতীরে গেলে বেশ ভিক্ষে পাওয়া যায়। বেশী নিতে নাই।

গলাধাক্কা, কানমলা, 'বেটা' বলে গাল—এসবও হতে পারে। তা তোমার protest (প্রতিবাদ) করার দরকার কি ?

ভক্ত—বাবা, অত-তে আমার দরকার কি? অতো পারা যায় না।

শ্রীম—ঐ, যার যা সংস্কার তাই হবে। তা না হলে কেন গুরু তিনজন শিষ্যকে তিন রকম উপদেশ দিলেন! একজন শিষ্য ভাবছে, তীর্থ, তপস্যা না করলে হবে না। গুরু তাকে তাই করতে বললেন। আর একজন শরীরের কষ্ট সইতে পারে না দেখে তাকে বললেন, বিয়ে থা করতে। আর একজনকে দেখলেন বিয়ে করার ইচ্ছা নাই। তাই তাকে রেখে দিলেন নিজের কাছে।

যার যেমন সংস্কার, তেমনি উপদেশ। এখন যে গৃহে আছে, তাকে যদি বলেন—তীর্থ কর, কেদারনাথ যাও ; সে কি তা পারবে ? বলবে, টাকা দাও, একটি চিঠি দিয়ে দাও অন্যের উপর (হাস্য)। আবার যে গুরুর কাছে আছে তাকে যদি বলেন, 'বিয়ে কর গিয়ে', সে কি তা করতে পারবে ? হয়তো গুরুর কথা শুনে যাবে বিয়ে করতে। কিন্তু ঘুরে ঘুরে চলে আসবে। বাড়ীতে থাকতে পারবে না।

শ্রীম (স্বগত)—কি রকম ভাবতে হয় ? না, এই আমার প্রথম জন্ম—I am the first-born child. ত্রিভুবনে কেউ নাই আমার আত্মীয় কুটুম্ব। তবে হয়।

জগবন্ধু শচীনন্দনকে কিছুক্ষণ পুর্বেই General Philosophy (তত্ত্বিজ্ঞান) পড়াইয়াছেন। সেই বইখানা সামনেই রহিয়াছে।

শ্রীম (অঙ্গুলি দ্বারা বইখানা দেখাইয়া)—ওঁরা (পাশ্চাত্যের লোক) সংস্কার কি, তা প্রায় কেউ বোঝে না। হারবার্ট স্পেনসারে একটু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। তিনি heredity (বংশপ্রভাব) মেনেছেন। 'Heredity' (বংশপ্রভাব) মানেই সংস্কার।

হেয়ার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার হরনাথ আসিয়াছেন।

শ্রীম (হরনাথের প্রতি)—এই সব বই secondary (অপ্রধান) ফিলজফি প্রভৃতি। এইগুলি কি? না, ঈশ্বরকে চিন্তা করতে করতে যা ঘটেছে, তাই ফিলজফি—human thoughts (মানুষের

চিন্তাপ্রসূত)। বাইরের জিনিস সব observation (পর্যবেক্ষণ) করে, আর ভিতরের introspection (মানসিক অনুশীলন) দিয়ে জন্ম হয়েছে এই সব ফিলজফির। ভারত এরও উপরে উঠেছে। এদেশের লোক revelation (সত্যদর্শন) বিশ্বাস করেছে। তারই নাম বেদ। তপস্যা না করলে এটি হয় না। সর্বস্ব ত্যাগ করে তপস্যা করা ভগবানলাভের জন্য। তখন revelation (সত্যদর্শন) হয়। ঈশ্বর নিজেকে দর্শন দিয়ে বলেছেন—এই সত্য, এই কর্তব্য। মন স্থির করে তপস্যা চাই।

তাই ফিলজফিকে ভারতে বলে দর্শন। অর্থাৎ, প্রথম ঈশ্বর দর্শন করা। তারপর সেই সত্যটি যুক্তি-তর্কের দ্বারা জগৎকে বুঝিয়ে দেওয়া। এরই নাম ভারতীয় দর্শন! সত্য, ভগবান একটি। দর্শন ছয়টি। আবার বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন। এ সবেরই basis (মূল) revelation (প্রত্যক্ষ)। একটি সত্যই নানা বুদ্ধির ভিতর দিয়ে গিয়ে বহু নাম ধারণ করেছে। তাই ভারতীয় দর্শনের ভিন্নত্ব। মূলে একত্ব, বুদ্ধিতে ভিন্নত্ব।

এই ভাবটা ওদেশেরও কেহ কেহ স্বীকার করেছেন। কিন্তু ওদেশের সাধারণতঃ ফিলজফির basis (মূল) observation and experiment (পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা)। এই উপায়ে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তটি inferential (বিচারপ্রসূত)। কিন্তু ভারতীয় সকল ফিলজফিরই প্রসূতি হল প্রত্যক্ষ।

সর্বস্ব ত্যাগ করে একান্ত মনে তপস্যা করলে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। যেমন, জল ঘোলা থাকলে তা'তে মোহর চোখে পড়ে না, তেমনি চঞ্চল মনে ঈশ্বরদর্শন হয় না! নির্জনে গিয়ে মন স্থির করতে হয়, সেই মনে তাঁর দর্শন হয়।

হরনাথ—একটি গান আছে, 'মলিন পঙ্কিল মনে' ইত্যাদি।

শ্রীম—হাঁ। এটি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশায়ের রচিত। গয়াতে অনেক তপস্যা করেছিলেন তিনি। খুব ব্যাকুল হয়েছিলেন—ঝাঁপ দিতেও গিছলেন। তখন ঐ গানটি রচনা করেছিলেন।

হরনাথ—অনুগ্রহ করে আপনার ঐ গানটি—

শ্রীম পায়ের চটিজুতা ছাড়িয়া গাহিতেছেন। হরনাথও অস্ফুট স্বরে ধরিলেন।

গান—ডুব ডুব ডুব রূপ সায়রে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে সে রত্নধন।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গি
চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে শুন্ শুন্ শুন্—ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

শ্রীম (হরনাথের প্রতি)—গুরুপাদপদ্ম চিন্তা করে করে মন ডুবিয়ে দাও—কেশব সেনকে বলেছিলেন এই কথা। বই পড়াতে কিছু নাই বিশেষ করে বুড়োদের। নেহাৎ শুনতে ইচ্ছা হলে অন্য একজন পড়বে আর আপনি শুনবেন। এতে strain (মনের উপর চাপ) খুব কম হয়, আর impressionও (রেখাপাতও) বেশী হয়।

হরনাথের প্রস্থান। এখন বেলা দশটা।

২

অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে দক্ষিণাস্য। বেঞ্চিতে বসা—লক্ষ্মণ, গদাধর, শচী, জগবন্ধু প্রভৃতি। লক্ষ্মণকে অদ্বৈত আশ্রমের সাধুদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। একটু পরে অন্য কথা হইতেছে।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি)—ভিক্ষা করে খাওয়া খুব ভাল। বুদ্ধদেব রাজার ছেলে, ভিক্ষা করে খেতেন। সাত বছর পর দেশে গিছলেন। নিজের রাজধানীতে ভিক্ষা করতে লাগলেন। বাপ রাজা। তিনি বললেন, আমাদের ভিক্ষা করতে নাই। তুমি ভিক্ষা করো না। বুদ্ধদেব উত্তর করলেন সবিনয়ে—মহারাজ, আমি কি কেবল আপনারই ছেলে? বুদ্ধবংশে আমার জন্ম। ঐ বংশের রীতি ভিক্ষা করে খাওয়া। তাই ভিক্ষা করছি। বুদ্ধবংশ মানে সাধুবংশ, পরমহংস-বংশ। তা বলবেন না? ভিক্ষার অন্ন কত শুদ্ধ!

যে সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে সেই ভিক্ষা করতে পারে। আর পারে ব্রাহ্মণ-শরীর যাদের তারা। কত স্বাধীন! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচিন্তা করে সর্বদা।

কিন্তু বেশী আনতে নাই। বেশী দিলে বলতে হয়, না—একমুষ্টি দিন। অনেক পয়সা দিলে একটি পয়সা নিতে হয়! তা কি আবার রাগ করে বলবে নাকি—না না, আমি তোমাদের অত সব চাই না, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। তা নয়। বলতে হয় নারায়ণ ভেবে, হাত জোড় করে—আমায় এক মুষ্টি দিন। মনে করতে হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ দিচ্ছেন। আর স্ত্রীলোক হলে সাক্ষাৎ ভগবতী দিচ্ছেন।

কাপড় সাধলে নিতে নাই যদি কাপড় থাকে। যখন থাকবে না তখন যদি কেউ দিতে চায় নিতে পারা যায়।

এ বড় শক্ত পথ। যে কেবল দিন রাত ঈশ্বরকে ডাকছে সেই কেবল ভিক্ষা নিতে পারে। অন্যে পারে না। শরীর আছে, খেটে খাও!

আর জপ করতে করতে যেতে হয়। এক বাড়ী ভিক্ষা হয়ে গেল, অমনি জপ করতে করতে অন্য বাড়ী যাও। সারা রাস্তাই জপ, খালি জপ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ভিক্ষুজীবন বড় কঠিন! যেমনি আনন্দ, তেমনি দায়িত্ব। নিজেব জন্য, আবাব জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে হয়। সকলকে, জীবকে মিত্রভাবে দেখতে বলেছেন বুদ্ধদেব। অম্ববালী গণিকা, তবুও তার ভিক্ষা স্বীকার করলেন। বলবার যো নাই তোমার ভিক্ষা নেবো না। সমদৃষ্টি যে! গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন, 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'।

মহামায়ার এমনি খেলা, সব ভুলিয়ে দেয়। সন্ন্যাসজীবন নিয়েও অনেকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অভিমান এসে সব পণ্ড করে। তাই প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন ঠাকুর—'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' বলতে হয়—ভগবান, আমায় সুমতি দাও।

প্রকৃতি ঠেলে নিয়ে যায়। গুরুর উপদেশ তাই পালন করতে পারে না। প্রকৃতি যাচ্ছে ভোগের দিকে। ওদিকে তার natural gravitation (স্বাভাবিক আকর্ষণ)। গুরু বলছেন যেতে অন্য দিকে, ঠিক উল্টো দিকে। নিজের চেষ্টা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস, আর ঈশ্বরের কৃপা—এই সব মিলে দু' একটাকে এই বেড়ি-কলের বাইরে যেতে দেয়। এই তিনটির একত্র সংযোগ হলেই ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে ডাকা সম্ভব হয়। তখন নিজের প্রকৃতি বুঝতে পারে। তখনই নিজের মনকে নিজে জানে। তার পূর্বে গুরুবাক্যে বিশ্বাস আর সর্বদা প্রার্থনা।

(আকাশের ঘুড়ি দেখাইয়া) এইগুলি বেশ উড়ছে। মাঝে মাঝে এক একটা গোত্তা মেরে তীব্র বেগে নীচে পড়ে যাচ্ছে—headlong down. আবার পাকা খেলোয়াড়ের হাতে পড়লে সে ঐটাকে একেবারে উপরে তুলে ফেলছে। তেমনি মানুষের মন! একে বিশ্বাস করা চলে না যতক্ষণ না তাঁর দর্শন হয়েছে। আবার একে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নাই। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই সতীনের ঝগড়া চলছে নিয়ত। এর ভিতর থেকে কারু কারুকে তিনি নিবৃত্তিতে নিয়ে যান। এটা তাঁর কৃপা, তাঁর ইচ্ছা।

অন্তেবাসী উঠিয়া তাঁহার বাসস্থান পার্শ্ববর্তী টিনের ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। চুপি চুপি কথা হইতেছে—অপরে না শোনে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি চাহিয়া)—তারপর —বাবু কি বললেন? বলেছিলেন four points (চারটা কথা)—বলুন তো কি?

অন্তেবাসী—প্রথম, অনেক কাল থেকে টাকা দিয়ে আসছেন। এখন বন্ধ করলে সাধুর কষ্ট হবে। দ্বিতীয়—আপনার helpতেই (সহায়তায়ই) আশ্রম খুলেছেন। এখন না দিলে খুব কষ্ট হবে। তৃতীয়—moral degradation-এর (নৈতিক পতনের) যখন কোনও positive proof (নিশ্চিত প্রমাণ) পান নাই তখন বন্ধ করা উচিত কি? চতুর্থ—আপনার তো পাঁচ রকমে কত টাকা খরচ হচ্ছে। এই ক'টা টাকা বাঁচালে কি লাভ হবে?

শ্রীম সহাস্যে—হাঁ। কথাটা এই, তাঁর আর দেবার ইচ্ছা নাই!

অন্তেবাসী—আমার মনে হয় আমার সঙ্গে জেদ করে করছেন। আমি অপর পক্ষকে খুব vigorously defend (তীব্রভাবে সমর্থন) করেছি। বলেছি, যখন প্রত্যক্ষ কোনও দোষ পাই নাই, সামান্য একটা ছুতোতে সাহায্য বন্ধ করলে আপনার পাপ হবে। আপনি দিতে সমর্থ। আমার মনে হয়, এই কথাতেই তাঁর জেদ বেড়ে গেছে।

শ্রীম—না, না। তা নয়। এই যা করেছেন উনি, তা আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে নয়। নিজের সঙ্গেই নিজে ঝগড়া করে এটা করেছেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, পূর্বে বিশ্বাস ভক্তিতে দিতেন। এখন সে বিশ্বাস ভক্তি ছুটে গেছে। আচ্ছা, ঐ পয়েণ্টে কি উত্তর দিলেন?

অন্তেবাসী—আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, কেন আমাকে আপনি ঐ ব্যক্তির উপর সন্দেহ করছেন? তাঁর চরিত্রের স্খলন হয়েছে এমন কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি? কেউ নিজ চক্ষুতে দেখে বলেছে কি? তা'তে উত্তর করলেন, না তা নয়। আর তাঁর চরিত্রে আমার সন্দেহ নাই।

শ্রীম—ও-ও-ও, তাহলে moral কোন সন্দেহ নাই। তাহলে high character-এর (উন্নত চরিত্রের) লোক বলতে হবে এঁদের যখন কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের মত, সাহায্য দেওয়া উচিত যেমন দিয়ে আসছেন। আচ্ছা, এদিক তো এই (মাসিক পঁচিশ টাকা সাহায্য বন্ধ) করলেন। অন্য দিকের (জলবৎ পারিবারিক অর্থব্যয়ের) কি?

অন্তেবাসী—ওদিকে হাত দিতে পারবেন না। কে শুনছে তাঁর কথা!

শ্রীম (সহাস্যে)—এই সংসারের ছবি! সৎকার্যে দু'টি পয়সা খরচ, তা বন্ধ করে দেবে। আর অপদার্থ কতকগুলির জন্য দিনরাত খেটে খেটে জীবন দান করছে। মহামায়ার এই খেলা!

এখন সন্ধ্যা। স্বামী সুবোধানন্দের প্রবেশ। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান, পূর্বাশ্রমে শ্রীমর ছাত্র ও প্রতিবেশী। ঠাকুর তাঁহাকে

শ্রীমর কাছে যাতায়াত করিতে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'মাস্টারের কাছে গেলে এখানকারই কথা সব হবে। তুই যাস ওখানে।' তিনি এখন বৃদ্ধ হইলেও গুরুবাক্য পালন করিতে মাঝে মাঝে আসেন।

শ্রীম স্বামীজীকে লইয়া সিঁড়ির ঘরে গিয়া বসিলেন। শচী, গদাধর, ভগবন্ধু প্রভৃতিও উপস্থিত আছেন। অন্তেবাসী স্বামীজীর সেবার বন্দোবস্ত মত দ্রব্যাদি বাজার হইতে লইয়া আসিয়াছেন। এক বোতল সোডা ওয়াটার, এক প্যাকেট হাওয়া গাড়ী সিগারেট, একটি দেশলাই ও বড় দুইটি রাজভোগ। তিনি আসিলে শ্রীম তাঁহাকে এই উপকরণে পূজা করেন। তিনি খাইতেছেন আর কথা কহিতেছেন। ভবানীপুরে চন্দ্রকান্ত উকীলের বাড়ীতে ফুড-পয়জনিংএ চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে মারা গেছে। এই সকল কথা সহরের সর্বত্রই হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পর অন্য কথার অবতারণা হইল।

স্বামী সুবোধানন্দ—মাস্টার মশায়, (একটি ভক্তকে দেখাইয়া) ও যেখানে যায় সেখানেই রাঁধতে বলে। তাই যেতে চায় না কোথাও। আগে ঐ কাজ করতো কিনা! ঠাকুর বলেছিলেন, যার ভয় কর তুমি সেই দেবী আমি (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। পঞ্চবটীতে বসে বসে একদিন তৃণ বাচছি। কটি মেয়েমানুষ পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে বলছে অভিমানে—কি সাধু, আমি অতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি তোমার পেছনে। আর তুমি একবারও ফিরে চাইলে না, না একটি কথা বললে। আমি যে আখড়ায় গেছি সেখানে এমন একটি লোকও দেখি নাই যে আমার সঙ্গে কথা কয় নাই, আর আমায় ওখানে থাকতে বলে নাই। আহা, এই সাধুটি ভাল। একবারও ফিরে চাইলে না (সকলের হাস্য)।

শ্রীম—তাই যদি করবেন তবে ঘর ছেড়ে এলেন কেন? কিসের অভাব ছিল? (কিয়ৎকাল চিন্তার পর রহস্যের সহিত)—Once

(একবার) a রাঁধুনী তো always (সর্বদাই) a রাঁধুনী ! তা কেন হবে ? কেন রাঁধবে শুধু—সারা জীবনই রাঁধতে হবে (হাস্য) ?

স্বামী সুবোধানন্দ—মহেশ ভট্টাচার্যের বাড়ীর এক দরোয়ান আজকাল ভিক্ষে করে খাচ্ছে। চাকরী করতে নারাজ। বলে, নৌকরী নহি করুংগা।

শ্রীম (আনন্দের সহিত)—বা, বা ! কি সুন্দর কথা ! স্বাধীনতা না থাকলে লোকের অবনতি ঘটে। কি স্বাধীনতার কথা—নৌকরী নহি করুংগা।

(ভক্তদের প্রতি সহাস্যে) একটা গল্প আছে। একটা হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের সঙ্গে একটা ক্ষুধার্ত বাঘের দেখা হল। বাঘ জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা, তোমার শরীর এমন ভাল হল কি করে ? কুকুর বললে, তোমার শরীরও ভাল করতে পার। চল আমার সঙ্গে। কুকুরের গলায় একটা কলার বাঁধা দেখে বাঘ জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা, তোমার গলায় একটা কিসের দাগ, আর এটা কি বাঁধা ? কুকুর বললে—না, ওটা কিছু নয়। রাত্রে আমায় ছেড়ে দেয়। (অন্তেবাসীর প্রতি) বাঘ বললে—বাবা, আমার কাজ নাই মোটা হবার। আমি বেশ আছি (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (স্বামী সুবোধানন্দের প্রতি)—গঙ্গায় ডুবে মরেছিস্ তা বরং শুনবো, তবুও চাকরী করেছিস্ এ কথা যেন না শুনি—রাখাল মহারাজকে ঠাকুর এই কথা বলেছিলেন। স্বাধীনতা চাই। তা না হলে মন সর্বদা নীচু হয়ে থাকে। প্রণামান্তে স্বামী সুবোধানন্দ প্রস্থান করিলেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
৭ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ, সোমবার

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জীবন্ত ভাষ্য

মর্টন স্কুল। রাত্রি আটটা। ভক্তদের মজলিশ বসিয়াছে ছাদে। সভাপতি শ্রীম বসিয়াছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। আর ভক্তবৃন্দ শ্রীমর সামনে তিন দিকে বেঞ্চিতে বসা। বড় জিতেন, শচী, শান্তি, জগবন্ধু, গদাধর, ছোট রমেশ, ছোট নলিনী, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয় প্রভৃতি আসিয়াছেন। বড় জিতেন হাইকোর্টে কর্ম করেন। তিনি কথা কহিতেছেন।

বড় জিতেন (শ্রীমর প্রতি)—আজ কোর্টে শুনে এলাম, ভবানীপুরের উকীল চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ীর চার পাঁচটি ছোট ছেলে-মেয়ে ফুড-পয়জনিংএ মারা গেছে। বাসী খিঁচুড়ি আর ইলিশমাছ খেয়েছিল।

শ্রীম (দুঃখের সহিত)—হাঁ, খোকা মহারাজও এই কথা বলে গেলেন। আহা, কতকগুলি প্রাণ গেল! আচ্ছা, সবই কি আপনাদের লোক?

ছোট জিতেন—আজ্ঞা হাঁ। এক পরিবারেরই সব।

শ্রীম—আহা, কত স্নেহ ভালবাসা! পরিবারের লোকদের কি অবস্থা আজ ভেবে দেখুন! আমাদের এখানে একটি বিড়াল থাকতো। হঠাৎ কোথা থেকে এসে অতিথি হয়ে আছে। রোজ আহারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বেশ আছে সে। ও মা, একদিন হঠাৎ কোথায় পালিয়ে গেল। রাত্রের খাবার নিয়ে এসেছে, কিন্তু তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজে খুঁজে হয়রান। শুনেছিলাম হাড়ীরা বিড়াল পোষে। খুঁজতে খুঁজতে সুকিয়া স্ট্রীটের ওধারে ওদের পাড়ায় গেলাম। কিন্তু পাওয়া গেল না।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—আর তাদের শোক হবে না! কত স্নেহ—কতদিন সঙ্গে রয়েছে, খাইয়েছে, পরিয়েছে।

বড় জিতেন—দেখুন না, আজ একটি ছেলে বাড়ী ফিরতে দেরী করেছে। তাই, এখানে আসবার সময় ফুটপাথের দুদিকে দেখতে দেখতে এলাম। To tell you the truth (সত্য কথা বলতে হলে)—মনের এই অবস্থা।

শ্রীম—তাঁরই মহামায়াতে এরূপ হয়। তবে তার একটি ব্রহ্মাস্ত্র আছে—out of sight out of mind (দৃষ্টির বাইরে যা, মনের বাইরে তা)। অন্য কিছুতে স্নেহ যায় না। একমাত্র ঔষধ এই—দূরে পলায়ন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুর তাই বলেছিলেন, 'আমার' বলতে নেই। তাহলে মহা মুশকিলে পড়তে হবে। একজন ভক্ত কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমার ছেলে'। শুনে ঠাকুর তখুনি ধমক দিয়ে বললেন—বল, ভগবানই এই ছেলেরূপে এসেছেন। গোপালভাবে তার সেবা কর। 'আমার ছেলে' বললে ঐ বিপদে পড়বে।

এক, ঈশ্বরকেই ভালবাসতে হয়। অপরকে ভালবাসলেই শোক তাপ অনিবার্য। আত্মা ছাড়া অন্য প্রিয় কিছু নাই, বেদে আছে। অতএব কেবল ঐ আত্মাকেই ভালবাস, পূজা কর জগতের সকলের ভিতর।—'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।'

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—তবে মহাপুরুষরা পারেন। তাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে। তাঁরা আর স্নেহে আবদ্ধ হন না। রাম, কৃষ্ণ—এঁদের জীবন দেখুন না! এঁরা পারেন। এঁদের কথা আলাদা। প্রভাসে যদুবংশ ধ্বংস হল পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে। শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম দাঁড়িয়ে দেখলেন। পূর্বেই জানতেন, এঁদের এই দশা হবে। বলরাম সমুদ্রের তীরে বসে সমাধিতে শরীর ত্যাগ করলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে শরীর ত্যাগ করলেন। ব্যাধকে দুঃখী দেখে বললেন, দুঃখ পরিহার কর। আমার ইচ্ছাতেই তুমি আমাকে তীরবিদ্ধ করেছো। ঋষিদের শাপে যদুবংশ

ধ্বংস হবে। আমার শরীর ঐ বংশের। তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর—এই বলে জরাব্যাধকে মুক্তি দিলেন।

ঈশ্বরকে জেনে সংসার করলে স্নেহ মমতায় আটকাতে পারে না। জনক রাজ্যশাসন প্রজাপালন করেছিলেন, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। বেদব্যাস ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করলেন মায়ের আদেশে—এও নির্লিপ্ত-ভাবে। এ কি আর কাম? তা নয়। প্রত্যাদেশ। এই মহাপুরুষরা এত করেও অপরের মত স্নেহে বদ্ধ হন নাই।

জগৎরক্ষার greatest force-ই (সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিই) হলো স্নেহ। এতেই বদ্ধ করে। আবার, এই স্নেহ ঈশ্বরের দিকে চালিয়ে দিলে ওতে আবার মুক্ত হয়!

ঠাকুর বলেছিলেন—কথাটা হচ্ছে, সচ্চিদানন্দে প্রেম। অন্য কিছুতে এই প্রেম, ভালবাসা হলে রক্ষে নেই। এর জের কত জন্ম চলে তার ঠিক নেই!

তাই আগে নির্জনে গোপনে সাধন-ভজন করে, ভক্তি লাভ করে সংসারে থাকা উচিত। তাহলে আর বদ্ধ হবে না। তখন কোন্‌টা শ্রেয় কোন্‌টা প্রেয়, তা বোঝা যায়। পাণ্ডবরা অত রাজ্যশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ করেও শেষে সব ছেড়ে মহাপ্রস্থান করলেন। তা করবেন না তাঁরা? তাঁরা যে কৃষ্ণকে চিনেছিলেন। চিনেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শত্রু-মিত্রে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, মায়ামোহের অতীত, শত্রু-মিত্রে সমান, লাভালাভে স্থির। এদিকে কত স্নেহ, কত ভালবাসা, কত প্রেম ঢালাঢালি করলেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু এ সবই বাইরে বাইরে; ভিতরে জ্ঞান ছিল, আমি সচ্চিদানন্দ! তাই বলেছিলেন,

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

ঋষিরা ঈশ্বরকে জেনে স্নেহ কেটে সংসারে ছিলেন। এই স্নেহ কাটার নামই সন্ন্যাস। তাই সন্ন্যাস আশ্রমের ব্যবস্থাও ঋষিরা করে গেছেন।

এবার কথামৃত পাঠ হইতেছে। শ্রীম নিজে বাহির করিয়া দিলেন,

তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড। শান্তি পড়িতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। অধর সেন, যদু মল্লিক ও খিলাত ঘোষের বাড়ী দর্শন করিতেছেন।

শ্রীম স্থির হইয়া পাঠ শুনিতেছেন, চক্ষু অর্ধনিমীলিত। শরীর ছবির মত নিশ্চল। মন বুঝি অধরের বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব নৃত্যানন্দে নিমগ্ন। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। আবার, খানিক পর যদু মল্লিকের বাড়ীতে জগদম্বার মন্দিরে যুক্ত করে মায়ের সম্মুখে সমাধিস্থ। শ্রীমও বুঝি উন্মনা, সমাধিতে বাহ্য চৈতন্য হারাইয়া শ্রীভগবানের নরলীলার এই দৈব দৃশ্যাবলী দর্শন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পর শ্রীমর বাহ্য চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি আবেগভরে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—ভগবান অন্তর দেখেন। ভক্ত অন্তরে যা বলে তা শোনেন। অধর নিজের বাড়ীতে বসে কেঁদেছিলেন ঠাকুরের জন্য। আর ঠাকুর বিনা সংবাদে এসে উপস্থিত হলেন। এতসব দেখে শুনেও লোকের বিশ্বাস হয় না। এমনি তাঁর মায়া! লোকে বলে, ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কি? আর থাকলেও প্রার্থনা করলে যে শোনেন তার প্রমাণ কি? এই তো প্রমাণ! অধর আন্তরিক ডেকেছিলেন, তাই স্বেচ্ছায় গিয়ে হাজির। যখন শরীর চলে যায়, অবতার তখনও ভক্তদের দর্শন দেন। কখনও মনে শান্তি, অভয় ও আনন্দরূপে উদয় হন। যাঁদের এইরূপ দর্শন হয়েছে তাঁরাই যে বলছেন। তাই এই তো প্রমাণ। কি দুর্বার জীবপ্রকৃতি, এতো দেখেও সংশয়!

আহা, সে কি অপরূপ নৃত্য! বর্ণনা হয় না তার। কি মধুর ও আনন্দময় ভাব! দেখলেই মনকে জগৎ থেকে টেনে নিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে ঐ নৃত্যে। কি আকর্ষণ, কি মাদকতা! চুম্বক লোহাকে যখন টানে তা কি বিচার করে টানে? এ দু'টোর সম্পর্ক হচ্ছে তাদাত্ম্য। ভক্তরা ঠাকুরের নৃত্যের স্বাভাবিক আকর্ষণে অজানাভাবে গিয়ে যোগদান করলেন ঐ নৃত্যে। বিচারটিচার,

সংকোচ উড়ে আকাশে বিলীন হয়ে গেল। কিংবা আনন্দ-সাগরের বন্যা এসে যেন ভক্তদের বিচারটিচার সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নরেন্দ্র পর্যন্ত বিভোর হয়ে নৃত্য করছে। ব্রহ্মভাবটির নির্বাক প্রকাশ হচ্ছে ঐ নৃত্যে। ভাবকে প্রকাশ করে ভাষা। ঠাকুরের ঐ নৃত্যটিই হলো ভাষা—অন্তরের ব্রহ্মভাবটি প্রকাশের। তাই মনপ্রাণ হরণকারী।

হাজার লেকচারে যা না হয়, জন্মজন্মের কঠোর তপস্যায় যা না হয়, একবার ঐ নৃত্যটি দর্শন করলে তার চাইতে শতগুণ অধিক কাজ হয়। যারা সংস্কারবান, তারাই কেবল এ দৈব লীলা দর্শন করতে পারে। ভক্তদের কল্যাণের জন্য ভগবান নরদেহ ধারণ করে এই সব লীলা করেন। শাস্ত্রে এইসব সম্বন্ধে যা বিবরণ রয়েছে তা পড়ে ঐ মাদকতা আসে না, একবার জীবন্ত মানুষশরীরে এইসব দর্শন করলে যেরূপ হয়। অবতারের জীবনে এসব দেখলে তবে শাস্ত্রে সত্যিকার বিশ্বাস হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—বৈষ্ণবচরণ খুব সুপণ্ডিত। ঠাকুরকে বলতেন, আপনি যা বলেন, তা শাস্ত্রে আছে। তবে, আপনার কাছে আসি কেন? ঐ সব কথা আপনার জীবনে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। আপনার জীবনটিই হলো শাস্ত্রের জীবন্ত মূর্তি, জীবন্ত ভাষ্য।

ঠাকুরের সব কথা, সব কাজ শাস্ত্র। সর্বশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও উপাস্য যে সচ্চিদানন্দ, সেই সচ্চিদানন্দ ঠাকুরের কণ্ঠে বসে কথা কইতেন, কখনও অঙ্গভঙ্গীতে, নৃত্যে প্রকাশিত হতেন। ঠাকুরের জীবন প্রমাণ করেছে, শাস্ত্র সত্য। শাস্ত্রের সরল, সরস ও প্রত্যক্ষ interpretation (ভাষ্য) ঠাকুরের জীবনের আচরণ, কথা ও নৃত্যাদি।

ঠাকুর বলেছিলেন, আন্তরিক ডাকলে ঈশ্বর শুনবেনই শুনবেন। ঈশ্বর শোনেন যে, এই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—অধর সেনের বাড়ীতে তাঁর শুভাগমন।

(কিয়ৎকাল মৌন ভাবনার পর) যদু মল্লিকের ভিতর ভক্তি ছিল। তাইতো অত যেতেন। কত ভালবাসা পেয়েছেন এঁরা

সব ঠাকুরের কাছে। তাঁর সকাম, নিষ্কাম দুই প্রকার ভক্তিই ছিল। বললেন কি না ঠাকুর, তুমি রামজীবনপুরের শীল। এঁরা যেমনি ভক্তিমান তেমনি দুর্দান্ত প্রতাপশালী জমিদার।

(সহাস্যে) যদুবাবু বলেছিলেন, তুমি আমায় উদ্ধার করবে না? আহা, কি বিশ্বাস! এদিকে অত বিষয়ী, সর্বদা মোসাহেবপরিবৃত ধনকুবের। আবার ওদিকে ঐ কথা—আমাকে তোমায় উদ্ধার করতে হবে। বিষয় ও বিশ্বাস একাধারে! এসব interesting personality (কৌতূহলোদ্দীপক লোক)। এই contrastএ (বৈপরীত্যে) বিশ্বাসের মাহাত্ম্য জীবন্ত হয়েছে।

আহা, কত ভাগ্যবান এঁরা গো! কত বছর ধরে যদুবাবুর কাছে ঠাকুর যেতেন। উনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুরকে ডাকিয়ে নিতেন তাঁর বাগানে। তাঁর একটি দরোয়ানও ভক্ত ছিল। সেই আসতো ডাকতে। আমরা যাওয়ার বহু পূর্ব থেকে ওখানে যাতায়াত ছিল ঠাকুরের।

(সহাস্যে) চণ্ডীর গান দেবার কথা ছিল। যদুবাবু দেন নাই। তাই রসিকতার ছলে তিরস্কার করলেন। মুখের উপর বলে এলেন, বেনেরা বুঝি খুব হিসাবী!

ভাল-মন্দে মিশান মানুষ। ঠাকুর ভালটা দেখতেন। 'ঠগ বাছলে গাঁ উজাড।' যদুবাবুর ভক্তির জন্য ঠাকুর তাঁর কাছে যেতেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—খিলাত ঘোষের বাড়ী গিছলেন ঐ বৈষ্ণব ভক্তটির জন্য। ঠাকুরকে ভালবাসতেন, তাই বাড়ীতে গিয়ে তাকে বলে এলেন একঘেয়ে না হয়। বললেন, সকল উপাসকেরাই এক ঈশ্বরকেই ডাকে। অতএব সকল ধর্মমতই ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ। কেবল বৈষ্ণবমতই পথ নয়। বলেছিলেন, যেমন নানা দিক্-দেশ হতে প্রবাহিত সকল নদী একই সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মপথ এক ঈশ্বরে মিলিত হয়। বৈষ্ণব ভক্তকে কৃপা করতে গিছলেন। ঐ দিন আকাশ জুড়ে কি চাঁদের আলো! আজও দেখছি সেই আলো, সেই চাঁদ!

(সহাস্যে) যাবার সময় গাড়ীতে একজন অন্তরঙ্গ ভক্তকেও বলেছিলেন এই কথা—এই মনে করো না, যা আমি বুঝেছি তাই সত্য, আর সব অসত্য। বল, তাঁর জগতে সব হতে পারে। আমার এই ভাবটি ভাল লাগে, তাই আমি তা করছি।

দেখুন, কি fine distinctionটি (সূক্ষ্ম ভেদ) বুঝিয়ে দিলেন, ধরিয়ে দিলেন। সৎগুরু ছাড়া এটি কে দিতে পাবে? বললেন, তোমার নিষ্ঠা রাখ একটি ভাবে, আদর্শে। কিন্তু অপর ভাব ও অপব আদর্শও সত্য হতে পারে, এ ভাবটিও রাখ। তাহলে উদার হবে। ক্রমে বুঝতে পারবে সব।

আর বললেন, সত্য ধরে থাক। তা হলে ভয় নাই।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি চাহিয়া)—ভগবান কি quantityর (বহুলতার) বশ? তা নয়। তিনি দেখেন quality (গুণ)। অন্তর দেখেন তিনি। একজন যদি অন্তরে বুঝতে পারে—আমার শক্তিতে ঈশ্বরলাভ হবে না, তাঁকে ধরতে পারবো না, তখনই তিনি মনে উদয় হন, আর নিরাশা দূর করে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। তিনি হৃদয়ে উদিত হলে ভরসা আসে, আনন্দ আসে, অভয় আসে সঙ্গে সঙ্গে। যেমন শিশু! সে জানে, মা ছাড়া আমার দুঃখ কেউ দূর করতে পারবে না। এমনি বিশ্বাস, এই নির্ভরতা এলেই কাজ হয়ে গেল। তিনি এতে তুষ্ট। কতকগুলি কথাতে লেকচারে তিনি তুষ্ট নন, কিন্তু ভাবে তুষ্ট। অন্তরের একটি কথাতে তিনি তুষ্ট।

তিনি ছাড়া আমার আর কেউ নাই—অন্তরে এই ভাবটি চাই। এটি এসে গেলেই প্রায় জীবন্মুক্ত। তখন আনন্দে থাক সংসারে। এই সব অতুল ঐশ্বর্য ঠাকুর আপনাদের জন্য রেখে গেছেন। ভয় কি?

রাত্রি এখন সাড়ে দশটা। ভরসায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া ভক্তগণ বিদায় লইলেন।

২

পরদিন মঙ্গলবার। সকাল সাতটা। দ্বিতলের সভাগৃহে বসিয়া শ্রীম 'কথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগের প্রুফ দেখিতেছেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও

নরেন্দ্র'। একা একা দেখিলেন নয়টা পর্যন্ত। অপরাহ্ণ একটার সময় ঐ প্রুফই দিলেন জগবন্ধুকে। তিনি টিনের ঘরে বসিয়া প্রুফ দেখিতেছেন।

ভাটপাড়ার ললিত, শচী, শান্তি ও ভৌমিক আসিয়া ছাদে টিনের ঘরের পাশে জগবন্ধুর কাছে বসিয়াছেন। জগবন্ধু প্রুফও দেখিতেছেন আর মাঝে মাঝে ভক্তদের সঙ্গে দুই চারিটা কথাও বলিতেছেন।

পাঁচটার সময় শ্রীম ছাদে আসিলেন নিজের ঘর হইতে। ভক্তগণ উঠিয়া গিয়া শ্রীমর সম্মুখে বেঞ্চিতে বসিয়াছেন। শ্রীম উপবিষ্ট চেয়ারে উত্তরাস্য। শ্রীমর সহজ ও সরস ভাব। ললিতের সহিত নানা কথা হইতেছে। প্রথম হইল ললিতের সংসারের কথা। তারপর হইল গান্ধীজীর নন্-কোঅপারেশন ও রাজনীতির কথা। সকলের শেষে উঠিল জীবের দুঃখের কথা।

শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—দুঃখ কি এক রকম? ছিটা গুলীর মত চারদিক থেকে নানা রকম দুঃখ এসে জীবকে আক্রমণ করে। মনকে ভগবানের পাদপদ্মে বেঁধে রাখতে পারলে কতকটা রক্ষে। নইলে সারা জীবন ওলট-পালট খেতে খেতে প্রাণ যায়।

দেখুন না, ভবানীপুরে কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল! একসঙ্গে বাড়ীর পাঁচটি ছেলেপুলে চলে গেল। সকলেই তো খাচ্ছে খিঁচুড়ি আর ইলিশ মাছ। তাদের যে এ দশা হবে তা কি কেউ জানতো? বাড়ীর লোক কি এজন্য প্রস্তুত ছিল? যেন কোত্থেকে ছিটা গুলী এসে এদের প্রাণ নিয়ে গেল। বাপ-মায়ের কি কষ্ট, একবার একটু ভেবে দেখুন!

আহা, দুঃখ কি কেবল এদেরই হয়েছে, আমাদের নয়? ধরতে গেলে সবই আমাদের, আবার সবই পর। Common humanity (মনুষ্যসমাজ) একটাই তো আছে!

ভৌমিক—মনের আবরণ উঠে না গেলে কি ওটি বোঝা যায়?

শ্রীম—আবরণ আর কি? মানুষ অনেক কাজকর্ম নিয়ে আছে

বলে এটি বোধ করতে পারে না। আমাদের অনেক কাজ নাই কিনা, তাই একটু feel (অনুভব) করতে পারা যাচ্ছে। (শচীর প্রতি) বুঝলে শচীবাবু, 'feeling' (অনুভব)—তুমি যা পড়ছো।

শ্রীম (সকলের প্রতি)—ঠাকুর একদল ছেলে তৈরী করেছেন, যারা ঈশ্বর-বই আর কিছুই চায় না। তাদের মধ্যে অনেকেই বি. এ., এম. এ., আবার বি. এল. আছে। এরা সংসারের অন্য কিছুই চায় না ঈশ্বর-বই। অপর লোক সংসারের জিনিস নিয়ে আছে। সকলে তাদের চিনতে পারে না—সকলের ভাল লাগে না। আহা, কি হীরের টুকরো ছেলে সব তৈরী করেছেন ঠাকুর!

যাদের শুভ সংস্কার আছে কেবল তারাই তাদের চিনতে পারে। যারা হীন বংশে জন্মেছে তারা তাদের চিনতে পারে না। হীন বংশ, নীচ বংশ মানে, যাদের ঈশ্বরের খবর নাই। আহার, বিহার, মৈথুন, ভয়—সার করেছে যারা। বেদে তাদের বলা হয়েছে অবিদ্যার সন্তান, 'মূঢ়াঃ', 'অন্ধাঃ'। এরাই গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ঢেলে দেয়। আর বলে, যা হবার তাই হবে। (শচীর প্রতি) জান তো গড্ডালিকাপ্রবাহ কি, শচীবাবু?

শচীনন্দন—একটা ভেড়া যা করে অপরগুলিও তাই করে।

শ্রীম—হাঁ। এক হাজার ভেড়া যাচ্ছে। আগের ভেড়াটা যদি কোনও কারণে লাফ দিল, তবে পেছনের গুলোও ঐরূপ লাফ দেবে। নিজে দেখবে না লাফ দেওয়ার দরকার আছে কি না। তেমনি যারা নীচ বংশে জন্মেছে তারা কেবল ভোগ নিয়ে থাকে। নীচ বংশে ঈশ্বরের চিন্তা হয় না কিনা। এঁদের (মঠের সাধুদের) চিনতে পারে তারা যাদের জন্ম সৎ বংশে।

কতকগুলি নূতন ভক্ত আসায় অন্য কথা চাপা পড়িল। এদিকে আবার সন্ধ্যা সমাগতা। হ্যারিকেনের আলো আসিতেই শ্রীম যুক্ত করে প্রণাম করিয়া করধ্বনির সহিত 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ধ্যানের পর আবার কথাপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। একজন ভক্ত ভবানীপুরের বিষাক্ত আহারে মৃত্যুর কথা উত্থাপন করিলেন।

শ্রীম—'মাদার'গুলি শেখায় না ছেলেপুলেদের—নিজেরাও জানে না স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, অনুকূল আহার ও বিশ্রাম, এই সব কথা। সব লোক দেখছি careless (অমনোযোগী)। বেশীর ভাগ লোকই তমোগুণী, তাই নির্বোধের মত fatalist (অদৃষ্টবাদী)। ফেইট, অদৃষ্ট, কর্মফল, ঈশ্বরেচ্ছা—সত্যিকার যারা এসব মানে, তারা পুরুষ-কারের সহিত তুমুল যুদ্ধের পর, তবে মানে। জানবার চেষ্টা নাই, ইচ্ছা নাই, অপরে বললেও শুনবে না। এই সব লোক কথায় কথায় বলে, যা থাকে কপালে তাই হবে। এটা ভ্রান্ত পথ। তাই দুঃখের অন্ত নাই—দুঃখে দুঃখে জীবন যায়। চেষ্টার পর অদৃষ্ট মানা চলে। তখন বাইরে দুঃখ থাকলেও অন্তরে, চিত্তে শান্তি থাকে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—অনেকে আছে, কোন খাদ্যে সন্দেহ হলো তা নিজে খাবে না ; কিন্তু অন্যকে দিয়ে দেয়। তা করা উচিত নয়। তুমি নিজে যা reject (পরিত্যাগ) করেছ তা অন্যকে খেতে দিতে পার না—পশুপক্ষীকেও না।

খাবার জিনিস সব ঢাকনা দিয়ে রাখতে হয়। কোনও জানোয়ার মুখ দিলে কিছুতেই খেতে নাই। সব খাবার ঢাকার অসুবিধা হলে একজন দাঁড়িয়ে পাহারা দাও।

আর, লোভ সামলাতে হয়। ভাল খাবার দেখে লোভ সামলাতে না পারলেই বিপদ। ভবানীপুরেও তাই হয়েছে। দেখ না, খাওয়া কিরূপ বিপজ্জনক। প্রাণ যায় যাক, তবুও খাও। আহা, ভাল খাবার সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গো, খেয়ে ফেল। কি আদর রে!

একজন ভক্ত—অনেকে মেথরকে দেয় বাসি খাবার।

শ্রীম—বরং বাসি রুটি হলে দেওয়া যায়। কিন্তু rejected (পরিত্যক্ত) হলে দেওয়া যায় না কাউকে। সেও তো মানুষ! সে তো rejected (পরিত্যক্ত) নয়!

শ্রীম (সকলের প্রতি)—আমাদের imagination (কল্পনা) নাই বলে বুঝতে পারছি না, কি কাণ্ডখানা হয়ে গেল। কত হচ্ছে এরূপ।

কসাইখানাগুলো কি? কাগজে পড়লুম ডক্টর মরিনো কসাইখানা দেখতে গিছলেন মিউনিসিপালিটির তরফ থেকে। উনি ওখানে থাকতে থাকতে অনেকগুলি গরু হত্যা করা হল। উনি লিখেছেন, আমাদের সামনে এমন করে হত্যা করা ঠিক নয়। আরো তিনশ' গরু নাকি হত্যার জন্য প্রস্তুত ছিল।

সকাল বেলায় ছাগলগুলি ডাকতে ডাকতে যায়। সাত-আটটার সময় দেখি কুলীর মাথায়, ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই রকম কত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই। খোঁজ করলে জানতে পারা যায়।

আমাদের তেমন imagination (কল্পনাশক্তি) নাই। নানা কাজে মন ছড়িয়ে রয়েছে, তাই বুঝতে পারছি না।

ভৌমিক—সার (Sir), ঐ parableটা (রূপক গল্পটা) বলুন না। লাঠিতাড়া করলেও গরু বাড়ীছাড়া হয় না।

শ্রীম (সহাস্যে)—না, ও এখানে নয়। পরমহংসদেবকে দেখার পূর্বে ভাবতুম ঐ বুঝি general (সাধারণ) নিয়ম। কিন্তু তাঁকে দেখে বোঝা গেল সকলের জন্য ঐ নিয়ম নয়। অবতারাদির জন্য তো নয়ই। অবতারের, ঠাকুরের আবার বাড়ী আর অবাড়ী কি? যেখানে থাকেন সেখানেই বাড়ী। তিনি হলেন, 'অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ', আবার 'নির্মানমোহাজিতসঙ্গদোষাঃ'—তারপর কি আছে?

একজন ভক্ত—নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

শ্রীম—ঠাকুর অবতার। তিনি হলেন 'অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ'। লোকের নিকেতন অর্থাৎ বাড়ী, বাসস্থান না থাকলে মন অস্থির হয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুরের ঠিক তার বিপরীত। নিজের কোন বাড়ী নাই, তবুও মন সর্বদা স্থির। দারোয়ান ভুল করে এসে বললো—'বাবুজীকা হুকুম—আপ্ হিঁয়াসে চলে যাও'। অমনি তিনি চললেন—কাঁধে গামছাখানা। সদর ফটকের দিকে যাচ্ছেন। রাস্তায় ত্রৈলোক্যের সঙ্গে দেখা হতেই বললে—ছোট ভট্‌চায্ মশায়, আপনি কোথায়

চললেন একা? ঠাকুর প্রসন্নভাবে উত্তর করলেন, এই যে তুমি দারোয়ানকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছ চলে যেতে। ত্রৈলোক্য অপ্রস্তুত হয়ে বললে, দেখ তো ওদের কি অন্যায়! আমি তো আপনাকে যেতে বলি নি। ফিরে আসুন, ঘরে চলুন। অমনি হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। বাবুরা অপর একজনকে সরিয়ে দিচ্ছলো কালীবাড়ী থেকে। দারোয়ান ভুল করে এসে ঠাকুরকে যেতে বলে। চলে যাচ্ছেন, তখনও মন স্থির। সঙ্গে কিছু নেন নাই। গামছাখানা কাঁধের উপর ছিল। সেই অবস্থায়ই বের হয়ে যাচ্ছিলেন। আবার, ফিরে আসতে বললো, অমনি হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। একি সাধারণ মানুষ পারে! চলে যেতে বললে লোকের মন খারাপ হয়। আবার বাক্স প্যাঁটরা সব নিয়ে চলে যায়। কিন্তু ঠাকুর চললেন—প্রসন্ন চিত্ত, পায়ে চটি, কাঁধে গামছা। একে বলে 'অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ।'

আবার 'নির্মানমোহাঃ'—মানের ভিখারী নন, আবার মোহের বশীভূতও নন। একস্থানে থাকলে দ্রব্য, স্থান ও ব্যক্তির জন্য মোহ হয়। ঠাকুর তারও অতীত। 'অধ্যাত্মনিত্যা'—মন জগদম্বার পাদপদ্মে নিমগ্ন। 'বিনিবৃত্তকামাঃ'—কোনও কামনার বশ নন। অমন যে নিজের দেহ, তার রক্ষার কামনাও নাই। মা রাখেন থাকবে, নইলে যাবে—এই ভাব। 'দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সংজ্ঞৈঃ'—মানুষ সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়। ঠাকুরের অবস্থা তা থেকে একেবারে উল্টো। সুখেতেও মা, দুঃখেতেও মা। মানুষ সুখের সময় নিজে credit (বাহাদুরী) নেয়। দুঃখে উদ্বেলিত হয়—ভগবানের উপর দোষারোপ করে। ঠাকুর সমচিত্ত।

এসব কথা গীতায় আছে। আমায় গীতা পড়তে বলেছিলেন। এক দিন আসতে আসতে বললেন, গীতা পড় নাই? ওটা পড়বে। ওতে যুক্ত আহার-বিহারের কথা আছে। শুধু বেশী খাওয়া যে ভাল নয়, তা নয়—বেশী বেড়ানও ভাল নয়। বেশী কিছুই ভাল নয়।

একজন ভক্ত—শাস্ত্র পড়া ভাল, সকলেই বলে।

শ্রীম—হাঁ। শাস্ত্র পড়বে তো, কিন্তু তোমার কাছে interpret.

(ব্যাখ্যা) করবে কে ? দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি কত মত আছে। তা বোঝাবে কে ? নিজে নিজে পড় তো তারও বিপদ আছে। ঠাকুর বলতেন, যদি রোগী ছিল বসে, বড়িতে শোয়ালে এসে। রোগী কতক চলাফেরা করতো, বিছানায় বসতো। কবরেজ এসে বড়ি খাইয়ে দিলে। এখন রোগী সর্বদা বিছানায় লম্বা হয়ে থাকে, উঠতে পারে না। Remedy is worse then the disease.

শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য অবতারের দরকার। ঈশ্বর মানুষরূপ ধরে যখন আসেন, আর নিজেই গুরু হন—তখনই শাস্ত্রব্যাখ্যা ঠিক হয়। তখন আব কোনও ভয় থাকে না।

(সহাস্যে) আমি তখন প্রথম প্রথম গিয়েছি ঠাকুরের কাছে—'সেকেণ্ড ডে' (দ্বিতীয় দিন) হবে। ঠাকুর আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন, সদসৎ বিচার চাই। ঈশ্বরই সত্য, সংসাব অনিত্য। আমি তো আর তখন তাঁকে জানি না। আমি বললাম, আমি 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' পড়ছি। ওতে আছে এসব কথা (হাস্য)।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি)—'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং'। পড় শাস্ত্র, আর মব।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি)—আপনি উঠুন। এখন ঠাণ্ডা পড়েছে। সর্দি হতে পারে। আরও indigestion (অজীর্ণ) বাড়বে। পেট একটু ভার থাকলে খাওয়া উচিত নয়। ফ্রেণ্ডস্‌দেরও তা বলা উচিত।

ছোট জিতেন অসুস্থ। তিনি উঠিয়া ঘরে গেলেন।

এইবার 'কথামৃত' পাঠ হইতেছে। চতুর্থ ভাগ—পঞ্চদশ খণ্ড। সূচীপত্র দেখিয়া শ্রীম এই স্থানে পাঠ করিতে বলিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ পুনর্যাত্রা দিবসে বলরাম মন্দিরে আসিয়াছেন। ঠাকুর নিজেই নিজের পরমহংস অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। শান্তি পাঠক। কিছু দূর পাঠ অগ্রসর হইলে শ্রীম কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—ঠাকুরের কত কাজ! আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে কোনই কাজ নাই। দেখ না, শশধর পণ্ডিত হিন্দুধর্মের

বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর ভিতর ঢুকোচ্ছেন ঠাকুরের ভাব। বলছেন, তপস্যা চাই। তপস্যা না করলে বুঝতে পারে না। না বুঝে বললে কেউ নেবে না। এও তাঁরই look out (কাজ)। তিনি অবতার কিনা! শাস্ত্রের interpretation (ব্যাখ্যা) তাঁর light-এ (ভাবে) করতে বলছেন।

কথাটা হচ্ছে, তপস্যা করলে শাস্ত্রের অর্থ বোঝা যায় না। শশধরের attention (মনোযোগ) এদিকে direct (চালিত) করলেন। শুধু কি তা! ঠাকুর সমাধি, নৃত্য, কীর্তন দেখিয়ে, গান শুনিয়ে শশধরকে কাঁদালেন। এর মানে কি? না, শশধরকে বললেন, কথা বলবার আগে শক্তি সঞ্চয় কর। তখন তোমার কথা শুনে লোক স্তম্ভিত হবে। ইনি নিজে যেমন ঠাকুরের কথা শুনে মুগ্ধ, স্তম্ভিত হয়ে কাঁদছেন।

তিনি কি আর সকলকে এক পথে চালাবেন? তা নয়। কিন্তু সকলকেই lead (চালিত) করছেন নিজ নিজ পথে। Idealটি (আদর্শটি) ধরিয়ে দিচ্ছেন। এটা ধরে কাজে প্রকাশ কর।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি)—ঠাকুর নিজের অবস্থা কেন বলছেন, আবার সমাধিস্থ হয়ে তার demonstration (প্রদর্শন) কেন করেছেন? না, এগুলি আদর্শ—সামনে থাকলে বুঝতে পারবে ধর্ম কি! নকল জিনিস আসল বলে চালায় কিনা লোক! তাই দিক্‌দর্শন দিয়ে যাচ্ছেন। তখন ঠকাতে পারবে না। তা'তে নিজেরও কল্যাণ হবে।

Ideal state (আদর্শ অবস্থা) কি, এটা চোখের সামনে থাকলে, আমি সব বুঝে ফেলেছি বলে অভিমান হবে না। তখন নিজের position (অবস্থা) বোঝা যাবে। তা হলেই দীন ভাব, শরণাগতির ভাব আসবে।

আবার বলরামের পিতাকেও কৃপা করলেন। বলছেন, একঘেয়ে না হয়, নিজের মতটাই কেবল সত্য—এ না ভাবেন। তিনি আবার বৈষ্ণব।

কি, আশ্চর্য পুরুষ! এদিকে পাঁচ বছরেব শিশু, দিগম্বর। আবার অন্যদিকে জগদ্‌গুরু, মহামনস্বী আচার্য। যার যাতে ভাল হবে তাকে সেই দিকে চালিত করছেন। মানুষে সম্ভব নয় এ নিঃস্বার্থ অযাচিত প্রেম। নিজের কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু জগতের কল্যাণে ব্যস্ত। কেবল অবতারাদিতেই ইহা সম্ভব।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা
৮ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৪শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল
মঙ্গলবার, শুক্লা ষষ্ঠী ১৯।৫৩ পল